শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান উপন্যাসসমূহের বিকাশ ও পরিণতিতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার প্রভাব।

সেলিনা মমতাজ

গবেষণা- তËাবধায়ক

ড. সাঈদ- উর রহমান
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদË অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
জুন- ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

W. mvC`-Di ingvb
Aa¨vcK, evsjv wefvM
XvKv wekwe'¨vjq|

mÎ t ZvwiL t .....

প্রত্যয়ন- পত্র

সেলিনা মমতাজ কর্তৃক উপস্থাপিত 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান উপন্যাসসমূহের বিকাশ ও পরিণতিতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার প্রভাব' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার তËাবধানে রচিত। এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি।

ড. সাঈদ- উর রহমান
গবেষণা তËাবধায়ক ও
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০
বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ- কথা

'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান উপন্যাসসমূহের বিকাশ ও পরিণতিতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার প্রভাব' শীর্ষক গবেষণা- পত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রণীত হয়েছে।

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. সাঈদ- উর রহমানের তËাবধানে রচিত হয়েছে। গবেষণাকালে তাঁর নির্দেশনা আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ এবং বিভিb সময়ে সংশ্লিষ্ট পুস্তক সরবরাহ আমার গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। তাঁর সহৃদয় সাহচর্য ও মূল্যবান সময় লাভ আমার জন্য বড় অর্জন।

অভিসন্দর্ভ প্রণয়নকালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং রচনাটিকে সংশোধন করে দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ। তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

অভিসন্দর্ভ প্রণয়নপূর্ব বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বৃিË এবং প্রেষণ মঞ্জুরের যাবতীয় দাপ্তরিক কার্য সম্পাb করতে আমার স্বামী আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। আমার পিতার সদিচ্ছা ও মাতার নিরন্তর প্রচেষ্টা ছাড়া একাজ কখনোই সম্ভব হত না। সহোদরা ফেরদৌসী বেগম ও সহোদরাপ্রতিম ড. নাসিমা চৌধুরীর সহৃদয়তা ও উৎসাহ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত বাংলা বিভাগের সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ গ্রন্থাগারসহ আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ ব্যবহার করেছি। এ- সূত্রে উল্লেখিত গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টির পরিকল্পনায়, কাহিনির বাস্তবধর্মিতায়, রচনানৈপুণ্যে, শব্দযোজনায়, ভাষার শৈল্পিক ব্যবহারে ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রসৃষ্টির নিপুণতায় তার সাহিত্য পাঠকনন্দিত একথা সর্বজন স্বীকৃত। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে চারের দশক পযর্ন্ত সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র যে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা তার লেখনির গুণেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা মেনে নেওয়ার পরও বলা যায় তার রচনারীতির স্বকীয়তায় নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

যে কোন সাহিত্যে প্লট পরিকল্পনায়, চরিত্রাঙ্কনে—সম্ভাব্যতা বা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপের বা স্তরের পরিবর্তনে কার্যকারণ শৃংখলার পুংখানুপুংখ বর্ণনার প্রয়োজন হয়। এর অভাবে রচনাটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচকদের অভিমত, দৈব বা আরোপিত ঘটনা যে কোন রচনাকে দুর্বল করে। তবে সমাজনীতির শাশ্বত চিত্র বা চরিত্র অঙ্কন, কাহিনি বর্ণনা বা পরিস্থিতির জটিলতা সৃষ্টি অথবা গ্রন্থিমোচনে কখনো কখনো লেখককে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার আশ্রয় নিতে দেখা যায়। শরৎ-সাহিত্যে এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তাই 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান উপন্যাসসমূহের বিকাশ ও পরিণতিতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার প্রভাব' বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত হয়েছে চারটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে জন্ম-শৈশব-বেড়ে ওঠা-শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা-জীবনাভিজ্ঞতা-জীবিকান্বেষণে বর্মা যাত্রা-বিবাহ-সাহিত্য চর্চা-রাজনীতি-তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা-জীবনাবসান সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' অংশে লেখকের গল্প উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার মূল শিরোনামা 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান উপন্যাসসমূহের বিকাশ ও পরিণতিতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার প্রভাব' শীর্ষক গবেষণার মূল অংশ হিসেবে প্রধান ছয়টি উপন্যাস বেছে নেওয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। উপন্যাসসমূহ হচ্ছে, 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব- ১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব- ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব- ১৯২৭ এবং চতুর্থ পর্ব- ১৯৩৩), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনা- পাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'শেষপ্রkö(১৯৩১)। আলোচ্য অংশে কালানুক্রমিকভাবে এই ছয়টি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত- সার; সেগুলির বিকাশ ও পরিণতিতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার ব্যবহার এবং তার বিশ্লেষণ বিস্তারিত- ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনার সামগ্রিক সারাৎসার উপসংহার হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত গল্প ও উপন্যাসের কালানুক্রমিক তালিকা, অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আকর-গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহ প্রথমে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তারপর আলাদা আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিb সমালোচক তার রচনাবলীও সম্পাদনা করেছেন। আমার আলোচনায় ব্যবহার করেছি আকর-গ্রন্থ হিসেবে ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত 'শরৎ রচনাবলী' (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা)। (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণঃ স্বাধীনতা দিবস, ভাদ্র ১৪০২; (২য় খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণঃ মাঘ ১৪০৮; (৩য় খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণঃ স্বাধীনতা দিবস, ভাদ্র ১৪০২; (৪র্থ খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণঃ মাঘ ১৪০২; (৫ম খণ্ড), প্রথম নাথ পাবলিশিং পুনর্মুদ্রণঃ পৌষ ১৪০১।

Dhaka University Institutional Repository

সূচী

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় ॥ ভূমিকা ১- ২০

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২১- ৪৮

তৃতীয় অধ্যায় ॥ ছয়টি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত- সার; সেগুলির বিকাশ ও পরিণতিতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার ব্যবহার এবং তার বিশ্লেষণ ৪৯- ২০৭

চতুর্থ অধ্যায় ॥ উপসংহার ২০৮- ২২১

পরিশিষ্ট ॥ শরৎচন্দ্রের রচিত গল্প ও উপন্যাসের তালিকা ২২২- ২২৫

॥ আকর- গ্রন্থ ২২৬

॥ সহায়ক গ্রন্থ ২২৭- ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে (৩১ ভাদ্র ১২৮৩) হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতা ভুবনমোহিনীর দ্বিতীয় সন্তান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে ফুটে উঠেছিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভূমি কাঁচরাপাড়ার মামুদপুর গ্রামে। তার স্বাধীনচেতা পিতা—অত্যাচারী জমিদারের অন্যায়ের প্রতিবাদকারী—বৈকুণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর মতিলালের মাতা নিরুপায় হয়ে পুত্রকে নিয়ে দেবানন্দপুর গ্রামে এসে ভাইদের বাড়িতে ওঠেন এবং তাদের সহায়তায় তাকে মানুষ করে তোলেন। তিনি ভাগলপুরে এইচ.ই স্কুল থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পাস করেন এবং পাটনা কলেজে ভর্তি হয়ে কিছুদিন এফ.এ পড়েছিলেন। দরিদ্র হলেও মতিলাল অতিশয় স্বাধীন ও অস্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সাহিত্যের নানা শাখায় তার অবাধ বিচরণ ছিল। কিন্তু অস্থির চিত্তের কারণে কোন লেখাই তিনি শেষ করতে পারতেন না।

মতিলাল অল্প বয়সে কেদারনাথের দ্বিতীয় কন্যা ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়,

> ‘‘হয়তো মতিলাল দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারতেন না, যদি না ভুবনমোহিনীর মত সঙ্গিনী এবং সহধর্মিণী পেতেন। সরস কোমল হৃদয়ের অসীম মাধুর্য রসে উÊপ্ত ভালবাসার উর্বর ভূমির উপর তাঁর পতিভক্তির মহাদ্রুমটি ছিল হিঁদুয়ানির আদর্শের নিকড়ে একান্ত দৃঢ়বিধৃত! তার মেদুর ছায়াতলে এই যাযাবর মানুষটি গেড়েছিলেন তাঁর আসন।’’ [১]

[1] | m‡i›‘ bv_ M‡½vcva¨vq, kir cwiPq, Iwi‡qÈ eK †Kv¤úvwb, KwjKvZv-12, g‘Y mvj bvB, c.28

যদিও ভুবনমোহিনীর রূপ ছিল না তবে তার গুণ সেটিকে আড়াল করে রেখেছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ কর্মকুশলতায় ঋদ্ধ—শত অভাবেও হাসি মুখে সমস্ত সংসারটিকে আগলে রেখেছিলেন।

ভুবনমোহিনীর দাদা রামধন গঙ্গোপাধ্যায় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে পৈতৃকবাড়ি চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহর ছেড়ে ভাগলপুরে চলে আসেন। তার পাঁচটি সন্তান ছিল—কেদারনাথ, দীননাথ, মহেন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও অঘোরনাথ। সকলেই ভাগলপুরে স্থায়ী হন। কেদারনাথ ভাগলপুর কালেকটারি অফিসের কেরানির চাকুরি করতেন। তিনি জামাতা মতিলালকে পড়ালেখা করানোর জন্য দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুর নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে অভাবের কারণে পরিবার প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় মতিলাল অনেক সময় শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন সেই সুবাদে শরৎচন্দ্র ছোটবেলায় বেশ কয়েক বছর বাবার মতই মামাবাড়িতে কাটিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্ররা ছিলেন পাঁচ ভাই- বোন। জ্যেষ্ঠা অনিলাদেবী—হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এর বিবাহ হয়েছিল। দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র, তৃতীয় প্রভাসচন্দ্র—রামকৃষ্ণ মিশনে সb্যাসী হয়ে স্বামী বেদানন্দ নামে পরিচিতি পান। চতুর্থ ভাই প্রকাশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের চেয়ে বয়সে বিশ বছরের ছোট। কনিষ্ঠা সুশীলা বা মুনিয়ার বিয়ে হয় আসানসোলের কয়লা ব্যবসায়ী রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

শরৎচন্দ্র পাঁচ বছর বয়সের সময় দেবানন্দপুরে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হন। এখানে দু- তিন বছর পড়ার পর সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের নতুন স্থাপিত বাংলা স্কুলে ভর্তি হয়ে বছর তিনেক অধ্যয়ন করেন। শরৎচন্দ্রের বয়স যখন আট বছর সেই সময় পিতা মতিলাল বিহারের ডিহরীতে চাকুরি নিয়ে চলে যান। দুই বছর পর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুরে ফিরে এলে শরৎচন্দ্রকে দুর্গাচরণ এম ই স্কুলের ছাত্রবৃË ক্লাসে ভর্তি করা হয়। তার মাতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মণীন্দ্রনাথও সেখানে পড়তেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুর জেলা স্কুলে সেভেb_ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৮৬- ১৮৮৯ এই সময়ে তিনি ভাগলপুরে ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে দেবানন্দপুর আসেন এবং হুগলি

ব্রাঞ্চ স্কুলের ফোর_ ক্লাসে ভর্তি হন। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দুরন্ত হলেও মেধাবী ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডাবল প্রমোশন পেয়েছিলেন।

অভাবের তাড়নায় মতিলাল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আবারও ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে এসে ওঠেন। কিন্তু টাকার অভাবে শরৎচন্দ্র স্কুলে ভর্তি হতে পারছিলেন না। এ সময় পড়ার প্রতি তার আগ্রহ দেখে মামাদের প্রতিবেশী (শরৎচন্দ্রও মামা ডাকতেন) তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্কুলে তাকে ভর্তি করে নেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উÊীর্ণ হয়েছিলেন। তবে পরীক্ষার ফি ও বেতনের টাকা জোগাড় করতে ছোটমামা বিপ্রদাসকে মহাজন গুলজারিলালের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়—

> ‘‘বিপ্রদাস হ্যাণ্ডনোট লিখে, টাকা নিয়ে এলেন। অতি অল্প বেতনে তিনি সবে চাকরিতে ঢুকেছেন। বৃহৎ পরিবার পালনের সামর্থ্যও সে সময় তাঁর ছিল না।... কিন্তু গুলজারিলালের টাকার পয় ছিল। শরৎচন্দ্র পরীক্ষায় উÊীর্ণ হয়ে কলেজে প্রবেশলাভ করেছিলেন।’’ [২]

কলেজে ভর্তির সময়ও একই জটিলতা—অর্থাভাব। মামা সুরেন্দ্রনাথ-গিরীন্দ্রনাথকে পড়ানোর বিনিময়ে কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। কিন্তু অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অসামান্য একাগ্রতা, মেধা ও অধ্যয়ন-নিষ্ঠা থাকলেও কুড়ি টাকার অভাবে তিনি এফ.এ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অগাস্ট শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন—

> ‘‘বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্য একজামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্য জ্বর করে দাও তা’হলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপবাস করেই দিন কাটবে।’’ [৩]

---

[2] | H, c.108-109

[3] | ‡MvcvjP› ‘ ivq, kirP› ‘ (3q LÊÑc Îvejx), c_g cKvk: Avlvp 1376, RjvB 1969, c.221

কলেজে পড়ার সময়ই ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয়। ফলে শোকবিহ্বল মতিলাল শ্বশুরবাড়িতে আর থাকা অশোভন মনে করায় খঞ্জরপুর পল্লীতে বাড়ি ভাড়া করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে চলে যান। নানা প্রকার অভাব অনটনের কারণে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দেবানন্দপুরের বাড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হন।

এসময় অভাবের তাড়নায় শরৎচন্দ্র লেখাপড়া ছেড়ে স্বল্প- বেতনে একটি চাকুরি নেওয়া প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বলেন—

> ‘“আমি কিছুদিন বনেলী স্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেন্টের কাজ চলছে। ...সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। ডাঙ্গার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হত। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তb করে নাচগানের মজলিস দিতেন। সেই সময় আমরা কয়েকজন মিলে বক্রেশ্বর বেড়াতে যাই। বক্রেশ্বরের শ্মশানটা আমার বড় ভাল লেগেছিল।” [৪]

দুরন্ত স্বভাবের শরৎচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই গান- বাজনা, যাত্রা- থিয়েটার, অভিনয় এ- সবের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। মাছ ধরা, সাপ ধরা, শিকার করা কোন কিছুই বাদ যায় নি। দুর্দান্ত সাহসের অধিকারী কিশোর বয়সের সঙ্গী রাজেন্দ্রর উদ্যম তার এসবের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। দুজনের সম্পর্কে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা ছিল। এই রাজেন্দ্রকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে শ্রীকান্ত উপন্যাসের অবিস্মরণীয় চরিত্র ইন্দ্রনাথ বা পথের দাবীর বিপ্লবী সব্যসাচীর চরিত্র সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন বলে মনে হয়।

বিভিb সময়ে তারা যাত্রাদল গড়ে তুলেছিলেন। রাজেন্দ্র বাঁশী, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাজাতে পারতেন। শরৎচন্দ্র তার কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করতেন। শখের যাত্রাদলের নাম দিয়েছিলেন ‘নব হুল্লোড়’। দু- তিন বছর পর তারা আদমপুর স্থানের নাম অনুসারে ‘আদমপুর ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[4] | D×Z, AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›‘i Rxebx I mvwnZ¨wePvi, ZZxq ms¯‹iY: AMnvqY 1414, wW‡m¤i 2007, c.30

শরৎচন্দ্র যখন খঞ্জরপুর থাকতেন তখন নফরচন্দ্র ভট্ট নামে এক ব্যক্তি সাবজজরূপে বদলী হয়ে সেখানে আসেন। ভট্ট পরিবারের সাথে শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জমলে দীর্ঘ সময় তিনি এখানে কাটাতেন। বিভূতিভূষণের মেজদা ইন্দুভূষণের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। নফরচন্দ্রের ষোল বছর বয়সী কন্যা নিরুপমা বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে এসে উঠলে সাহিত্যচর্চার সুবাদে তার সঙ্গে শরতের অন্তরঙ্গতা জন্মে। সাপ্তাহিক সাহিত্যসভায় যে যাঁর লেখা পড়লেও নিরুপমা সভায় নিজে উপস্থিত থাকতেন না, দাদাকে দিয়ে লেখা পাঠিয়ে দিতেন। 'ছায়া' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হত। এসময় শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'শুভদা', 'অনুপমার প্রেম', 'আলো ও ছায়া', 'বোঝা', 'হরিচরণ' ইত্যাদি লেখেন।

পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র গৃহত্যাগ করেন এবং সbyাসী হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে যখন পিতার মৃত্যু হয় তখন তিনি মজঃফরপুরে অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ জানতে পেরে ভাগলপুরে আসেন। শ্রাদ্ধকার্য সম্পb করে অসহায় ভাই-বোনের কোনরকম একটা ব্যবস্থা করে তিনি সম্পর্কীয় মামা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে যান। তিনি তাঁর অধীনে তাকে ত্রিশ টাকা বেতনে ইংরেজি অনুবাদের কাজ পাইয়ে দেন। মাস-ছয়েক তিনি এখানে অনাত্মীয় আশ্রিতের মত ছিলেন। তার ভাষ্য মতে, ভাল চাকুরি পেলে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে অথবা সাহারা মরুভূমিতে যেতেও তার আপিঁ নেই।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা ছেড়ে তিনি রেঙ্গুনে লালমোহনের এক ভMিপতি নামজাদা উকিল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মেশোমশাই অঘোরবাবু শুধু বড় উকিলই নন, ব্রহ্মদেশে বড়লোক বলেও খ্যাতি ছিল তার। ভদ্রলোক অসামান্য বলশালী, অমায়িক ও পণ্ডিত লোক ছিলেন।[৫] তিনি বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে শরৎচন্দ্রকে পঁচাঁর টাকা বেতনে একটা চাকুরি করে দেন।

[5] | b‡i›‘ †‘e, mwnZ¨vPvh kirP›‘, cvVkvjv Kvhvjq Kwj KvZv, wØZxq ms¯‹iY, c.47

অঘোরনাথের ইচ্ছা ছিল বর্মী ভাষা শিখিয়ে তাকেও উকিল বানানো। কিন্তু দুই বছরের মাথায় হঠাৎ অঘোরনাথের মৃত্যু হলে শরৎচন্দ্র সমস্যায় পড়েন। তার পরিবার দেশে চলে আসে, এসময় শরৎচন্দ্রের চাকুরিও চলে যায়।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার নামে শরৎচন্দ্র তার এক বন্ধুর সাথে পেগুতে যান। সেখানে তারা গিরীন্দ্রবাবুর বন্ধু এবং শরৎচন্দ্রের দেশি লোক অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন। এসময় রেঙ্গুনের পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস অফিসের ডেপুটি একজামিনার মণীন্দ্রকুমার মিত্র ঘটনাচক্রে অবিনাশ চ্যাটার্জির বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। শরৎচন্দ্র গান শুনিয়ে তাকে মুগ্ধ করে দিলে তিনি তাকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। শরৎচন্দ্র বেকার জেনে তিনি তাকে একটা চাকুরি দেন। এটি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ঘটনা। তিনি কিছুদিন পি. কে. মিত্রের সাথে সহকারীরূপে ধানের ব্যবসাও করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র ১৯০৬ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মণীন্দ্রকুমার মিত্রের দেওয়া চাকুরিই করেছিলেন। কিন্তু কোন চাকুরিতে কখনো তার মন টেকে নি। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন শহরের উপকণ্ঠ বোটাটং- পোজনডং নামক স্থানে থাকতেন। এখানে প্রধানত কল- কারখানার মিস্ত্রীরা থাকতেন। শরৎচন্দ্র অবাধে তাদের সাথে মেলামেশা করতেন, তাদের জীবন- যাত্রা খুব কাছ থেকে অবলোকন করতেন, তাদের নানা ধরনের সমস্যার সমাধান দিতেন, এমনকি তাদের অসুস্থতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতেন। তারা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং 'বাবাঠাকুর' বা 'দাদাঠাকুর' বলে সম্বোধন করতেন।

এ প্রসঙ্গে গিরীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> "ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত বলিয়া মিস্ত্রীগৃহিণীরা সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট সম্মান করিত এবং কেহ দুঃখ কষ্টে পড়িলে বা চরিত্রহীন মদ্যপ স্বামীর হস্তে নির্যাতিত হইলে অকপটে তাঁহার কাছে দুঃখের কাহিনী জানাইতে লজ্জাবোধ করিত না। এই সূত্রে দরদী শরৎচন্দ্রের অনেক নির্যাতিতা ও পতিতা নারীর করুণ কাহিনী শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। নারী আন্দোলনের ভাবনায়ক এইখানে বসিয়াই

> বিভিb স্তরের বহু নারী চরিত্রের দুর্বোধ্য রহস্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাঁহার বহু চমকপ্রদ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।" [৬]

শরৎচন্দ্র মিস্ত্রীপল্লীতে যে বাড়িতে থাকতেন তার নীচতলায় চক্রবর্তী উপাধিধারী এক বাঙালি ব্রাহ্মণ বাস করতো। তার শান্তি নাgী একটি কন্যা ছিল। কন্যাটির বিয়ে ঠিক হয় প্রৌঢ় মাতাল মিস্ত্রীর সাথে। শান্তি এই বিয়ে রোধ করতে শরৎচন্দ্রকে পায়ে ধরে অনুরোধ জানালে শরৎচন্দ্র উদ্ধার- মানসে বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর শরৎচন্দ্র বেশ কিছুকাল সুখেই ছিলেন, তাদের একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। কিন্তু পুত্রের এক বছর বয়সের সময় হঠাৎ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তিদেবী ও শিশুপুত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। শরৎচন্দ্র অনেকদিন শোকাহত ছিলেন।

এই বিবাহের পূর্বে শরৎচন্দ্র গায়ত্রী নামক এক নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। বিবাহের প্রস্তাবও করেছিলেন কিন্তু গায়ত্রীদেবী সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এরপর শরৎচন্দ্র ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে মেদিনীপুর জেলার শালবনীর নিকট শ্যামচাঁদপুর গ্রামের অতি দরিদ্র কৃষ্ণদাস অধিকারীর কনিষ্ঠা কন্যা মোক্ষদাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বিয়ের পর শরৎচন্দ্র তার নাম হিরণ্ময়ী রেখেছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না তবে ধীরস্থির, সেবা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন, একই সাথে স্বামীকে ভালোবাসতেন। শরৎচন্দ্র তাকে লেখা- পড়া শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী সম্পর্কে শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের মন্তব্য নিgরূপ,

> হিরণ্ময়ী দেবী অশিক্ষিতা, গ্রাম্য, সরলা ও অনেক বিষয়ে অবুঝ ছিলেন সত্য, কিন্তু তার মত স্বামী সেবাপরায়ণা, ধর্মশীলা, কর্তব্যনিষ্ঠাবতী, কোমলহৃদয়া, অহংকার ও অভিমানশূন্যা মহিলা এ যুগে খুব কমই আছেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের বাঁধনে ভবঘুরে শরৎচন্দ্রকে সংসারে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন

---

[6] | D×Z, kirP‡›'i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.69

> বলেই, পরে শরৎচন্দ্রের জীবনে সাহিত্য সাধনার পথ সহজ ও সুগম হয়েছিল। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য- জীবনে হিরণ্ময়ী দেবীর দানই বোধ করি সবার উচ্চে।" [৭]

শরৎচন্দ্রের সাথে হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ হয়েছিল কিনা এ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন। ব্রজেনবাবু তার দুটি গ্রন্থে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের জীবন সঙ্গিনী বলেছেন। জীবন- সঙ্গিনী শব্দের অর্থ স্ত্রী হয়, কিন্তু স্ত্রী ছাড়া জীবন- সঙ্গিনী অর্থে শুধু জীবন- সঙ্গিনীও হতে পারে।
নরেনবাবু লিখলেন, সঙ্গিনী। এখন প্রk ওঠে, তবে কি সত্যই তাদের বিয়ে হয়নি ? মণীন্দ্রনাথ রায়ের লেখায়ও একই সংশয়।
অপরপক্ষে হিরণ্ময়ী দেবী নিজে বলেছেন তাদের বিয়ে হয়েছিল, আত্মীয়রাও বলছেন বিয়ে হয়েছিল, শরৎচন্দ্র নিজেও স্ত্রী বলে উল্লেখ করে গেছেন।[৮]

এ সম্পর্কে নরেন্দ্র দেব তার 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন,

> "অনেকেরই মনে এই সুদৃঢ় ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধ ছিল যে, শরৎচন্দ্র অকৃতদার। কোনো সঙ্ঘ- সমিতিতে শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার সময় তাঁর পূর্ব পরিচিত অনেকেই তাকে চিরকুমার জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করতেন। শরৎচন্দ্র শুনে নীরবে মুখ টিপে হাসতেন, কোন প্রতিবাদ জানাতেন না। এ যেন তার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।" [৯]

রেঙ্গুনে থাকতে শরৎচন্দ্র সঙ্গীতের পাশাপাশি চিত্রকলার সাধনাও করেছিলেন। সাহিত্য সাধনায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি চিত্রকলার চর্চা করেছিলেন। এ বিষয়ে যে তার গভীর জ্ঞান ছিল তা তার উক্তিতেই বোঝা যায়।

---

[7] | †MvcvjP›`ª ivq, kirP‡›`ªi cYq-Kwnbx, c_g cKvk: fv`ª 1368, c.82
[8] | H, c.60,63,66
[9] | b‡i›`ª †`e, mwnZ¨vPvh kirP›`ª, c‡ev³, c.56

রেঙ্গুন থেকে প্রমথ ভট্টাচার্যকে তিনি লিখেছিলেন,

> “এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের উপর আমার ভয়ানক রাগ আছে—অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা হয় খুব একচোট ঝাল ঝাড়ি—কিন্তু কোনদিন করি নি। `Art painting’ আমিও নিজে করি। `Oil painting’ আমিও বুঝি—ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বইও পড়িনি।” ১০

প্রথমদিকে অনেক ছবি তিনি এঁকেছিলেন। কিন্তু ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারী শরৎচন্দ্রের কাঠের বাড়ির নীচতলায় আগুন লাগলে সমস্ত পেন্টিং, বইয়ের পাণ্ডুলিপি, লাইব্রেরী আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা ছিল ব্যাপক। বিজ্ঞানের বইয়ের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি সাহিত্যের নানা গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন মনোনিবেশ সহকারে। বিদেশি লেখকদের মধ্যে হেনরী উড, মেরি করেলি, চার্লস ডিকেন্স এর ভক্ত ছিলেন তিনি; শেকmপীয়রের মত নর- নারীর চরিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর একটিও তার নজরে পড়েনি। দেশীয় লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত ছিলেন। এছাড়া বঙ্কিমের লেখা দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তার ‘শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> “শরৎচন্দ্র একাধিকবার বলিয়াছেন যে, সাহিত্যে তিনি গুরুবাদ মানেন এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ‘চোখের বালি’, ‘গোরা’ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় কবি ‘মেঘদূত- কাব্যের যে অভিনব ও অপরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শরৎচন্দ্রের সৃজনী প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।...
>
> কালিদাস তাঁহার বিরহের কাব্যের পটভূমিতে স্থাপন করিয়াছিলেন দেবতা ও যক্ষের বিহারভূমি অলকা; মর্ত্যজগৎকে তিনি দেখিয়াছেন গগনবিহারী মেঘের দৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ সেই বর্ষব্যাপী বিরহের মধ্যে অনন্ত, অনপনেয় ‘ব্যবধান’ দেখিতে পাইয়াছেন।...
>
> শরৎচন্দ্রের প্রধান মৌলিকতা এইখানেই যে, তিনি প্রাত্যহিক জীবনের পু•Lানুপু•L বর্ণনার মধ্য দিয়া মিলন ও বিচ্ছেদের নিবিড় সংসক্তির চিত্র আঁাকিয়াছেন।” ১১

---

10 | ‡MvcvjP›‘ ivq, kirP›‘ (3q LÊÑc Îve jx), c‡ev ³ , c.60

11 | m‡evaP›‘ †mb¸ß, kirP‡›‘i Rxeb I mwnZ¨, wØZxq ms¯‹iY: gvN 1404, c.82,83

একবার রায়বাহাদুর যতীনসিংহ শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা আপনি বেশ্যাদের নিয়ে সাহিত্যে স্থান দিলেন কেন ?

শরৎচন্দ্র উËর দিয়েছিলেন, “আমি কেন ওদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছি ? যেহেতু ওদের মধ্যেও আমি সাহিত্যের রসের সন্ধান পেয়েছি।”

পৃথিবীর বহুদেশের বিখ্যাত অনেক লেখক তাদের রচনায় পতিতা চরিত্র অঙ্কন করে আরো বিখ্যাত হয়েছেন। বালজাক, মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রান্স ফরাসি সাহিত্যে টলস্টয়, ডস্টয়ভস্কি প্রভৃতি রুশসাহিত্যে অনেক স্মরণীয় পতিতা চরিত্র আছে।[১২]

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তার ‘শরৎচন্দ্র’ নামক গ্রন্থে বলছেন,

> “সমাজে যাহারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, তিনি তাহাদের জীবন অতিশয় গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার পর্যবেক্ষণের নিবিড়তা, বিশ্লেষণের পু•Lানুপু•Lতা, বর্ণনার বাস্তবতা সর্বজনবিদিত।[১৩]

ভাগলপুরে থাকতেই শরৎচন্দ্র সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন একথা আগেই বলা হয়েছে। সেই সময়ে তিনি উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে বেশ কিছু গল্প উপন্যাস লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সঙ্গী সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ ভট্টদের বাড়ি থেকে কলকাতায় আসার সময় দুটি খাতা সঙ্গে এনেছিলেন। একটিতে ছিল ‘বোঝা’, ‘সুকুমারের বাল্যকথা’, ‘কাশীনাথ’, ‘অনুপমার প্রেম’ ইত্যাদি অন্যটিতে ছিল ‘কোরেল’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘বড়দিদি’ ইত্যাদি।

রেঙ্গুন যাবার দু-একদিন আগে মাতুল গিরীন্দ্রনাথের অনুরোধে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রেরণের উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র ‘মন্দির’ নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। বিচারক ছিলেন সাহিত্যিক জলধর সেন। দেড়শত গল্পের মধ্যে ‘মন্দির’ গল্পটি শ্রেষ্ঠ হবার গৌরব অর্জন করেছিল। এরপর রেঙ্গুনে থাকতে তিনি দীর্ঘদিন সাহিত্যচর্চা করেননি।

---

[12] | D×Z, H, c.127
[13] | m‡evaP›‘ †mb¸ß, k i rP›‘, mß‘k ms¯‹iY: AMnvqY 1407, c.11

এদিকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি তখন রেঙ্গুনে—সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে সরলাদেবীর তত্ত্বাবধানে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘বড়দিদি’ কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সাহিত্যিক, পাঠক ও বোদ্ধামহলে হৈ চৈ পড়ে যায়। লেখকের নাম না থাকায় পাঠক এটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা মনে করেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন বলতে বাধ্য হলেন,

> “যেমন করে পারো, তাঁকে আনাও সৌরীন...তাঁকে ধ’রে এনে লেখাও। বাঙলা দেশে এঁর জোড়া লেখক পাবে না।”[১৪]

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অফিস থেকে একমাসের ছুটি নিয়ে শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় আসেন। মাতুল উপেন্দ্রনাথের মাধ্যমে ‘যমুনা’ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁকে তার পত্রিকায় লেখার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তবে ‘বড়দিদি’ প্রকাশের পর অনেক পত্রিকার সম্পাদকই তার খোঁজ করেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে লেখা পাঠিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়ে কলকাতা ত্যাগ করেন।

‘চরিত্রহীন’ আগে লেখা হলেও নানা কারণে সেটি প্রকাশে বিলম্ব হয়। রেঙ্গুনে ফিরেই শরৎচন্দ্র ‘রামের সুমতি’ লেখেন এবং ১৩১৯ সালে ‘যমুনা’ পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক ও সাহিত্যিক মহলে ব্যাপক পরিচিতি পান।

যমুনাতে লেখার পাশাপাশি নবপ্রকাশিত পত্রিকা ‘ভারতবর্ষে’ও লেখা শুরু করেন, পরে অবশ্য যমুনার পরিবর্তে ভারতবর্ষেই তিনি স্থায়ী হন এবং পত্রিকার মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তার বিভিb সময়ে লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে থাকেন। তবে ভারতবর্ষ পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এর বিজ্ঞাপিত সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র গভীর শোকতপ্ত হয়ে ভারতবর্ষ পত্রিকার উbতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। পরে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের আগ্রহাতিশয্যে লেখা দিতে সম্মত হন। ভাগলপুরে থাকতে লেখা উপন্যাস

---

[14] | D×Z, AwRZ Kgvi †Nvl, kirP‡›`i Rxebx I mvwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.96

‘দেবদাস’র সাথে আরো একটি বড় গল্প দিতে প্রতিশ্রুত হন। ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত লেখা ‘বিরাজ বৌ’ (১৯১৩)।

এরপর ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘পরিণীতা’, ‘পণ্ডিতমশাই’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘বৈকুণ্ঠের উইল’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘নিষ্কৃতি’, ‘কাশীনাথ’, ‘চরিত্রহীন’ ইত্যাদি একের পর এক বিভিb পত্রিকায় ও পুস্তকাকারে প্রকাশ হতে থাকে। সেই সাথে তার খ্যাতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

রেঙ্গুনে থাকতে শরৎচন্দ্র ‘যমুনা’য় লেখা দিতেন, পরে ‘ভারতবর্ষে’র সঙ্গে যুক্ত হন। এবং একই সাথে যমুনা ও ভারতবর্ষে তার লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। যমুনার সËাধিকারী ফণীন্দ্রনাথ পাল যমুনার সাথে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক বৃদ্ধির সংকল্পে তাকে সম্পাদকরূপে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু ফণীন্দ্রনাথ পালের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রকে বোঝানো হয় যে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে কিন্তু শরৎচন্দ্রকে সামান্যই দিচ্ছে, ফলে প্ররোচিত হয়ে শরৎচন্দ্র একদিন যমুনার অফিসে ঢুকে তালা ভেঙ্গে বড়দিদি উপন্যাসের দুই/ তিনশত কপি নিয়ে চলে আসেন। পরে সৌরিন্দ্রমোহনের কাছে অনুতপ্তচিËে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,

> ‘‘একটা কথা সৌরীন...শাস্ত্রে আছে দারিদ্র-দোষো গুণরাশিনাশী। যেসব লেখক অন্য কাজ করে না...লেখা থেকেই যার জীবিকার সংস্থান তার মতো দুর্ভাগা জীব সত্যই নেই।’’ [১৫]

শরৎচন্দ্র তার ভুল বুঝতে পারলেও যমুনার সঙ্গে তার স্পর্ক ছিb হয়ে যায়, এর পরে ভারতবর্ষেই তার লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তবে ফণীন্দ্রনাথ পালের সাথে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল।

যদিও তিনি সাহিত্য সাধনার কথা পরিচিত মহলে প্রকাশ করতে চাইতেন না তবুও নানা সভা সমিতি ও সম্বর্ধনা সভায় মাঝে মাঝে যেতে বাধ্য হতেন।

15| D×Z, H, c.126

রেঙ্গুনে ভিক্টোরিয়া হলে আয়োজিত মহাত্মা গান্ধীকে দেওয়া সম্বর্ধনা সভার বহু প্রশংসিত রিপোর্টটি এবং ১৩২৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে রেঙ্গুনে পি.সি. সেনের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণকালে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ অভিনন্দন-পত্রটি শরৎচন্দ্র রচনা করে দিয়েছিলেন। তবে বহু লোকের মধ্যে অস্বস্তিবোধ করা শরৎচন্দ্র সে সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেননি। পরে অবশ্য একাধিকবার তাদের দেখা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তখন বাজে শিবপুরে—একদিন বাল্যবন্ধু ঔপন্যাসিক চারু বন্দোপাধ্যায় এর সাথে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে বিচিত্রার আসরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হয়ে আসেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে বসবাসকালীন চৌদ্দ বছরের মধ্যে তিনবার অফিস ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। প্রথমবার ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে তিনমাসের, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরে একমাসের এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জুনে ছয়মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন।

শরৎচন্দ্র দুরারোগ্য পা-ফোলা রোগে আক্রান্ত হয়ে অফিসের বড় সাহেবের সাথে ঝগড়া করে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল একবারেই রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন।

এ সম্পর্কে সুধীরচন্দ্র সরকারকে ১৪.০৩.১৯১৬ তারিখে চিঠিতে লেখেন,

> ‘‘শুনিয়াছ বোধ হয় আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না—করিলেও তাহা ভাল হয় না।...আমি কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না।’’ [১৬]

রেঙ্গুন ছেড়ে একেবারে চলে আসার আগে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মাসিক ১০০ টাকার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন।

---

[16] | ‡MvcvjP›‘ ivq, kirP›‘ (3q LÊÑc Îvejx), c‡ev³, c.157

গোপালচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্রের জীবনী-গ্রন্থে লিখেছেন,

> ‘‘হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে মাসে যে ১০০ টাকা করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে হরিদাসবাবু একদিন আমাকে বলেছিলেন—এই টাকার মধ্য থেকে শরৎচন্দ্র ৫০ টাকা পেতেন ভারতবর্ষের লেখক বলে। অবশ্য এই ৫০ টাকার জন্য যে প্রতি মাসেই তাঁকে ভারতবর্ষে লেখা দিতে হ’ত তা নয়। যে মাসে তিনি লেখা দিতেন না, সে মাসেও তিনি নিয়মিত টাকা পেতেন। হরিদাসবাবু এই ১০০ টাকার বাকি টাকা ৫০ দিতেন, তাঁদেরই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স নামক পুস্তকালয় হ’তে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ- সমূহের হিসাব থেকে।’’ [১৭]

রেঙ্গুনবাসের শেষের দিকে তিনি আর মিস্ত্রী- পল্লীতে থাকতেন না, লুইস স্ট্রীটে উঠে গিয়েছিলেন। তবে রেঙ্গুনের স্মৃতি তিনি তার বিভিb উপন্যাসে জীবন্ত করে রেখে গেছেন।

রেঙ্গুন থেকে বিদায় নিয়ে সস্ত্রীক হাওড়া শহরে ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে ওঠেন এবং নয় দশ মাস সেখানে থেকে পরে একই এলাকায় ৪নং বাড়িতে ওঠেন এবং এখানে নয় বছর বসবাস করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সামতাবেড়ে বানানো নিজের বাড়িতে ওঠেন। হাওড়া জেলার বাগনান থানার গোবিন্দপুর গ্রামের পাশেই সামতাবেড় গ্রাম। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলাদেবীর শ্বশুরবাড়ি এই গোবিন্দপুর গ্রামে। শরৎচন্দ্র সমগ্র জীবনই দরিদ্র ও অনাথাদের প্রতি বিশেষ যZবান ছিলেন। হাওড়া শহরে থাকার সময় তিনি যেমন ঐ অঞ্চলের দুখী মানুষের পাশে ছিলেন, তাদের অসুখে- বিসুখে চিকিৎসা করতেন, পথ্য কিনে দিতেন, অর্থ সাহায্য করতেন তেমনি সামতাবেড়ে এসেও একই কাজ করতেন। এছাড়া আমরা আগেই জেনেছি বর্মা থাকতেও তিনি মিস্ত্রী পল্লীতে বসবাসের সময় তাদের সব ধরনের সাহায্য করতেন।

সামতাবেড়ে থাকার সময়ই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বালীগঞ্জের অশ্বিনী দË রোডে তিনি একটি সুন্দর দ্বিতল বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। হিরণ্ময়ী

---

[17] | D×Z, AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›‘i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.157

দেবীর ইচ্ছানুসারে এটি নির্মিত হয়। তিনি একটি গাড়ী কিনতেও সক্ষম হয়েছিলেন। লেখালেখির মাধ্যমে তিনি প্রভূত সম্পদের অধিকারী হন। শেষ জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপন করতে পেরেছিলেন। শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাসচন্দ্র সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে স্বামী বেদানন্দ নাম ধারণ করেছিলেন, তবে তার ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রকে বিয়ে দিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন। তাদের দুটি সন্তান—একটি কন্যা ও একটি পুত্র হয়েছিল। নাম মুকুলমালা ও অমলকুমার। এদের দুজনকে নিয়েই তাদের দিন-রাত্রি কাটত।

জীবনাবসানের আগের কয়েকটি বছর শরৎচন্দ্রের শরীর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না, নানান ধরনের অসুখে তাকে ভুগতে হয়েছিল। বিশেষ করে পেটের পীড়ার অংশটি তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি করেছিল। শরৎচন্দ্র হাসপাতালে ভর্তির আগে একটি উইল করেছিলেন—যাতে তিনি তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পদ জীবনস্বত্ব হিরণ্ময়ী দেবীকে দান করে যান। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রকাশচন্দ্রের পুত্র বা পুত্ররা সমস্ত সম্পদের মালিক হবেন একথাও উইলে লেখা হয়। উল্লেখ্য শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী দেবী প্রায় তেইশ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৩৬৭ সালের ১৫ ভাদ্র তার জীবনাবসান হয়।

শরৎচন্দ্র হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতে রাজনীতিতে জড়িয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধুর আহবানে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন এবং ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৬ বছর এই পদে ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই হয়ত তার এ সময়ের লেখাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও আদর্শ, ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামী চেতনা ও শ্রমিক আন্দোলন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 'পথের দাবী'ই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ উপন্যাসের মাল-মসলা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে।[১৮]

---

[18] | m‘xc em, D™vwmZ kirP›‘: c‡Î I mvgwqK c‡Î, c_g cKvk: RjvB 2000, kveY 1407, c.296

বিভিb সময়ে তিনি বিপ্লবী নেতাদের নিজের রিভলবার, বন্দুকের গুলি এমনকি অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। সূর্য সেনকেও তিনি তার বৈপ্লবিক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্রকে ডি.লিট উপাধি প্রদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাতে সাড়া দেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন।
ডি.লিট উপাধি প্রদানের বিষয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মাঘ লিখিত একটি পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন,

> ‘‘যাঁরা আমাকে উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাই আমার সব চেয়ে বড় উপাধি। এই কথাটি মনে করলেই মন ভরে যায়।’’ [১৯]

শরৎচন্দ্র এখানে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, জগbাথ হল, ঢাকা হল এবং মুসলিম হলের ছাত্র সংসদ কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। শিখা গোষ্ঠী দ্বারাও তিনি সম্বর্ধিত হয়েছিলেন।

এর আগে তিনি জগËারিণী পদক পেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং একবার তিনি বি.এ পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের প্রkকর্তাও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বিভিb সময়ে ভিb ভিb প্রতিষ্ঠান থেকে তার অমর সাহিত্যকীর্তির জন্য অভিনন্দিত, সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জীবনানুভূতি সহজ ভাষায় অসাধারণভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই হয়ত দেশবাসীর হৃদয়ের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন তিনি। তার অসাধারণ দরদী একটা মন ছিল। অনেকগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি—গায়ক, বাদক, অভিনেতা, চিকিৎসক এমনকি পশুপ্রেমিক পযর্ন্ত। অসহায়, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, পতিতা নারীদের প্রতি তার মমত্ববোধ ছিল চোখে পড়ার মত। তিনি সমগ্র জীবন তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করেছেন।

---

[19] | ‡MvcvjP›‘ ivq, kirP›‘ (3q LÊÑc Îvejx), c‡ev³, c.452

পশুপাখীর প্রতি শরৎচন্দ্রের ভালোবাসা ছিল প্রবল। তার একটি কুকুর ছিল নাম 'ভেলু'। তার মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজে মাটি খুড়ে গর্ত করে তাকে কবর দিয়েছিলেন। এছাড়া তার 'বেটু' নাgী একটি টিয়া পাখিও ছিল—যাকে তিনি অত্যন্ত যcZ রেখেছিলেন।

জীবনের শেষপাদে তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ্য ছিলেন না। উল্লেখ্য তিনি প্রচুর পরিমাণে আফিং খেতেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া পরিবর্তনে দেওঘর যান, ফিরে এসে কিছুদিন পর আবারও অসুস্থতা, ফলে চিকিৎসকের পরামর্শে এবার কলকাতায় আসেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যকৃতে ক্যানসার ধরা পড়ে, পাকস্থলীও বাদ যায় নি। ডা. বিধানচন্দ্র রায়, ডা. কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট চিকিৎসকরা শরৎচন্দ্রের চিকিৎসা করেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন অস্ত্রোপচার ছাড়া গত্যান্তর নেই। প্রথমে তিনি ডা. ম্যাকে সাহেবের সুপারিশে একটি 'ইউরোপীয় নার্সিং হোমে' ভর্তি হন। এটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং নিয়মের খুব কড়াকড়ি থাকায় সুবিধা না হওয়ায় ডা. সুশীল চ্যাটার্জীর 'পার্ক নার্সিং হোমে' ভর্তি হন। শরৎচন্দ্রের অনুরোধে দুটি ক্যানেরি পাখি ও গোলাপের টব তার ঘরে এনে রাখা হয়েছিল। তার প্রচুর দর্শনার্থী ছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি সাধারণ লোকও তার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বিM wQj।

নার্সিং হোমে ভর্তির সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তাকে এক পত্রে লেখেন,

> "কল্যাণীয়েষু, শরৎ, রুM দেহ নিয়ে তোমাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে শুনে অত্যন্ত উদ্বিM হলুম। তোমার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে।" [২০]

প্রখ্যাত সার্জন ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের অপারেশন করেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। যকৃৎটা একেবারে পঁচে গিয়েছিল। তার উপর রক্তশূন্যতাও ছিল। খাবার খেয়ে তিনি হজম করতে পারতেন না।

---

[20] | D×Z, AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›'i Rxebx I mvwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.309

অপারেশনের পর তরল খাবার দেওয়ার জন্য পেটের ভিতরে একটা নল বসানো হয়েছিল। প্রকাশচন্দ্র তাকে রক্ত দিয়েছিলেন। অবস্থা একটু ভালোর দিকে গেলে বাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেই সুযোগ শরৎচন্দ্র আর দেননি।

বাড়িতে নিয়ে যাবার পূর্বরাত্রিতে সুরেন্দ্রনাথ টিউবে করে তাঁকে আঙ্গুরের রস খাইয়ে মুখে কোন কিছু খেতে নিষেধ করে বাড়িতে নিজে খেতে আসেন। রাত দুটোর দিকে বার্তাসংস্থা রয়টার থেকে ফোন করে ড. চ্যাটার্জি কেমন আছেন জানতে চাইলে সুরেন্দ্রনাথ কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বিবেচনা করে নার্সিং হোমে ছুটে গিয়ে দেখেন শরৎচন্দ্র বমি করছেন। এর পরের অংশ সুরেন্দ্রনাথের 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থ থেকে উল্লিখিত হল—

"পৌছে দেখি শরৎচন্দ্র বমি কোরছেন এবং মৃত্যুঞ্জয় পাশে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকতেই তিনি অদৃশ্য হোলেন।
একি শরৎ ?
আমি মুখ দিয়ে আফিং এর জল খেয়ে—
চারিদিক অন্ধকার দেখলাম!
ডাঃ সুশীলকে ডাকতে তিনি এলেন
তিনি ফোন কোরলেন কুমুদবাবুকে। তিনি এলেন।
বমির পর বমি!
অবশেষে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান লোপ হল। আমাদের সকল প্রচেষ্টার শেষ হলো।
ললিতবাবু এলেন।
ফিরে গেলেন।" [২১]

শরৎচন্দ্র অপারেশনের পর মাত্র চার দিন বেঁচে ছিলেন। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের ১২ জানুয়ারী অস্ত্রোপচার হয়েছিল আর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী (১৩৪৪ সালের ২মাঘ) রবিবার সকাল দশটা দশ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মাত্র ৬১ বছর ৪ মাস জীবনকাল পেয়েছিলেন।

মৃত্যুর সাত মিনিট পর সংবাদটি টেলিফোন, সংবাদপত্র, বেতার মারফত দেশ ও বিদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। শরৎচন্দ্রের মৃতদেহ তার ২৪নং অশ্বিনী দË রোডের বাড়িতে নিয়ে এলে সকল শ্রেণি-পেশার

[21] | m‡i›'bv_ M‡½vcva¨vq, kir cwiPq, c‡ev³, c.209-210

বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ তাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সমবেত হন। স্মরণকালের শোক-শোভাযাত্রাটি বেলা ৩:১৫ মিনিটে পুষ্পস্তবকে সজ্জিত শবাধার নিয়ে কেওড়াতলা k¦শ্যানঘাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। শব-শোভাযাত্রায় অপরাজেয় কথাশিল্পীর জয়ধ্বনির পাশাপাশি ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ 'পথের দাবী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে সম্মিলিত দাবী উত্থাপিত হতে থাকে।

শেষকৃত্য সম্পb করে ৫:৪৫ মিনিটে প্রকাশচন্দ্র মুখাগM করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তৎকালীন মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী, অনারেবল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

> "যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিককালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।" [২২]

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিকে উদ্দেশ্য করে রচিত তার বহুশ্রুত কবিতাটি—

> 'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
> ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
> দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
> দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলা তথা ভারতের বহুস্থান থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। বিভিb স্থানে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়—

> "১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতার জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি মহতী শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিও

---

[22] | D×Z, AwRZ Kgvi †Nvl, kirP‡›`i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.313

> একটি সভায় শোক জ্ঞাপন করে। গুজরাটের হরিপুরায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৫১তম সম্মেলনের প্রথম দিনকার অধিবেশনে অন্যান্য পরলোকগত নেতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।" [২৩]

যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শরৎচন্দ্রের তিরোধানে শোকসন্তপ্ত হয়ে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকবাণী দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন—রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নলিনীরঞ্জন সরকার, শরৎচন্দ্র বসু, যদুনাথ সরকার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ এবং স্মৃতির উদ্দেশ্যে কবিতা লিখে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র দেব, সাবিত্রীপ্রসb চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি রাষ্ট্রপতি সুভাসচন্দ্র বসু সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন,

> "সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্যগগন হতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল। যদিও বহুবর্ষ তাঁর নাম বাংলার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি তিনি ভারতের সাহিত্য- জগতেও কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশ প্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরো বড়।" [২৪]

---

[23] | H, c.312
[24] | H, c.312

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয়েছিল ভাগলপুর থাকতে। শৈশবে দুই তিন বছর এবং কৈশোরের মাত্র তিনটি বছর তিনি দেবানন্দপুরে কাটিয়েছিলেন। রেঙ্গুন যাবার পূর্বে উনিশ বছর তিনি ভাগলপুরে কাটিয়েছিলেন। তবে রেঙ্গুন যাত্রার আগে দুই বছর কলকাতায় ছিলেন। তাই তার সাহিত্যে ভাগলপুরের পল্লীসমাজ, তাদের সংস্কৃতি, গ্রামের লোকজন, তাদের জীবনযাত্রা, সুখ- দুঃখ, আনন্দ- বেদনা, হাসি- কাbv, তাদের ভালোলাগা- মন্দলাগা সমস্তই যে তার সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল একথা বলা যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য 'মন্দির' নামক ছোটগল্প দিয়ে তার সাহিত্য- জীবনের শুরু। এরপর প্রকাশিত হয় 'বড়দিদি' (১৯০৭)। এর আগে তিনি আর কোন লেখা প্রকাশ করেননি।

'বড়দিদি' গ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচকদের wfb wfb মত পাওয়া যায়। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে বলেছেন গল্প আর কালিদাস রায় বলেছেন উপন্যাসিকা। ড. অজিতকুমার ঘোষ এটিকে বড়গল্প বলতেই সর্বাপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।

শরৎসাহিত্যের মুলকথা সমাজনিষিদ্ধ প্রেম বা ভলোবাসা; বিশেষ করে বিধবা, পতিতা নারীর ভালোবাসা তাদের ব্যথা- বেদনা, বিরহকে কেন্দ্র করে বেশিরভাগ উপন্যাসের গোড়া পËন। এটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এই উপন্যাসের প্লট নির্মিত হয়েছে বিধবা মাধবীর নিষ্ফল ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্ধুর পরামর্শে বিলাত যেতে চাইলে পিতার অনিচ্ছা ও বিমাতার অট্টহাস্যে ব্যর্থ হয়ে অভিমান করে গৃহ ছেড়ে ঘটনাচক্রে মাধবীদের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করে। মাধবীর ছোটবোন প্রমীলার গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেও নিজেই বইয়ের জগতে ডুবে থাকা বা সবকিছুতেই মনভুলো—অন্যমনস্ক সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মনোযোগ আকর্ষণ করে।

সামান্য কথায় ভুল বুঝে মাধবীর আশ্রয় ত্যাগ, সুরেন্দ্রনাথের এ্যাকসিডেন্ট, পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়া, মাতামহ কর্তৃক জমিদারী প্রাপ্তি, শান্তিকে বিবাহ এবং সংসার প্রতিপালন, তারপর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত—কিন্তু হৃদয়ের আকুলতা এই দীর্ঘসময়ে বিবর্ণ ধূসরতার পরিবর্তে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

উদাসীন, আZ¥ভোলা, পরনির্ভরশীল সুরেন্দ্রনাথের বড়দিদি কেন্দ্রিক নির্ভরতা এবং সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মাধবীর স্নেহ করুণার নির্দোষ অনুভূতির ভিতর দিয়ে গোপন ভালোবাসা জেগে উঠার কাহিনিতে কিছু অসংঙ্গতি, অসংলMতা ও আতিশয্য থাকলেও বড়দিদির প্রকাশভীরু ভালোবাসা উপন্যাসের সমাপ্তিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার একটি মাত্র বাক্যে। অচেতন সুরেন্দ্রনাথ ক্ষণিকের জন্য চৈতন্য লাভ করে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ‘‘তুমি বড়দিদি ?’’
বড়দিদি উËরে তখন বলেছে ‘‘আমি মাধবী’’ ।
তার প্রেমময় নারীসËার জাগরণের প্রকাশ এই একটি ছোট্ট বাক্যের ভিতর দিয়ে ঘটেছে।

শরৎচন্দ্রের ‘বোঝা’ ১৩১৯ সালের কার্তিক–পৌষ সখ্যায় ‘যমুনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র তার সাহিত্যজীবনের প্রথমদিককার রচনাগুলো প্রকাশের ব্যাপারে বিমুখ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে এনে বোঝা যমুনায় ছাপানোর জন্য সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্রনাথ পালকে শরৎচন্দ্র অনুযোগ করে চিঠি লেখেন এবং তার অনুমতি ছাড়া প্রথমদিককার লেখা আর না ছাপাতে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র খুব বেশী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়তেন, ফলে তার লেখায় বঙ্কিমের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক ছিল। বোঝা গল্পটিতে বঙ্কিমের রচনার ছাপ সুস্পষ্ট।

কাহিনিবিন্যাস ও রচনারীতির প্রভাব থাকলেও বঙ্কিমীয় উৎকর্ষ ‘বোঝা’ গল্পটিতে বোঝা হয়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্র’র অল্প সময়ের মধ্যে তিনটি নারীর সাথে সম্পর্ক সবজায়গায় সঙ্গতি রক্ষা করেনি। নলিনীর সাথে সম্পর্ক সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি মনে হলেও তার আর ফিরে না আসা এবং সত্যেন্দ্রর আবার বিয়ে করা অস্বাভাবিক মনে হয়।

'বাল্যস্মৃতি' ১৩১৯ সালের মাঘ মাসে সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুকুমার অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। পল্লীর অবাধ- মুক্ত পরিবেশে নিত্য নতুন দুরন্তপনার ভিতর দিয়ে সে বেড়ে ওঠে। শরৎচন্দ্রের বাল্যচরিত্রের সাথে সুকুমারের বাল্যকালের চরিত্রের মিল পরিলক্ষিত হয়। সুকুমার কলকাতায় এসে বদ্ধ পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠে কিন্তু তার সহানুভূতিশীল হৃদয় নিরীহ গদাধরের প্রতি করুণরসে সিক্ত হয়।

'কাশীনাথ' বড়গল্পটি ১৩১৯ সালের ফাল্গুন- চৈত্র সংখ্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাল্যস্মৃতি ও কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য- জীবনের সূচনায় রচিত। আমরা জানি, প্রথমদিককার লেখা প্রকাশের ব্যাপারে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের এক বন্ধু নিজের লেখা ছাপাবার সুবিধার্থে শরৎচন্দ্রের এই দুটি লেখা কোন রকমে হস্তগত করে সাহিত্য সম্পাদককে দেন ছাপাবার জন্য।
এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে লিখেছিলেন,

> "ইতিমধ্যে সমাজপতিকে লিখে দিয়ো কাশীনাথ যেন প্রকাশ না করে।" [২৫]

কুলীন বালক কাশীনাথ অসহায়, দরিদ্র, পল্লী- প্রকৃতির সাibধ্যে বেড়ে ওঠা উদাসীন, নিঃসঙ্গ হলেও বই পড়তে সে ভালোবাসে। বিন্দুর প্রতি স্নেহবশত তার স্বামীর রোগমুক্তির জন্য অর্থসাহায্য করে।
স্ত্রী দ্বারা চরম অপমানিত হলেও তার কোন বিকার গ্রন্থমধ্যে নেই। স্ত্রী কমলার সঙ্গে তার সম্পর্ক খানিকটা নিরাসক্ত।

কমলার চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে অর্থপ্রাপ্তির মাধ্যমে। কাশীনাথের হঠাৎ করে গুরুতর আহত হবার ঘটনাটি অস্বাভাবিক মনে হয়। মৃতপ্রায় কাশীনাথকে দেখে কমলা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। ইতিবাচক দাম্পত্য জীবনের ইঙ্গিত প্রদানের মধ্য দিয়ে কাশীনাথের সমাপ্তি ঘটে।

[25] | ‡MvcvjP›' ivq, kirP›' (3q LÊÑc Îve jx), c‡ev ³, c.87

'রামের সুমতি' ১৩১৯ সালে ফাল্গুন- চৈত্র সংখ্যায় 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। যাদের শরৎ- প্রতিভা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাদের মতের পরিবর্তন ঘটে। বাৎসল্যরসের এমন মাধুর্যপূর্ণ সৃষ্টিতে পাঠক হৃদয় বিগলিত- প্রায়।

আড়াই বছর বয়সের রামলালকে নারায়ণীর হাতে সমর্পণ করে তার মাতা যখন স্বর্গে যান তিনিও হয়ত এই দেবর- ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক এত মুধুর হবে ভাবতে পারেননি। রামলাল স্বামীর বৈমাত্রেয় ভাই হওয়া সËও তার দুরন্তপনায় সকলেই যখন অতিষ্ঠ নারায়ণীর স্নেহ- ভালোবাসা যেন ততই হৃদয় উৎসারিত। দস্যিপনার সর্দার রামলালের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী তার বৌদি নারায়ণী। সে তার মায়ের জায়গা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু নারায়ণীর বিধবা মাতা দিগম্বরী তার দশ বছরের কন্যা সুরধুনীকে নিয়ে যেদিন এই সংসারে এসে ওঠে সেদিন থেকে তাদের নিত্য- কলহ আরম্ভ হয়ে সংসারে ফাটল ধরে। ফলে রামলালকে আলাদা করে দেওয়া হলে তার অপটু হস্তের রন্ধন- প্রচেষ্টা ও নারায়ণীর গোপন যন্ত্রণার চিত্র অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে চিত্রিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রামলালের সুমতি লাভের মধ্যে দিয়ে গল্পের একটি ইতিবাচক পরিণতি দান করা গেছে।

'নারীর লেখা' নামক প্রবন্ধটি ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে 'যমুনা'য় অনিলা দেবী ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। তার অন্যান্য প্রবন্ধে নারীর জয়গান গাইলেও এখানে তিনি তাদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন।

'পথনির্দেশ' ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি লিখে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। সমসময়ে লিখিত অন্য গল্পগুলির চাইতে এটিকে তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

পথনির্দেশের প্রধান তিনটি চরিত্র হচ্ছে গুণেন্দ্র, হেমনলিনী ও সুলোচনা—যাদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর কাহিনি। হেমনলিনীর

পিতা পতিতপাবন যক্ষ্মারোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করলে উপায়ান্তর না দেখে মাতা সুলোচনা বারো বছর আগের প্রতিবেশি কলকাতায় বসবাসকারী গুণেন্দ্রর বাড়িতে গিয়ে ওঠে। তারা ব্রাহ্ম হয়েছে জানতে পেরে সুলোচনা নিরাশ হয়। হেমনলিনী- গুণেন্দ্রকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে রাখার মানসে তাকে তার ধর্মের বোন বলে সম্পর্ক তৈরি করে দেয়। কিন্তু তারপরও তাদের বাধভাঙ্গা ভালোবাসাকে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি।

গুণেন্দ্র ও হেমনলিনী পরস্পরকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তাদের মিলন সম্ভব হয়নি, কারণ মাতা সুলোচনা সবকিছু জানার পরও তড়িঘড়ি করে ছত্রিশ বছর বয়সী বিপত্নীক কিশোরীবাবুর সাথে কন্যা হেমনলিনীর বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু স্বামী বা শ্বশুর বাড়িকে সে আপন করে নিতে পারেনি। বিধবা হয়ে সে আবারো গুণেন্দ্রর বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

মাতা মৃত্যুর পূর্বে নিজের ভুল স্বীকার করে একরকম গুণেন্দ্রর হাতেই তাকে সঁপে দিয়ে যায়। কিন্তু ধর্মের আড়ালে আকস্মিকভাবে হেমনলিনী নিজেকে গোপন করে নেয়। প্রেমের প্রচণ্ড দহনে দুজনেরই হৃদয় দগ্ধ হলেও সে প্রেমকে সার্থকতা দানে উভয়েই ব্যর্থ হয়েছে। গুণেন্দ্রর অটল সংযম তার প্রেমের ও পৌরুষের দাবীকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। গল্পের পরিণতিতে হেমকে বোন বলে সম্বোধন করে এতবড় ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে আকস্মিক সহজ সমাধানের মধ্যে দিয়ে কাশীতে গিয়ে তারা শান্তিলাভের পথ খুঁজেছে।

ভাগলপুরে থাকতে ১৮৯৬- ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'অনুপমার প্রেম' গল্পটি রচিত হয়। প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালে 'সাহিত্যপত্রে' চৈত্র সংখ্যায়। এই গল্পটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর আত্মহত্যা- চেষ্টা এবং গোবিন্দলালের উদ্ধার দৃশ্যের সাথে অনুপমার আত্মহত্যা এবং ললিতমোহন কর্তৃক উদ্ধারের ঘটনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ললিতমোহনের যে চরিত্র গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় তা ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের ঐ বয়সের চরিত্রের সাথে মিল লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া অনুপমার চরিত্রটির

সাথে নিরুপমা দেবীর অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাছাড়া নিরুপমার অন্য একটি নাম অনুপমাও ছিল। শরৎচন্দ্র এই নামটি তাঁর কোন কোন লেখায় ছদ্মনাম হিসেবেও ব্যবহার করেছিলেন। এটি ছোটগল্প হলেও উপন্যাসের জটিল কাহিনি এতে বিদ্যমান।

'বিন্দুর ছেলে' ১৩২০ সালে 'যমুনা'র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । ঠিক একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে'ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের কাছে বিন্দুর ছেলে লেখাটি অতটা ভালো মনে না হলেও এটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> "'বিন্দুর ছেলে' তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। বোধ হয় ওটা মন্দ হয় নি, কেন না, অনেকেই ভালো বলিতেছেন। অনেকে 'রামের সুমতি'র চেয়েও ভালো বলেন শুনিতেছি। প্রায় 'পথনির্দেশে'র কাছাকাছি।" [২৬]

যাদব মাধব দুই ভাই। তাদের স্ত্রী অbপূর্ণা ও বিন্দু দুই জা এবং একমাত্র ছেলে অমূল্যকে নিয়ে একাbবর্তী পরিবারের আবেগ, আনন্দ-বেদনা, কলহ-দ্বন্দ্বের রসঘন একটি চিত্র এই গল্পে অঙ্কিত হয়েছে। নিঃসন্তান বিন্দু জা'য়ের পুত্রটিকে নিজের অসুস্থতায় কোলে পেয়ে হৃদয় উৎসারিত স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে, আর কারো প্রবেশ সেখানে সে সহ্য করতে পারে না।

তৃতীয় পক্ষ এলোকেশী ও তার পুত্র নরেন সংসারে প্রবেশ করামাত্র তাদের প্রভাবে অমূল্যর অধঃপতনকে কেন্দ্র করে সংসার ভাগ হয়ে যায়। তবে সর্বংসহা অbপূর্ণা ও চরমসহিষ্ণু স্বামী যাদবের স্নেহের বন্ধন ভাগ হতে পারেনি। তাই বিন্দুর দেওয়া চরম আঘাত সহ্য করেও অbপূর্ণা যেমন তার রোগ-শয্যাপার্শ্বে পরম স্নেহ নিয়ে উপস্থিত থেকেছে, তেমনি যাদবও বৃদ্ধ বয়সে অর্থোপার্জনের কষ্ট সহ্য করা সËও রোগের কথা শুনে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বিন্দুকে দেখতে তক্ষণি রওয়ানা দিয়েছে। এ গ্রন্থে অbপূর্ণার ধৈর্যশীলতা এবং যাদবের মহত্ত্ব হৃদয়গ্রাহীরূপে চিত্রিত হয়েছে।

---

[26] | ‡MvcvjP›' ivq, kirP›' (3q LÊÑc Îve jx), c‡ev³, c.58

'নারীর মূল্য' ১৩২০ সালে 'যমুনা' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম ছাপা হতে শুরু করে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন,

> "দিদির 'নারীর লেখা' টা সম্বন্ধে বোধ করি তোমার কিছু কুরুচি ভাব উদ্রেক করবে, কিন্তু 'ট্রু_০ চাই-ই। আজকালকার দিনে এটারই সবচেয়ে প্রয়োজন। আমি নির্ভীক লোক—খাতির ক'রে কথা বলতে জানি না—তাই আমি নিজের ওপর এই ভার নিয়েছি, ঠিক এই ধরনের বারটা প্রবন্ধ লিখব।" [২৭]

নারীর মূল্য প্রকাশিত হবার পর খুব প্রশংসার পাশাপাশি সমালোচনাও কিছু হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন,

> "নারীর মূল্য অমূল্য। তোমরা এ-লেখককে হাত করবার চেষ্টা কর।" [২৮]

শরৎচন্দ্র সমগ্র জীবন অবহেলিত, নির্যাতিত, বিধবা নারীর কষ্ট অবলোকন করেছিলেন যা তাকে নাড়া দিয়েছিল গভীরভাবে। বিশ্বের নারীসমাজ সম্পর্কে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন চমৎকারভাবে।

'চন্দ্রনাথ' ১৩২০ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। ভাগলপুরে থাকতে বড়দিদি যখন লেখা চন্দ্রনাথও সেই সময়ে লিখিত হয়। অর্থাৎ এটিও প্রথমযৌবনের রচনা, তাই আতিশয্য থাকা স্বাভাবিক বলে লেখক নিজেই মনে করেছিলেন। ফলে সংশোধন করে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন থেকে সুরেন্দ্রনাথের কাছে চন্দ্রনাথের কপি চেয়ে পাঠালে তিনি কিছু কিছু অংশ কপি করে করে পাঠিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অল্পকিছু পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন, তিনি মনে করেছেন,

> "এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ immorality-র সংস্রব নাই, সকলেই পড়িতে পারিবে।" [২৯]

27| ‡MvcvjP›' ivq, kirP›' (3q LÊÑc Îve jx), c‡ev³, c.15-16
28| D×Z, AwRZ Kgvi †Nvl, kirP‡›'i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.113
29| D×Z, H, c.115

নিরপরাধ সরযূ'র মায়ের কৃত-অপরাধের শাস্তিস্বরূপ স্বামী চন্দ্রনাথকে সীমাহীন ভালোবাসা সত্ত্বেও নিষ্ঠুর সমাজের দাবী মিটানোর জন্য নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে—এমনই একটি কাহিনি নিয়ে চন্দ্রনাথ উপন্যাসটি রচিত। নিষ্ঠুর সমাজের নিষ্পেষণ এবং নারীর প্রতি পুরুষের তথা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির নM প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষশাসিত সমাজে যার অর্থবল আছে সেই সমাজপতি। মণিশঙ্কর, চন্দ্রনাথ এই দলেরই গোত্রভুক্ত সুতরাং সরযূকে ত্যাগও তাদেরই ইচ্ছায় আবার গ্রহণও তাদেরই ইচ্ছায় হয়েছে। মণিশঙ্কর একজায়গায় বলছে—

> ''সমাজ আমি, সমাজ তুমি। এ গ্রামে আর কেউ নেই; যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত মারতে পারি, আর তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মারতে পার। সমাজের জন্য ভেব না।'' (পরি:১৯)

পুঁজিবাদী সমাজে নারী পুরুষের ইচ্ছাধীন দাসী ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থনৈতিক মুক্তি না থাকার দরুণ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ ও মর্যাদাশূন্য হয়ে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া তার গত্যান্তর থাকে না।

এই উপন্যাসে বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্রের চরিত্রটি সুঅঙ্কিত। নিঃসঙ্গ, আত্মভোলা কৈলাসচন্দ্রের জীবনে সরযূ ও তার ছেলে বিশ্বেশ্বর আসার পর থেকে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বিশ্বেশ্বরকে কেন্দ্র করে তার আনন্দের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটছিল, ক্ষণিকের অতিথির বিদায়ে কৈলাসচন্দ্রের হৃদয়ের হাহাকার মিটেছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের ছয়মাস পর 'বিরাজ বৌ' ১৩২০ সালে পৌষ-মাঘ সংখ্যায় ছাপা হয়। ভারতবর্ষে এটি তাঁর প্রথম লেখা। যোগেন্দ্রনাথ সরকার বিরাজ বৌ সম্পর্কে লিখেছিলেন,

> ''এই বিরাজ-বৌ বই লিখিতে লেখকের মাসাধিক কাল লাগিয়াছিল।... লেখক আমাকে বলিতেন, দ্যাখ যতক্ষণ না এক্সপ্রেসনটা সহজ এবং ঝরঝরে মনে হয়, ততক্ষণ কিছুতেই আমার তৃপ্তি হয় না। রাত্রির লেখা দিনের বেলা ভুল বলে মনে হয়।'' [৩০]

[30] | D×Z, H, c.119

বিরাজ বৌ প্রকাশিত হবার পর এটি প্রশংসিত হলেও বিরাজের পতন বিষয়ে কেউ কেউ আপত্তি জানিয়েছিলেন।

বিরাজ– নীলাম্বরের বিশ্বাস ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ সুখী একটি দাম্পত্যজীবন শুরুতে চিত্রিত হয়েছে। সামাজিক আদর্শবোধের মূর্ত প্রতীক বিরাজ পাতিব্রত্যের চরম নিষ্ঠা তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন করেছে। কিন্তু হঠাৎ অভিমানে নৈতিক স্খলন ঘটে তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। রাজেন্দ্রর প্রতি কোনরূপ অনুরাগ না থাকলেও অভিমানে সুন্দরীর সহায়তায় বিরাজ তারই বজরায় গিয়ে ওঠে এবং সম্বিত ফিরে পেয়ে আত্মাহুতির মানসে প্রমত্ত নদীতে ঝাঁপ দেয়। সবাই বিরাজকে কুলত্যাগিনী মনে করলেও নীলাম্বর তা মেনে নেয়নি, সে তাকে সতী বলেই মানে।
তবে হঠাৎ সর্পের আঘাতে পীতাম্বরের মৃত্যু, ছোটবৌ মোহিনীকে নীলাম্বরের মা বলে সম্বোধন, উপন্যাসের শেষে বিরাজকে তারকেশ্বরে নিয়ে ফেলা, পথে পথে পঙ্গু ভিখারিনী রূপে ঘোরানো এবং নীলাম্বরকেও তারকেশ্বরে নিয়ে তাদের মিলন ঘটানো এই ঘটনাগুলো অতিশয্যদুষ্ট ও অস্বাভাবিক মনে হয়।

১৩২০ সালে 'পরিণীতা' উপন্যাসটি 'যমুনা'য় ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। কাহিনিবুননে, চরিত্রসৃষ্টিতে এবং বর্ণনামাধুর্যে শিল্পোৎকৃষ্ট এই প্রণয়ধর্মী রোমান্টিক উপন্যাসটি সুখপাঠ্য এতে সন্দেহ নেই। শেখর, ললিতা এবং গিরীন এই তিনটি প্রধান চরিত্রের মাধ্যমে প্রেম, ঈর্ষা, মানসিক দুঃখভোগ ও পরিণয় এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। শেখর ও ললিতার বাধাহীন প্রেমে বিপর্যয় এসেছে গিরীনের আগমনে এবং গুরুচরণের ধর্মান্তরিত হবার কারণে। গিরীন সুপাত্র হলেও ললিতার সাথে তার বিয়েতে একমাত্র বাধা ললিতা নিজে। কারণ সে জানে সে শেখরের পরিণীতা আর কারো সাথে তার বিয়ে হতে পারে না কারণ তারা মালাবদল করেছে।
কিন্তু তাদের ভুল বোঝাবুঝির কারণে শেখরের অন্যত্র বিবাহ ঠিক হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে গিরীনের একটি কথায় ললিতার প্রতি সমস্ত অভিমান শেষ হয়ে অবরুদ্ধ আবেগ

উচ্ছ্বসিত ধারায় প্রবাহিত হয়ে তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে উপন্যাসে ইতিবাচক সমাপ্তি ঘটে।

‘পণ্ডিত মশাই’ ১৩২১ সালে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
গ্রামের আদর্শচরিত্র পণ্ডিত মশাই বৃন্দাবন এবং কুসুমের পারস্পরিক জটিল সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠলেও পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের একটি বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। কুসুমের ভাই কুঞ্জনাথ চরিত্রটিও সমাজ- বাস্তবতারই একটি অনন্য সৃষ্টি।

শাস্ত্রমতে গ্রামের অবস্থাপb গৌরদাস অধিকারীর পুত্র বৃন্দাবন দাসের সাথে কুসুমের পাঁচ বছর বয়সের সময় বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের অনতিকাল পরে মায়ের নামে দুর্নাম উঠায় গৌরদাস ছেলের অন্যত্র পুনরায় দার পরিগ্রহ করায়। কুসুমকেও তার মা আবার আসল বৈরাগীর সাথে কণ্ঠীবদল করায়। ছয়মাস পর বৈরাগী নিত্যধামে গমন করে এবং চরণকে রেখে বৃন্দাবনের দ্বিতীয় স্ত্রীও গত হয়।

বর্তমানে বৃন্দাবন কুসুমকে ফিরিয়ে নিতে চায়। কিন্তু কুসুমকে রাজি করাতে না পেরে সেটি অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। কেন কুসুম রাজি হয় না তার কোন শক্ত কারণও ব্যক্ত হয়নি। ফলে তারা স্বামী- স্ত্রী হলেও এবং একে অপরকে ভালোবাসলেও সামাজিক বড় বাধা না থাকা সËেও কোন এক অনির্দেশ্য নির্দেশে শেষ পযর্ন্ত তাদের ঘর বাঁধা হয়নি। একমাত্র ছেলে চরণের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন সংসারের বন্ধন ছিb করতে চাইলে কুসুমও তার সঙ্গী হতে চায়। বিশ্বের সকল শিশুর মধ্যে বৃন্দাবন চরণকে খুঁজে পায়, যে মন্ত্রে চরণ তাকে দীক্ষিত করে গেছে সেই মন্ত্রে কুসুমকেও দীক্ষা নিয়ে বুকের জ্বালা জুড়াতে বলে। তাই পাঠশালার ভার বন্ধু কেশবের হাতে দিয়ে পথের ডাকে সাড়া দিয়ে উভয়ে বিশ্ব সংসারে চরণকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

‘হরিচরণ’ গল্পটি ১৩২১ সালে ‘সাহিত্যপত্রে’ একটি গৃহভৃত্যের করুণ কাহিনি নিয়ে প্রকাশিত হয়। ভাগলপুরে থাকতে সাহিত্যজীবনের শুরুতে

এটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। গল্পটির কোথাও কোথাও অসঙ্গতি, অস্বাভাবিকতা ও আতিশয্যদোষ পরিলক্ষিত হয়।

'আঁধারে আলো' ১৩২১ সালে 'ভারতবর্ষে' ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সহজ সরল যুবক সত্যেন্দ্র অপূর্ব রূপসী বিজলীকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলে তবে রহস্যময়ী নারী ছলনায় ভুলিয়ে তাকে নিয়ে খেলা করে। কিন্তু যখন তাকে ভালোবাসার অনুভূতি নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করে তখন প্রত্যাখ্যাত হয়। সতেন্দ্র রাধারাণীকে বিয়ে করে কিন্তু বিজলীকে ভুলতে পারেনি। ছেলের অbপ্রাশন উপলক্ষে তাকে নিমন্ত্রণ জানালেও ঘটনাচক্রে তাদের সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু বিরহের মধ্যেই ভালোবাসা নিশ্চয় জীবিত ছিল।

'মেজদিদি' ১৩২১ সালের কার্তিক মাসে 'ভারতবর্ষে' বাৎসল্যরসের মাধুর্য ও বেদনার চমৎকার গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়। কেষ্ট কাদম্বিনীর ভাই হওয়া সËেও তার কাছ থেকে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার ছাড়া সে আর কিছু পায়নি। অথচ মেজদিদি হেমাঙ্গিনী নিঃসম্পর্কিত ও অনাত্মীয়া হওয়া সËেও সহানুভূতি, স্নেহ- আদর সমস্তই সে এই অসহায় ছেলেটির প্রতি দেখিয়ে নিজের মমত্ববোধ প্রমাণ করেছে।

ফলে অসুস্থ মেজদিদির কাছে অনাথ কেষ্ট দুর্নিবার বেগে ছুটে যেতে চেয়েছে, তাকে দেখতে চেয়েছে, তার জন্য পূজা করেছে, তাকে সুস্থ করতে চেয়েছে বিনিময়ে পেয়েছে শাস্তি কিন্তু সে অত্যাচারও সে সহ্য করেছে। এসবের ভিতর দিয়ে মেজদিদির প্রতি তার হৃদয়ের ভালোবাসার মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে।

'দর্পচূর্ণ' গল্পটি ১৩২১ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। এটি মূলত স্বামী- স্ত্রীর দ্বন্দ্ব- সংঘাত এবং মিলনকে কেন্দ্র করে রচিত। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় নরেন্দ্রর সাথে পিতৃ- ঐশ্বর্যে গর্বিত ইন্দুমতির মানসিক দূরত্ব তৈরীকে কেন্দ্র করে কাহিনি এগিয়েছে। পিতৃ- গৃহে এসেই এই ধনগর্বে গর্বিতা নারী সে তার স্বামী- প্রেমকে বুঝতে পারে। এবং তার দর্প চূর্ণ হবার মধ্যে দিয়ে নরেন্দ্রকে ফিরে পায়।

‘পল্লীসমাজ’ ১৩২২ সালে ‘ভারতবর্ষে’ আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ–পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নামকরণেই বোঝা যায় উপন্যাসটি সমাজের গূঢ় রহস্য–জটিল সম্পর্কের এবং সমাজবাস্তবতার সুস্পষ্ট চিত্র এতে বর্তমান। সমাজের কুসংস্কার বিরূপতা, সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের ট্র্যাজিক পরিণতি এতে চিত্রিত হয়েছে। রমা ও রমেশ বাল্য প্রণয়ী হলেও পরিণত বয়সে সে প্রেম নিষিদ্ধ, বিগর্হিত কারণ রমা বিধবা। সমাজ বিধবাকে ভালোবাসার অধিকার দেয় না।

এ সম্পর্কে সে সময় বিভিb সমালোচক বিভিb রকম অভিযোগ করেছিলেন। তাদের মতে, ‘এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না।’

উËরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,

> ‘‘এতবড় দুটি মহাপ্রাণ নর–নারী এ–জীবনে বিফল ব্যর্থ পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এতবড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, একথা আমি নিশ্চয় জানি।’’ [৩১]

রমা–রমেশের ব্যর্থ প্রণয়ের ট্র্যাজিক পরিণতির পাশাপাশি সমাজের সামগ্রিক বিষয় যেমন সামাজিক দলাদলি, ঝগড়া–বিবাদ, কোন্দল এ উপন্যাসের আলোচ্য ছিল। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতা, গ্রামের কুটকচালি, শিক্ষাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, ব্যক্তি উদ্যোগে শুভপ্রয়াস গ্রহণে অনীহা ইত্যাদি গ্রামীন সমস্যা তুলে ধরার সাথে সাথে এর সমাধানের প্রয়াসের কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন বিশদভাবে।

স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, বলিষ্ঠ দেহ, শক্তিশালী বাহু, সতেজ ও সক্রিয় মনের অধিকারী রমেশ ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কঙ্কালমূর্তি ভেঙ্গে নতুন ও উbত সমাজ গঠনের প্রয়াসী হয়েছে। অশিক্ষা, জাতিগত বৈষম্য, শাসকশ্রেণির মনগড়া

---

[31] | D×Z, H, c.132

ফতোয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে সে। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমাজপতিরা সমাজের সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন ফলে রমেশের সাথে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। পল্লীসমাজে বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার এই কর্তাশ্রেণিরই প্রতিভূ। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মনত্ব্য বজায় ছিল বলে পরপ্রসাদভোগী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মদাস, দীনু ভট্টাচার্য, বাড়ুয্যে মশাইও এই শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ফলে শুভ- মনোভাব নিয়ে গ্রামের উপকার করতে আসা রমেশকে নীচ, স্বার্থান্বেষী বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর চক্রান্তে জেলে পযর্ন্ত যেতে হয়েছে।

রমা ও রমেশের প্রণয় সম্পর্ক- জটিল মনস্তত্ত্ব-নির্ভর। বাল্যসখী রমার প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণবোধ করা এবং ভালোবাসা সত্ত্বেও তাদের বাহ্যিক আচরণে তা প্রকাশ পায়নি কখনো। রমার দেওয়া আঘাতে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিন্তু ভালোবাসা তাতে কমেনি। তারকেশ্বরে একটি দিনের জন্য রমাকে সে কাছে পেয়েছিল, রমাও তার রূঢ় বাহ্যসত্তা থেকে বেরিয়ে অন্তরের আনÿানে সাড়া দিয়ে ভালোবাসার মানুষটিকে প্রাণভরে যZ করে খাইয়ে তৃপ্তিবোধ করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে সে সমাজ- অনুগত হয়ে রমেশের বিরোধিতা করলেও নিজের লোকের পরাজয়ে এবং রমেশের সুরক্ষার সংবাদে সে বেশি শান্তিলাভ করেছে। রমা চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব- বিরোধের কারণেই তার ব্যক্তিসত্তাটি আরো আকষণীয় হয়ে উঠেছে। রমেশের প্রতি কোনরূপ দুর্বলতা লোকসম্মুখে সে প্রকাশ হতে দেয় নি।

রমেশও তার মহৎ- মানসিকতা এবং দৃঢ়- সত্যনিষ্ঠা নিয়ে সার্বক্ষণিক পাশে থেকেছে। কিন্তু তারপরও উপন্যাসের সমাপ্তিতে এতবড় ভালোবাসার মিলন ঘটেনি, সমস্ত অপমান অপযশ মাথায় নিয়ে তাকে কাশীতে চলে যেতে হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত করতে। শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজে রমা- রমেশের ভালোবাসার ট্র্যাজিক পরিণতি দানে বাধ্য হয়েছেন হয়ত ভবিষ্যৎ বিধবা নারীদের ভালোবাসার মানুষের সাথে মিলনাকা•¶ায়।

‘বৈকুণ্ঠের উইল’ ১৩২৩ সালে ভারতবর্ষে’র জ্যৈষ্ঠ–শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও স্নেহ এবং সকল জটিলতা অতিক্রম করে স্নেহের জয়লাভঃ বাঙালি সমাজের পারিবারিক জীবনের বিপরীতধর্মী অথচ এমনই একটি মাধুর্যপূর্ণ প্লট নিয়ে বৈকুণ্ঠের উইল উপন্যাসটি রচিত। নির্বোধ গোকুলের পিতা বৈকুণ্ঠ কর্তৃক হঠাৎ সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে যাওয়া এবং মূর্খ ও নির্বোধ বলে স্ত্রী মনোরমা কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় সাংসারিক অশান্তি শুরু হওয়া সত্ত্বেও গোকুলের মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ প্রচ্ছন্ন ছিল।

নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করে মেয়ে–জামাইকে উদ্ধারের মানসে নিমাই রায় যেদিন তাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন সেদিন থেকেই প্রকৃত পক্ষে গোকুলের সংসারে ভাঙ্গনের সুর বেজে ওঠে। তবে স্ত্রী ও শ্বশুর কর্তৃক পরিচালিত ও বিভ্রান্তহওয়া সত্ত্বেও সোনার মেডেল পাওয়া অনার গ্রাজুয়েট বিনোদ সম্বন্ধে গোকুলের গর্ব ছিল কারণ ওর কোন দোষত্রুটি তার নজরে পড়ত না। ফলে সকল অশুভশক্তিকে পরাভূত করে শেষপর্যন্ত ভাতৃস্নেহ ও মাতৃভক্তি জয়লাভ করেছে।

‘অরক্ষণীয়া’ ১৩২৩ সালে ‘ভারতবর্ষে’ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সমাজে নারী–অবমাননার ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এতে। জ্ঞানদার পিতার মৃত্যুর সময় অতুল তাকে গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে তা অস্বীকার করে। জ্ঞানদা দরিদ্র পিতার সন্তান, তার উপরে তার গায়ের রঙ কালো এবং বয়স তেরো/চৌদ্দ বছর অতিক্রান্ত–প্রায়। যেখানে দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত সেখানে পাত্র জোটানো অসম্ভব–প্রায়, ফলে কাকার সংসারে লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে মায়ের সঙ্গে উপায় খুঁজতে মামাবাড়ি হরিপালে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়েও উপায়হীনের উপায় হয় না, বরঞ্চ হিতে বিপরীত হয়।

বন–জঙ্গলের মধ্যে থেকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কালো চেহারা আরো কুৎসিত হয়। মামা জোর করে টাকার লোভে শ্যালকের সাথে বিয়ে দিতে চেষ্টা করে কিন্তু অবিস্মরণীয় চরিত্র পোড়াকাঠ মামির সহায়তায় জ্ঞানদা রক্ষা পায় এবং আবার কাকার আশ্রয়ে ফিরে আসেঃ কিন্তু স্বর্ণমঞ্জরীর

নিষ্ঠুর পরিহাসে এবং প্রতিবেশিদের সান্ত্বনা দানের ছলনায় তীর্যক মন্তব্য তাকে উপর্যুপরি বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে সে উদ্ধারের আশায় ঘাটের মড়া গোপাল ভট্টাচার্যের মন ভুলানোর জন্য অপটু হস্তে প্রসাধনের সদ্ব্যবহার করে কিন্তু পরিণামে শ্মশানযাত্রীর প্রত্যাখ্যান এবং প্রতিবেশিদের হাস্যের উদ্রেক ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। এই ঘটনাটির দ্বারা লেখক একটি অসহায় কন্যার অসহায়ত্ব ও হৃদয়ের হাহাকার একটি অসাধারণ চিত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন।

জ্ঞানদার ধৈর্যশীলতা ও অপরিসীম বেদনা পাঠক চিËকে রোদুদ্দমান করে তোলে। শান্ত, ধীর- স্থির, কঠোর সংযমের অধিকারী জ্ঞানদা অতুলের হঠাৎ হওয়া দেহের নশ্বরতা সম্পর্কিত উপলব্ধি এবং উপকারীর প্রতিদানস্বরূপ তাকে গ্রহণের আহবানে সাড়া দিয়ে তার অনুবর্তী হয়েছে।

১৩২৩ সালের চৈত্র ও ১৩২৪ সালের বৈশাখ- আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' 'দেবদাস' প্রকাশিত হয়। এটি তার সাহিত্য জীবনের প্রথমদিককার রচনা। দেবদাস চরিত্রটির সাথে তার নিজের জীবনের কিছু মিল থাকা অস্বাভাবিক নয়।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একবার তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> "'দেবদাস' নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও ক'রো না।... ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা ইমgরাল, বেশ্যাচরিত্র তো আছেই, তাছাড়া আরও কি কি আছে ব'লে মনে হয়। আর আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপË, তা তোমাদের কাগজেই হোক, আর ফণীর কাগজেই হোক।" ৩২

তবে দেবদাস প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্রের এই চিন্তাটা ভুল প্রমাণিত হয়।

ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে,

> "শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনার মধ্যে এই উপন্যাসখানি সর্বশ্রেষ্ঠ।" ৩৩

32| ‡MvcvjP›`ª ivq, kirP›`ª (3q LÊÑcÎvejx), c‡ev³, c.55
33| m‡evaP›`ª †mb¸ß, kirP›`ª, mß`k ms¯‹iY: AMnvqY 1407, c.36

দেবদাস- পার্বতীর বাল্য- প্রণয়, পরস্পরের প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ সত্ত্বেও পরিণত বয়সে পরিণয় না হতে পারা, পার্বতীর অন্যত্র বিবাহ, দেবদাসের মদ্যাসক্তি এবং বারবনিতাসক্তি, পার্বতীর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের শেষ সময়ে প্রেমাস্পদের আজন্মের সাধ মেটাবার জন্য তার সেবালাভের আশায় তারই বাড়ির সামনে মৃত্যুবরণ করা এমনই প্রেমের মাধুর্যপূর্ণ প্লট ও ট্র্যাজিক পরিণতি নিয়ে দেবদাস উপন্যাসটি রচিত।

নিতান্ত প্রতিবেশি এবং বেচাকেনা ঘরের মেয়ে বলে দেবদাসের পিতা জমিদার নারায়ণ মুখুয্যে তার বিবাহ পার্বতীর সঙ্গে দিতে রাজি হননি। ফলে দুটি সম্ভাবনাময় জীবন সীমাহীন অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রচলিত সমাজের তৈরি নিয়মকানুন এবং কুসংস্কারকে অক্ষুন্ন রাখতে দেবদাস-পার্বতীর এতবড় ভালোবাসাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। কিন্তু পার্বতী নিজের অন্তরে দেবদাসকেই স্বামী হিসেবে চিনে নিয়েছিল। তাই বিবাহের পরও দেবদাসের সাথে দেখা হলে সে তার হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করে, তার চরম পতনে ব্যথিত হয়, তাকে তার শ্বশুরগৃহে এসে থাকতে আমন্ত্রণ জানায়। এমনকি জীবনের শেষ সময়ে হলেও তার বাড়িতে যাবার প্রতিজ্ঞা করায়। দেবদাস তার কথা রেখেছিল, পার্বতীর বাড়ির সামনে শেয়াল- কুকুরে মত মৃত্যুবরণ করে ইহজীবনের যান্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় কিন্তু পার্বতীর পক্ষে সেটাও সম্ভব হয়নি। তাদের জীবনের সমস্ত ট্র্যাজিডি বহন করার জন্য তাকে একাই বেঁচে থাকতে হয়েছে।

শিল্পমাধুর্যে পরিপূর্ণ এই উপন্যাসটির কাহিনিপরিকল্পনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে, সংলাপে, পতিতানারী সংসর্গের চিত্র বর্ণনায় সর্বত্র যে সংযম রক্ষা করা হয়েছে তা এক কথায় অসাধারণ।

'নিষ্কৃতি' গল্পটির প্রথম কিছু অংশ 'ঘরভাঙ্গা' নামে ১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। সমগ্র অংশ ১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্পের মত এখানেও একাbবর্তী পরিবারের আনন্দ-বেদনা, তুচ্ছ বিষয়ে দ্বন্দ্ব এবং পরিণতিতে ইতিবাচক সমাধানের পর

গল্পের সমাপ্তি ঘটে। গিরীশ, হরিশ ও রমেশ তিন ভাই। গিরীশ ও রমেশ এবং তাদের পরিবারের সন্তানসন্ততি মিলে একাbবর্তী পরিবার। গিরীশ আদালতের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত আর রমেশ বেকার হলেও সংবাদপত্রের রাজনীতির একজন সমঝদার বোদ্ধা।

গিরীশের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী ছেলেমেয়েদের তË্বাবধান করে এবং ব্যক্তিত্বময়ী শৈলজা নিপুণহস্তে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করে। কিন্তু এদের এই নিপাট সংসারে মধ্যম ভ্রাতা হরিশ এবং নয়নতারা প্রবেশ করা মাত্র অশান্তির আগুন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ফলে শৈলজা- রমেশকে পৃথক হতে হয়।

গিরীশ ও সিদ্ধেশ্বরীর মমত্ববোধ প্রকৃতঅর্থে তাদের আলাদা হতে দেয়নি। সিদ্বেশ্বরী শৈলজার উপরে বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ করলেও ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত স্নেহ ছিল আর গিরীশ রমেশকে শাসন করার ছলে অত্যধিক স্নেহবশত তাকে আরো অর্থ দেয়।

বিবাদমান বিভক্তির পর ব্যক্তিত্বময়ী শৈলজা চরিত্রটির মাধুর্য শেষ পর্যন্ত আর রক্ষিত হয়নি। পুরো গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে কৌতুকরস; ফলে কোন কোন চরিত্রে এর প্রভাব পড়েছে বেশি, কোনটায় কম। গল্পের শেষে শৈলজার নামে সমস্ত সম্পË দানপত্র করে দিয়ে গিরীশ তার মহানুভবতারই আর একবার প্রমাণ দিয়েছে।

বড় বড় লেখকরা কোন কোন সময় উËম পুরুষের ভাষ্যে গল্প-উপন্যাস লিখে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় নায়ক বা নায়িকার বা অন্য কোন চরিত্রের মুখ দিয়ে কাহিনি বর্ণনা করিয়েছেন। যেমন ‘রজনী’ (১৮৭৭) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিb চরিত্রের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণনা করেছেন, ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এই রীতি ব্যবহার করেছেন, তেমনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তার ‘স্বামী’ (১৩২৪) নামক গল্পে নায়িকার মুখ দিয়ে পুরো গল্পটি বলিয়ে নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'স্বামী' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩২৪ সালে 'নারায়ণ' পত্রিকায় শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায়। নারায়ণ-সম্পাদক চিËরঞ্জন দাস খুশি হয়ে শরৎচন্দ্রকে একটি e¨v¼ চেক দিয়েছিলেন। কিন্তু লেখক সেখানে মাত্র একশত টাকা লিখে ভাঙ্গিয়ে নিয়েছিলেন।

নায়িকা সৌদামিনীর সাবলীল বর্ণনার ভিতর দিয়ে তার প্রেম, বিবাহ, কুলকলঙ্ক এবং স্বামীর কাছে ফেরার চমৎকার গল্প এতে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম যৌবনে সে নরেনকে ভালোবেসেছিল কিন্তু যেদিন রাধাবিনোদ মুখুয্যের ছেলে দোজবরে ঘনশ্যামের সাথে বিয়ে হয়ে যায় সেদিন সে ভেবেছিল তার ভালোবাসার মৃত্যু ঘটেছে। স্বামীর ঘরে সে স্বামীকে চিনতে পারেনি, তাকে আপন করে নিতে পারেনি। স্বামীগৃহ ত্যাগ করার পর সাথে সথে বুঝতে পেরেছে, স্বামীকে সে ভালোবাসে। তাই নরেনের সাথে ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসার পর অনুতপ্ত চিËে সে আকুতি জানিয়েছে তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। শেষে নরেন নয়, স্বামী ঘনশ্যামই তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে, বলেছে—"আমি জানি তুমি আমারই আছ। বাড়ি চল।"

১৩২৪ সালে 'ভারতবর্ষে' কার্তিক সংখ্যায় 'একাদশী বৈরাগী' গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং পরে 'স্বামী' গল্পটির সাথে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে ঐ বছরই ফাল্গুন মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয়।

গল্পটির শুরুটা অপূর্বর হঠাৎ করে সনাতন-ধর্মনিষ্ঠ হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে হলেও একাদশীর চরিত্র চিত্রণই এখানে মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। স'গোপের ছেলে একাদশী একই সাথে দুইটি সËা বহন করেছে—একটি ভালো অপরটি মন্দ। সে একদিকে যেমন নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সুদখোর মহাজন, অপরদিকে তেমনি ¯েœহশীল বিশেষ করে বৈমাত্রেয় ভMি গৌরীর প্রতি। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে প্রলোভনে পড়ে গৌরীর পদস্খলন হলে সমাজে তারা পতিত হয়। কোলে-পিঠে করে মানুষ করা বোনকে পরিত্যাগ এবং প্রায়শ্চিË করে একাদশী সমাজে উঠতে চায়নি। ফলে সে ভMিকে নিয়ে বৈষ্ণব সেজে বারুইপুর গ্রামে পালিয়ে এসে বসবাস করতে থাকে।

অপূর্বর দল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার অর্ধেক টাকাই একাদশীর কাছ থেকে আদায় করার মানসে তার কাছে ডোনেশন চাইতে আসে। অপূর্বর তৃষ্ণার কথা জানতে পেরে গৌরী জল নিয়ে এসে চরম অপমানের শিকার হয় কিন্তু তারপরও সে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি বরঞ্চ অন্তরাল থেকে অসহায় বিধবার প্রতি তার মমত্ববোধ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় অবস্থান দর্শনে অপূর্বর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। ফলে ঘোষালের বাড়িতে জলপানের আnŸানে সাড়া না দিয়ে অপূর্ব গৌরীর সাধা জল খেতেই একাদশীর বাড়ির দিকে পুনঃযাত্রা করে।

‘দËা’ উপন্যাসটি ১৩২৪ সালের পৌষ- চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ- ভাদ্র সংখ্যা ‘ভারতবর্ষে’ প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে নরেন ও বিজয়ার মিষ্টি লাজুক প্রেম নানা ঘটনা, সংশয়, জটিলতা ও নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে মিলনাত্বক পরিণতি পেয়েছে।

প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী হওয়া সËেও বিজয়া রাসবিহারী এবং বিলাসবিহারীর কুটকৌশল এবং বিছানো জালে মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে আবার সেটি কেটে বেরিয়ে দীর্ঘদেহী নরেনের প্রতি গোপন অনুরাগ পোষণ করা থেকেও বিরত থাকতে পারে নি।

পিতা বনমালী বিজয়াকে নরেনের সাথে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাপোষণ করেছিলেন। কিন্তু সম্পËির প্রতি অত্যধিক লোভের কারণে রাসবিহারী তার ছেলে বিলাসবিহারীর সাথে বিজয়াকে বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পËির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কিন্তু বিজয়ার হঠাৎ নরেনের প্রতি অনুরাগে তাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে দেখে অতিথিদের সামনে বিলাস- বিজয়ার বিয়ের কথা ঘোষণা করে বসে রাসবিহারী। শালীনতা ও সংকোচবশত বিজয়া অতিথিদের সামনে এর জোর প্রতিবাদ জানাতে পারেনি।

জগদীশের কাছে লেখা বনমালীর পত্র মারফত নরেন- বিজয়ার বিবাহ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়টি বিজয়ার কাছে নরেনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলেও নলিনীর সাথে নরেনের প্রেমের সম্পর্ক মনে মনে

আবিষ্কার করে সে বিলাসবিহারীকে বিয়ের ব্যাপারে সম্মত হয়। উপন্যাসের শেষে নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে দয়ালের সহায়তায় সন্দেহ নিরসনের মাধ্যমে পাত্র পরিবর্তিত হয়ে বিজয়া নরেনের দËা হয়। সে বাহ্ম হলেও হিন্দু মতেই কানা ভট্টাচার্যের পৌরহিত্যে তাদের বিবাহ সম্পb হয়।

রাসবিহারী চরিত্রটি অঙ্কনে শরৎচন্দ্র কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্তরে কুটকৌশলী হওয়া সত্ত্বেও বাহিরে ধর্মের ধ্বজা ধরে মার্জিত, সংযত আচরণ বিজয়াকে বিভ্রান্ত করেছিল। উপন্যাসের শেষে অন্যের জন্য পাতা ফাঁদে নিজেই পড়ে নাস্তানাবুদ হয়েছে যা পাঠককে নির্মল আনন্দ দিয়েছে।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'ছবি', 'বিলাসী' ও 'মামলার ফল' এই তিনটি গল্প নিয়ে 'ছবি' প্রকাশিত হয়।

সতীশচন্দ্র দাস তাঁর 'শরৎ- প্রতিভা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> "ছবি গল্পের নায়ক বা- থিন সত্য চরিত্র।"

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বা- থিন নামক এক চিত্রশিল্পীর কাছে শরৎচন্দ্র চিত্রবিদ্যা শিখেছিলেন। তবে বাস্তবের বা- থিনের সাথে হুবহু মিল হয়ত গল্পের বা- থিনের সাথে নেই।

বা- থিন ও মা- শোয়ের পারস্পরিক ভালোবাসা, ভুল বোঝাবুঝি ও অন্তে মিল নিয়ে 'ছবি' গল্পের কাহিনি নির্মিত। বা- থিন শান্ত, ধীর স্থির সংযত চরিত্রের অধিকারী; মনের আবেগ প্রকাশে উচ্ছ্বাসী নয়। অপর দিকে মা- শোয়ে উচ্ছ্বাসপ্রবন, ঐশ্বর্য- বিলাসব্যসন- প্রিয়। বা- থিনের অন্তর্মুখি প্রেম তাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। তাই বলিষ্ঠ পোথিনকে দেখে তার চিত্তে উন্মাদনা জেগেছিল। পোথিনের সাথে ভালোবাসার অভিনয় করে বা- থিনের ঈর্ষা জাগাতে চেয়ে ব্যর্থ মা- শোয়ে নিজেই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত- বিক্ষত হয়েছে। গল্পের শেষে হঠাৎই বা- থিন- মা- শোয়ের মিলন ঘটানো হয়েছে।

‘বামুনের মেয়ে’ ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। সামাজিক ব্যাধি কৌলিন্য প্রথাকে কেন্দ্র করে গল্প লেখার আগে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন,

> “এখন ত আর কৌলীন্য নেই, একজনের ১০০টা বিয়ে নেই। plot- এর ত ভাবনা নেই—তবে আর এটাকে ঘেটে কি হবে? তবে যদি সাহস থাকে লেখো, কিন্তু কিছু মিছে কল্পনা করো না।” [৩৪]

সমাজে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা, নীচু জাতের প্রতি তীব্র ঘৃণা নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা কালীতারা স্বামীর বহুপত্নীর এক পত্নী—যিনি স্বামীর নিয়োজিত নাপিতকে স্বামীজ্ঞানে তার ঔরসজাত সন্তান গর্ভে ধারণ করে প্রিয়নাথকে জন্ম দেন।

প্রিয়নাথের একমাত্র কন্যা সন্ধ্যাকে নিয়ে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। সন্ধ্যার মাতা কুলীনকন্যা জগদ্ধাত্রীর কাছে কন্যার সুখের চাইতে কৌলিন্যপ্রথা রক্ষাই মুখ্য বিষয় ছিল। তাই অরুণকে ভালোবাসা সত্ত্বেও সন্ধ্যাকে তার সাথে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি কারণ সে কুলীন ব্রাহ্মণ নয়।
সন্ধ্যা নাপিতের মেয়ে আবিষ্কার হবার পর সন্ধ্যাকে গ্রহণের ব্যাপারে অরুণের দ্বিধা সন্ধ্যাকে দূরে চলে যেতে বাধ্য করে।

শরৎচন্দ্র বামুনের মেয়েতে পাশাপাশি দুটি চরিত্র অঙ্কন করেছেন, একটি গোলক চাটুজ্যে অপরটি প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ আত্মভোলা, সরলমনা, বিষয়বুদ্ধি ও বাস্তবজ্ঞানহীন ভালোমানুষ। সে নাপিতের সন্তান। অপরদিকে কুলীন ব্রাহ্মণ গোলক চাটুজ্যে এমন একটি অভিশপ্ত ঘৃণ্য চরিত্র সংসারে এমন কোন অপরাধ নেই যা তার দ্বারা সংঘটিত হয়নি। শরৎসাহিত্যে এমন আর একটি চরিত্র বিরল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল ভেড়া পাঠানোর ব্যবসা, মুসলমান ব্যবসায়ীকে সুদি কারবারে গরুচালানের ব্যবসা, মৃত স্ত্রীর প্রতি তীব্র প্রেম সত্ত্বেও আশ্রিতা অসহায় বিধবা নারীকে জোর করে ভোগ করা, ভ্রূণ নষ্ট করতে রাসমণির সহায়তা নেওয়া এবং এই পাপের বোঝা ভোলাভালা প্রিয়নাথের

---

[34] | D×Z, AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›‘i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.212

কাঁধে চাপিয়ে তাকে বাড়ি ছাড়া করা—এসব অপরাধই তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। সন্ধ্যার বিয়ে পণ্ড করতে বিবাহ মণ্ডপে তার কুলকলঙ্কের কথা লোকমুখে প্রচার করেছে এবং কলঙ্ক বিমোচনের উপায় হিসেবে তার পাণিপ্রার্থী হয়েছে। শরৎচন্দ্র কৌতুক রসের মধ্যে দিয়ে এই চরিত্রটিকে নানাভাবে সম্বোধন করে ব্যঙ্গ বা শ্লেষের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করে পাঠকের মনেও ঘৃণামিশ্রিত হাস্যরসের উদ্রেক করেছেন। সমাজে ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং কৌলীন্যের মোহ এত নির্মম যে হঠাৎ করে জাতহীন স্বামী- কন্যার গৃহ ত্যাগ করে চিরতরে চলে যাবার মুহূর্তেও জাতগর্বিতা- স্ত্রী দরজা খুলে একবার বিদায় বলতেও ঘৃণা বোধ করেছে।

'নববিধান' ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে কাহিনির জটিলতা, সম্পর্কের গভীরতা, ঘটনার কার্যকারণ পরম্পরা সুঅঙ্কিত হয়নি।
শৈলেশ নামজাদা কলেজের বিলাতী ডিগ্রীধারী দর্শনের অধ্যাপক। আচার- আচরণে, চলনে- বলনে, চিন্তায়- চেতনায় বিলাতী ঢং তার যত তার বোন বিভার অহঙ্কার আর একটু বেশী। ন'বছর বয়সের সোমেনকে রেখে পZxবিয়োগ ঘটলে শৈলেশ ভবানীপুরের ভূপেন বাঁড়ুজ্যের দেখতে ভালো, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ মেজমেয়েকে বিয়ের পায়তারা করে। বন্ধুমহলে কথাটি উঠলে আঠার বছর বয়সে বিয়ে করা এগার বছর বয়সী বউ উমেশ তর্কালঙ্কারের কন্যা ঊষাকে নিয়ে ঘর করার পরামর্শ দেয় তারা। ফলে ঊষা ভায়ের সংসার থেকে স্বামীর সংসারে নীত হয়। সেবাযZ, আদর ন্নেহে ছেলেকে নিয়ে স্বামীর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালোভাবেই গড়ে উঠছিল কিন্তু বোন বিভার সামান্য কথায় ঊষা স্বামীর সংসার ছেড়ে আবার ভায়ের কাছে ফিরে যায়।

উপন্যাসের শেষে আবারো ঊষা স্বামী সংসারে ফিরে এসে নিজের আসনে অধিষ্ঠিত হয় কিন্তু এই আসা যাওয়ার ভিতরে যে মান- অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি, বেদনা- হতাশা, হৃদয়ের আকুতি বা ব্যাকুলতা প্রকাশিত হবার কথা সেটি পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া শৈলেশের হঠাৎ করে বৈষ্ণব ধর্মতË বিশ্বাসী হয়ে ওঠার নেপথ্য কাহিনি বর্ণিত হয়নি।

‘হরিলক্ষ্মী’ ১৩৩২ সালে ‘শারদীয়া বসুমতি’তে, ‘মহেশ’ ও ‘অভাগীর স্বর্গ’ আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যা ‘বঙ্গবাণী’তে ১৩২৯ সালে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে এই তিনটি গল্প নিয়ে ‘হরিলক্ষ্মী’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

‘বিপ্রদাস’ উপন্যাসটি ১৩৩৯- ৪১ সাল পযর্ন্ত ছাড়া ছাড়া ভাবে ‘বিচিত্রা’য় প্রকাশিত হয়। বিচিত্রায় মুদ্রণের আগে উপন্যাসটির প্রথম দশ পরিচ্ছেদ ‘বেণু’তে ছাপা হয়েছিল। বিপ্রদাস শরৎচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের ছোটমামার নাম ছিল বিপ্রদাস। তিনি নিজের আত্মীয়- স্বজনের নাম গল্প- উপন্যাসে ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একস্থানে উল্লেখ করেছিলেন, বাস্তবের বিপ্রদাসের সাথে উপন্যাসের বিপ্রদাস চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

বিপ্রদাস জন্মসূত্রে প্রভূত সম্পাËর উËরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি যেমন সুদর্শন ও বলিষ্ঠদেহের অধিকারী তেমনি জমিদারী পরিচালনায়ও তার অসীম দক্ষতা ছিল। তিনি কঠিনে কোমলে মিশানো এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বিমাতার প্রতি তার শ্রদ্ধা পূজার পর্যায়ে হলেও সংকট মুহূর্তে বিমাতার উগ্রমূর্তি এবং জামাতার পক্ষাবলম্বন বিপ্রদাসকে হতবিnŸল করে তোলে। ভMপতির কারণে বিপ্রদাসকে রিক্ত হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতে কৃষক শ্রমিকের অসন্তোষ এবং সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা, দ্বিজদাসের বিদ্রোহী নেতা হবার ইচ্ছা দেখা গেলেও উপন্যাসের পরবর্তী অংশে তা আর পাওয়া যায় না। শেষ অংশে জমিদারী মনোভাবই তার প্রস্ফুট ছিল।

‘শেষপ্রk’ ও ‘বিপ্রদাস’ একইসময়ে লেখা হলেও দুটোর দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে ভিb। সমাজ সংস্কারে বিপ্লব ঘটানোর যে প্রত্যয় শেষপ্রck দেখা গেছে সমসময়ে লিখিত হলেও বিপ্রদাসে সেই বিপ্লবের পরিবর্তে প্রাচীন সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস

দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি তার নিষ্ঠা যেমন অবিচল, গোড়ামির প্রতি ঘৃণাও তেমনি গভীর ছিল।

শরৎ- সাহিত্যে বন্দনা চরিত্রটি কিছুটা ব্যতিক্রমী। কথা- বার্তা, চাল- চলন, আচার ব্যবহার, পোশাক- আশাকে সে আধুনিকা ও প্রগতিশীলা। গ্রন্থমধ্যে নানাজনের প্রতি তার অনুরাগ নজরে আসে। তবে শেষে জানা যায় বিপ্রদাসের প্রতি গভীরভাবে সে অনুরক্ত। প্রাচীন সংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামী, ছোঁয়াছুঁয়ি, দয়াময়ীর নিষ্ঠুরতা তাকে যতখানি বিদ্ধ করেছে বিপ্রদাসের প্রতি সে ততখানি তীর্যক ব্যঙ্গের সাহায্যে তাকে আঘাত কর জাগাতে চেয়েছে। কিন্তু বিপ্রদাসের ধৈর্য তার ধ্যানমMতা, ধর্মনিষ্ঠা দেখে সে নিজেই তার প্রতি এবং তার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। একটা সময় তার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের কোন কোন স্থানে অস্বাভাবিকতা ও আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যায়। বোম্বেবাসী বন্দনার বারবার বোম্বে যেতে চাওয়া এবং কোন না কোন কারণে যেতে অক্ষম হওয়া, বিপ্রদাসের পূজ্য- বিমাতার হঠাৎ তার প্রতি ক্রোধ ও বিচ্ছিbতা, সৌম্য- শান্ত বিপ্রদাসের শশধরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া, দেবোপম দাদার প্রতি দ্বিজদাসের অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও সংসার ত্যাগের সময় নিশ্চুপ থেকে তাকে যেতে দেওয়া, কোন বাধা না থাকার পরও দ্বিজদাসকে ছেড়ে মৈত্রেয়ীর চলে যাওয়া এ সব স্থানে অসঙ্গতি চোখে পড়ে।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন (১৩৪৫ সাল) 'শুভদা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র 'বাল্যস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, 'প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই অর্থাৎ বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতির পরে।'

'শরৎসাহিত্য- সংগ্রহ'র গ্রন্থ- পরিচয়ে লেখা হয়েছে, ''শুভদার রচনাকাল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুন হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এবং রচনাকালের মোট সময় ৩৩ দিন। এই সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ২২ বৎসর মাত্র।''

অল্প বয়সের রচনা বলে হয়তো তিনি এটি প্রকাশে উৎসাহী ছিলেন না অথবা অপরিপক্ব রচনা বলে হয়তো তার মনে সন্দেহ ছিল অথবা তার পারিবারিক জীবনচিত্র কিছুটা হলেও ফুটে উঠেছে বলে এটি প্রকাশের ব্যাপারে হয়তো তার অনীহা ছিল। ফলে তিনি একবার বলেছিলেন পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে।

তবে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের ভাষ্যমতে, তিনি পাণ্ডুলিপিটি অনিলাদেবীর জায়ের পুত্র হোঁদলকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে নির্দেশমতো না পুড়িয়ে আলমারিতে লুকিয়ে রাখে। পরে সেটি উদ্ধার হলে আর নষ্ট করা হয়নি, সেটি ওভাবেই রয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।
নিরুপমা দেবীর ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জয়শ্রী' পত্রিকায় লেখা থেকে অন্যরূপ জানতে পারা যায়—

> 'তবে একটা কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে গল্পটি (অbপূর্ণার মন্দির) লিখিতে গিয়া অলক্ষ্যে শরৎদার 'শুভদা,র আভাস যে গল্পের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, ইহা খুব সত্য।" [৩৫]

তবে হয়ত এজন্যও তিনি শুভদা প্রকাশ করতে চাননি।

করুণরসাশ্রিত উপন্যাস শুভদা দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টিতে কঠিন জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে কোন রকমে টিকে থাকার প্রানান্তকর চেষ্টার পরও মৃত্যু ভিb পথ খুঁজে পায়নি ললনা। জীবনমুখী কোন পথই যখন মানুষের নজরে পড়ে না তখন মৃত্যুও যে আকাি¶ত হয়ে উঠতে পারে তারই উজ্জ্বল চিত্র চিত্রিত হয়েছে এখানে। নরাধম স্বামী হারাণ মুখুজ্যে ও ধৈর্য-সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা বৌ শুভদা'র অশেষ দারিদ্রক্লিষ্ট সাংসারিক জীবন, বিধবা কন্যা ললনা, উচ্চাকাি¶ ছলনা ও অসুস্থ মাধবকে নিয়ে পারিবারিক জীবনের জটিল জালে আবদ্ধ একটি সংসারের নিখুঁত ছবি প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

---

[35] | kirP›' iPbvmgM(2q LÊ), m¤úv'bv: Zcb i"', c_g ms¯‹iY:RjvB 2002, c.991

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ললনার হঠাৎ আত্মাহুতি এবং তার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে নূতন জীবন লাভ ঘটে। সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে তার বজরায় আশ্রয় লাভ এবং তার বাগানবাড়িতে রক্ষিতা হিসেবে অশেষ আরাম-আয়েশে জীবন- যাপনের সুযোগ পায়।

জয়াবতীর আকস্মিক মৃত্যু, মাধবের মৃত্যু, ছলনার সঙ্গে শারদাচরণের বিবাহ, সদানন্দের ললনার প্রতি প্রচ্ছb প্রেম, মালতীর প্রতি সুরেন্দ্রনাথের মুগ্ধতা, বিবাহঃ হারাণ মুখুজ্যের সঙ সেজে নিজেরই বাড়িতে স্ত্রী শুভদাকে ভয় দেখিয়ে চুরি করতে যাওয়া—এসব ঘটনা চিত্রায়নে নানা নাটকীয়তা, আকস্মিকতা ও কোথাও কোথাও অস্বাভাবিকতা থাকলেও সার্বিক বিচারে শুভদা উপন্যাসটি শরৎ- সৃষ্ট অন্যান্য রচনা থেকে ব্যতিক্রম।

'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন (১৩৪৬ সাল) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তবে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র কর্তৃক রচিত নয়। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পযর্ন্ত তিনি লিখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর রাধারাণী দেবী বাকী অংশটুকু লিখে শেষ করেছিলেন। 'শেষের পরিচয়' ১৩৩৯-১৩৪২ পর্যন্ত ছাড়া ছাড়া ভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়।

কাহিনির প্রয়োজনে উপন্যাসটি ২৬ পরিচ্ছেদ পযর্ন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং সাbধ্যে ছিলেন বলেই তাঁর জীবনদৃষ্টি, সাহিত্যিক আদর্শ, মূল্যবোধ, রচনারীতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। এজন্য তার পক্ষে শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাসটি লেখকের মত করেই সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছিল। কোন কোন অংশের জন্য তিনি যে একেবারে সমালোচিত হননি তা নয়।

দু'একটি জায়গা ছাড়া এই উপন্যাসের প্লট এবং পরিণতি শরৎচন্দ্রের ভাবাদর্শেরই অনুসারী হয়েছে। তবে এই উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে তার অন্য কোন উপন্যাসের কাহিনির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। ভিbধর্মী প্লট নিয়ে রচিত এই উপন্যাসের আরম্ভ পরোপকারী, নিঃস্বার্থ রাখাল- রাজকে দিয়ে হলেও গল্পের সমাপ্তিতে বিমলবাবু ও সবিতার 'নিকষিত হেম'

সদৃশ প্রেমই মূখ্য হয়ে উঠেছে। নির্বিরোধ, অতিশয় ধর্মপরায়ণ স্বামী ব্রজবাবু এবং তাদের তিন বছর বয়সী কন্যা রেণুকে ত্যাগ করে সবিতা রমণীবাবুর সাথে প্রণয়ে জড়িয়ে সুখের সন্ধানে গৃহত্যাগ করে। তাদের ছেড়ে আসলেও আকর্ষণবোধ হেতু একটি নিঃসঙ্কোচ সম্বন্ধ বজায় রাখে। তবে নিজের গহনা ও বায়াb হাজার টাকা দাবী করতে ভোলেনি। তের বছর একসঙ্গে কাটানোর পর মনে হয়েছে রমণীবাবুকে সে কোনদিন ভালোবাসেনি। তাই বিমলবাবুর সাথে আবারো সম্পর্কে জড়ায়। সে আসলে কোনদিন কাউকে ভালোবাসতে পেরেছে কিনা সেটি ভাববার বিষয়। পরিত্যাগ করে আসা স্বামী- কন্যার প্রতি হৃদয়- যন্ত্রণা বোধ করা সেË়ও কাছে টানার ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয় না।

গ্রন্থ- মধ্যে রাখাল- সারদার সম্পর্ক বিকশিত হবার যেমন সুযোগ পায়নি তেমনি মায়ের প্রতি অভিমানী অন্তর্মুখি মেয়ে রেণু চরিত্রটিও শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি, আকস্মিকভাবে অকালে কলেরার আক্রমণে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ছয়টি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত- সার; সেগুলির বিকাশ ও পরিণতিতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার ব্যবহার এবং তার বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রহীন

শরৎ-সাহিত্যে যে কয়টি উপন্যাসের নাম আয়তন ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রথমেই মনে আসে তাদের মধ্যে 'চরিত্রহীন' অন্যতম। চরিত্রহীন উপন্যাসটি দীর্ঘসময় ধরে লেখা হয়েছিল। প্রথমবার রচিত পাণ্ডুলিপিটি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। রেঙ্গুন থেকে এক পত্রে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখেন,

> "আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript—নারীর ইতিহাস প্রায় ৪০০/৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তা'ও গেছে। ...আবার সুরু করিব, এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।" (২২.০৩.১৯১২)[৩৬]

সমালোচকদের মতে চরিত্রহীন নতুন-ধারার প্রবর্তন করেছিল। ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন চরিত্রহীন লেখা শুরু করলেও এর বৃহৎ-অংশ লেখা হয়েছিল হাওড়ার শিবপুরে বসবাসকালে। এজন্য প্রথম অংশের ভাবালুতার সাথে শেষ অংশের মননশীলতার পার্থক্য পরিস্ফুট। অনেক বাধা ও সমালোচনার মধ্যে যমুনা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এটি ১৩২০ ও ১৩২১ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় ১১ নভেম্বর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে।

১৩৪৪ সালে পঞ্চম সংস্করণে লেখকের ভূমিকা,

> "চরিত্রহীনে'র গোড়ার অর্ধেকটা লিখিয়াছিলাম অল্প বয়সে। তার পরে ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্যরচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ সংস্কারের সময় ছিল না—ঐ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না ক'রে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন ক'রে দিলাম।" [৩৭]

---

[36] | ‡MvcvjP›‘ ivq, kirP›‘(3qLÊÑc Îvejx),c_g cKvk: Avlvp 1376, RjvB 1969, c.8

[37] | D×Z, AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›‘i Rxebx I mvwnZ¨wePvi, ZZxq ms¯‹iY: AMnvqY 1414, wW‡m¤i 2007, c.168
Dcb¨vmwU m¤ú‡K †jLK ‘Ôevi ‘ÔiKg K_v e‡j‡Qb| GKevi e‡j‡Qb c‡o ‡M‡Q, Av‡iKevi e‡j‡Qb c‡o wQj| †KvbUv ‡h wVK Zv wbYq Kiv GB gn‡Z m¤e bq|

চরিত্রহীন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজের মতামত,

> ‘‘এ একটা `scientific, psycho: and Ethical novel’ আর কেউ এ রকম করিয়া বাঙলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না।...কাউণ্ট টলস্টয়ের ‘রিজারেকশন’ পড়েছ কি? ‘হিজ বেস্ট বুক’ একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে আমাদের দেশে এখনো এতটা আর্ট বুঝিবার সময় হয় নাই, সে কথা সত্য।’’ [৩৮]

অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> ‘‘দীর্ঘকাল-ব্যাপী ব্যবধানের পর শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস সমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাতে প্রথম ও শেষ অংশের মধ্যে কাহিনীপরিকল্পনায়, চরিত্রসৃষ্টি ও রচনারীতির দিক দিয়া লক্ষণীয় পার্থক্য রহিয়াছে।’’ [৩৯]

চরিত্রহীন উপন্যাসে ‘সমাজ অননুমোদিত নিষিদ্ধ প্রেম’ [৪০] মুখ্য হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের মতে,

> ‘‘আমার ‘চরিত্রহীন’ তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে, অর্থাৎ কাল ফণী telegraph করিয়াছে ‘charitrahin creating alarming situation.’ আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে-কোন কারণেই হোক, বাসায় ঝি-বৃত্তি করিতেছে—(character unquestionable নয়),—আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ পর্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না।’’ [৪১]

ভদ্র ঘরের মেয়ে সাবিত্রী এবং ভদ্র ঘরের যুবক সতীশের একনিষ্ঠ প্রেম এবং সেই প্রেমের অপমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠলেও এর পাশাপাশি উপেন্দ্র ও কিরণময়ীকে নিয়ে আরও একটি উপকাহিনি সৃষ্টি হয়েছে। এ উপন্যাসে শিল্পসুষমা কতখানি রক্ষিত হয়েছে তার পু•Lানুপু•L বিচারে না গিয়েও বলা যায় এটি একটি মহৎ-সৃষ্টি। পঁয়তাল্লিশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসের কাহিনির পরিকল্পনা, পটভূমির বিশালতা, রচনারীতির বৈচিত্র্য এবং সেই সাথে চরিত্র সৃষ্টির

---

[38] | ‡MvcvjP›‘ ivq, kirP›‘(3qLÊÑc Îvejx), c‡ev³, c.30
[39] | H, c.169
[40] | Ai“YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›‘ cbwePvi, c_g †‘ÔR ms¯‹iY:KwjKvZv c¯K ‡gjv, Rvbqvix 2001, gvN 1407, c.48
[41] | ‡MvcvjP›‘ ivq, kirP›‘ (3q LÊÑc Îvejx), c‡ev³, c.79

পারঙ্গমতা, সংলাপের ভাবালুতা ও আতিশয্য শরৎচন্দ্রকে একই সঙ্গে জনপ্রিয়তা ও সমালোচনার সম্মুখীন করেছিল।

চরিত্রহীন উপন্যাসের প্রকৃত কাহিনি আরম্ভ হয়েছে যখন চব্বিশ বছরের বলিষ্ঠ চারুদর্শন যুবক সতীশ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে হোমিওপ্যাথিক স্কুলে ভর্তি হয়ে কলকাতার মেসে থাকা শুরু করে এবং সাবিত্রী নামক একুশ- বাইশ বছরের একহারা অতি সুশ্রী গঠনের এক ভদ্রঘরের রমণী ভাগ্যের বিড়ম্বনার শিকার হয়ে সতীশের মেসের ঝি এবং গৃহিণী হয় তখন থেকে, অর্থাৎ দুই সংখ্যক পরিচ্ছেদ থেকে।

> "সাবিত্রী ফরসা কাপড় পরিত এবং ঠোঁট- দুটি পান ও দোক্তার রসে দিবারাত্রি রাঙ্গা করিয়া রাখিত। সে হাসিয়া কথা কহিতে যেমন জানিত, সে হাসির দামটিও ঠিক তেমনি বুঝিত। গৃহসুখ- বঞ্চিত বাসার সকলের উপরই তাহার একটা আন্তরিক স্নেহ- মমতা ছিল।...
> বাসার মধ্যে শুধু সতীশই তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত। যা- তা পরিহাস করিত এবং যখন- তখন বকশিশ দিত। সতীশের উপর তাহার স্নেহটা কিছু অতিরিক্ত ছিল। সারা দিন সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে বোধ করি এজন্যই সে তাহার একটি চোখ এবং একটি কান এই উচ্চ বলিষ্ঠ চারুদর্শন যুবকটির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত রাখিত।" (পরিঃ০২, পৃ.৫)

সাবিত্রী বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরশীল ছিল বলে খরচের টাকা- কড়ি সমস্ত তার হাতে থাকে। মেসের সবাই তাকে সমীহ করে চলে। কারণ তার আচার- আচরণ ঝি শ্রেণির মত নয়। কাজের প্রতি তার মন ছিল এমন যেন তার নিজের বাড়ির কাজ। সাবিত্রীকে সাধারণ দাসীর সাথে এক করে দেখতে সতীশের কোথায় যেন একটা ব্যথা বাজে। বুদ্ধিমতি সাবিত্রী মার্জিত রুচি দিয়ে বুঝে- সমঝে চলে। সতীশের প্রতি তার স্নেহটা কিছু বেশি ছিল কারণ এই লোকটি তাকে নাম ধরে ডাকে এবং যখন তখন বকশিশ দেয়। সাবিত্রী ছিল রাশভারী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না। সতীশ তাকে ভয় করে। ইয়ার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মদ্যপান করলে সাবিত্রীর সামনে বাড়িতে ঢুকতে সাহস পায় না। বিপিন নামে তার এক বন্ধু ছিল যার কিছু বদাভ্যাস সমাজে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেখানে গানের ও পানের আসর বসত। একদিন সতীশ বিপিনের ওখানে না গিয়ে

নিজের ঘরে ছিল। সাবিত্রীও সে ঘরে ছিল। তাকে বলা হয়েছিল কেউ এলে যেন বলে সে বাসায় নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর—

> “বাহিরে অতি দ্রুত জুতার শব্দ শোনা গেল, এবং মুহূর্ত পরেই তাহার ঘরের অতি সচিকটে মুক্তকণ্ঠে গম্ভীর ডাক আসিল, সতীশবাবু।
> সতীশ বুঝিল, এ বিপিনের দল, তাহাকেই ধরিতে আসিয়াছে।
> আর কোন কথা ভাবিল না—বিবর্ণমুখে ফস করিয়া ফু দিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।
> অদূরে মেঝের উপর বসিয়া সাবিত্রী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি করলেন ?...
> বিছানার মধ্যে সতীশের দেহের রক্ত জল হইয়া গেল। সে বিলাতী কম্বলটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘামিতে লাগিল, এবং অন্ধকার মেঝের উপর সাবিত্রী লজ্জায় ঘৃণায় কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।...
> কম্বলের মধ্যে সতীশ বারংবার নিজের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।” (পরিঃ০৩, পৃ.১৬)

একই ঘরে সাবিত্রীকে অন্ধকারে বসে থাকতে দেখে এবং সতীশকে কম্বলের নীচে আবিষ্কার করে দুই মাতালের হাসি উb¦Ë হয়ে ওঠে। সাবিত্রী বুঝতে পারে সত্য ঘটনা হাজারবার বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। বিপিনের মাধ্যমে এ ঘটনা সবাই ভুল ভাবে জেনে যাবে এবং সতীশের এখানে থাকা আর চলবে না। সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে সতীশ মাতাল অবস্থায় মারামারি করে ফিরে এলে সাবিত্রী তাকে ঘরে নিয়ে যায়। এবং প্রতিজ্ঞা করায় সে যেন আর কোনদিন মদ না খায়। পরদিন আলাপ প্রসঙ্গে এ ঘটনার করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে সাবিত্রী তাকে অন্য বাসায় চলে যেতে বলে। সে নিজে কি করবে এ প্রrkর উËরে বলে, এ বাসার বাবুরা রাখলে ভাল, না রাখলে আর কোথাও কাজের চেষ্টা করে চলে যাবে; যেখানে খাটবে, সেইখানেই দুটি খেতে পারবে। সাবিত্রীর প্রতি সতীশের অনুরাগ জcb¥ছিল। সে মনে করেছিল সাবিত্রীও তাকে ভালোবাসে। কিন্তু এই অবহেলামূলক কথা শুনে তার সমস্ত মন যেন পর্বতের শিখর থেকে গড়িয়ে পাদমূলে পড়ে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। ফলে সে কঠোর প্রতিজ্ঞা করে বসে, বেদনার গুরুভারে মন যদি তার ভেঙ্গে অনু- পরমাণু হয়েও যায় তারপরও সাবিত্রীকে ভালোবেসে সে আর অধঃপাতে যাবে না। সাবিত্রীকে এড়িয়ে যাবার জন্য সে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। এই সব ভাবতে ভাবতে পথ চলার সময় হঠাৎ সতীশের

সাথে তাদের বাসার বহুকাল আগের পুরনো ঝি মোক্ষদার সাক্ষাৎ হয়। একটা চিঠি পড়ে দিতে হবে বলে মোক্ষদা সতীশকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসতে দেয়—ঘরটি ছিল সাবিত্রীর। সে যে এখানে থাকে সতীশের তা জানা ছিল না। সেই মুহূর্তেই সাবিত্রী ফিরে এসে সতীশকে তার ঘরে দেখে যতখানি বিস্মিত হয় সতীশের চমক লাগে তারও বেশি। সতীশ চলে যেতে চাইলে সাবিত্রী জানায় আজ তার জb¥দিন। এ সময়ে সাবিত্রীর 'তুমি' সম্বোধন সতীশের মনে একই সঙ্গে জোয়ার-ভাটা ও বুকের ভেতরে ঝড়ের সৃষ্টি করে। সজনীকান্ত দাসের লেখা থেকে এ অংশের প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়—

> ''যমুনার মাসে মাসে প্রকাশিত চরিত্রহীনের অধ্যায়গুলি পড়িতে পড়িতে সর্ব প্রথম এক দেহাশ্রিত অনুভূতি আমার মনকে নাড়া দিল। এক অনুভূতি অতিশয় তীব্র, কিশোর-মনের পক্ষে ক্ষতিকর।... চরিত্রহীন পড়িতে পড়িতে দেহে নূতনের জাগরণ অনুভব করিলাম। এই উন্মেষ আনন্দদায়ক নয়, পীড়াদায়ক। সেই বাল্যকালে যে জায়গাটি আমাকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করিয়াছিল, তাহা এখনও মুখস্ত আছে। মোক্ষদা বাড়ীউলির বাসায় সতীশ উপস্থিত হইয়াছে,...'আহারান্তে সতীশ আর একবার শয্যায় আসিয়া বসিল। সাবিত্রী ডিবা করিয়া পান আনিয়া দিল, এবং বাধা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশের হাতে দিয়া, পায়ের নীচে বসিয়া পড়িয়া একটুখানি হাসিয়াই নিঃশব্দে মুখ নীচু করিল। সতীশের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। নাভিস্থ সমস্ত নাড়িগুলা ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া সর্বদেহে কাঁটা দিয়া যেন শীত করিয়া উঠিল। ক্ষণকালের নিমিË তাহার হুঁকা টানিবার সামর্থ্যটুকুও রহিল না'।'' [৪২]

প্রেমের এমন বানডাকা বন্যায় ভেসে যাওয়ার পরমুহূর্তে আবার খরা নেমে আসে। সতীশের একটা অসতর্ক উক্তিকে সত্য মনে করে সাবিত্রী তাকে কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর বলে অভিহিত করে। এবং একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া মনটার গায়ে আর কালি মাখাতে নিষেধ করে। ফলে সতীশ চাকর বেহারীকে সাথে নিয়ে বাসা বদল করলেও আশা করেছিল সাবিত্রীও সেখানে যাবে কিন্তু সাবিত্রী নিরুদ্দিষ্ট হয়। সতীশ হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে মনে সাবিত্রীকে আশা করে কিন্তু আর তার দেখা মেলে না; বেহারীর মাধ্যমে খোঁজ করতে পাঠায় কিন্তু তাকে আর পাওয়া যায় না। সংবাদ নিয়ে ভুল

---

[42] | D×Z, Ai"YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›' cbwePvi, c‡ev³, c.44,45

তথ্য শোনে যে, সাবিত্রী সতীশের কথিত বন্ধু বিপিনের কাছে চলে গেছে। দিন দুই পরে ঔষধ না খেয়েও সতীশ সুস্থ হয়ে ওঠে এবং কলিকাতা ছেড়ে পশ্চিমের বাড়িতে চলে যায়। এর মাসখানেক পরে উপেন্দ্রের অনুরোধে সতীশ আবার কলিকাতায় আসে। সে তার পুরনো বাড়িতে ওঠে। এই সময়ে উপেন্দ্রের বন্ধু ব্যারিস্টার জ্যোতিষের বোন সরোজিনীর সাথে তার দেখা হয়, উপন্যাসের শেষে এরই সাথে বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়। সতীশ আবারো সাবিত্রীর খোঁজ করে কিন্তু সন্ধান পায় না। তারপর একদিন হঠাৎ সাবিত্রীই তার বাড়িতে আসে অসুস্থ হয়ে কিছু টাকার জন্য। সতীশ তাকে ভুল বুঝে রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চেয়েছে, সে একটা দিনের জন্যেও তাকে ভালবেসেছে কি না? কিন্তু সাবিত্রী সতীশকে ভালোবাসলেও স্বীকারোক্তিমূলক কোন বাক্য উচ্চারণ করেনি। সতীশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যায়। মনোকষ্টে সে অজ্ঞাতবাসে গেলে ঘটনাচক্রে একদিন সেখানেই বিপদগ্রস্ত সরোজিনীকে উদ্ধার করে তার মন জয় করে ফেলে। এর ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সরোজিনীর মা জগৎতারিণী সতীশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান। কিন্তু সরোজিনীর পাণিপ্রার্থী জ্যোতিষের বন্ধু শশাঙ্কমোহন সতীশের সম্বন্ধ ভাঙ্গার জন্য সাবিত্রী সম্পর্কে নানা কথা বলে সন্দেহ জাগানোর চেষ্টা করে। জ্যোতিষবাবু সাবিত্রী কে তা জানতে চাইলে সতীশ বলে—

> ‘‘সাবিত্রী কে তা আমি জানিনে জ্যোতিষবাবু। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি- সম্বন্ধ, সে উËর দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করিনে।...
> তবে একথা খুব সত্যি, সাবিত্রী যাই হোক, যদি নিজের ইচ্ছায় সে আমাকে ছেড়ে চলে না যেত, আমি যতদিন বাঁচতুম, তাকে মাথায় করে রাখতুম। এ কথা শুধু আপনাদের সাক্ষাতে নয়, সমস্ত পৃথিবীর সামনে স্বীকার করতেও আমি লজ্জাবোধ করিনে।’’ (পরি:৩৮, পৃ.১৮০- ১৮১)

ইতোমধ্যে উপন্যাসের অপর এক নায়িকা তী[2] মননশীল ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী কিরণময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সতীশের। সে উপেনের বন্ধু হারাণের স্ত্রী। প্রথম সাক্ষাতে সতীশ ও উপেন্দ্র তার রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়—‘‘নিঁখুত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাত ভ্রূযুগের মধ্যে সbিবিষ্ট কাঁচপোকার টিপ চিকচিক করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোখ দুটি দিয়া যে বিদ্যুৎ- প্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার তাহার অপূর্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল।’’ (পরি:১২, পৃ.৫১)

ছেলেবেলায় কিরণময়ী আZ্মীয়ের ঘরে মানুষ হয়ে অনাZ্মীয় স্বামীর সংসারে এসেছিল। একটি দিনের জন্যও স্বামী তাকে ভালোবাসেন নি, শাশুড়ি আদর করেন নি। উপেন্দ্রকে দেখেই কিরণময়ীর মনে ভালোবাসার তীব্র আকা•¶া সৃষ্টি হয়। সতীশের কাছে সুরবালা– উপেন্দ্রের দাম্পত্য– ভালোবাসার কাহিনি শুনে কিরণময়ী Db্মাদনায় মেতে ওঠে। সে সুরবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় তার রূপ আর বিদ্যার অহঙ্কার নিয়ে। কিন্তু সুরবালার fmগ্ধ পবিত্র হৃদয়ের দীপ্তি দেখে সে পরাজয় মেনে তাকে গুরু বলে স্বীকার করে এবং স্বামী সেবায় মনোনিবেশ করে। কিন্তু স্বামীকে যখন পেতে শুরু করেছে বলে প্রতীতি জb্মায় সেই মুহূর্তে হারাণ ইহলোক ত্যাগ করে। কিরণ মনের দিক থেকে মুক্ত হয়ে যায়। উপেন্দ্রকে তার ভালোবাসার কথা জানালে সে প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপরও উপেন্দ্র তার ফুফাতো ভাই বি.এ ফেল দিবাকরকে পাথুরেঘাটায় কিরণময়ীর বাসায় রেখে আবার পড়তে পাঠায়। কিন্তু কিরণময়ীর রূপের ছটা, রহm¨– পরিহাস, আর ছলনায় উদ্ভিbযৌবন যুবক দিবাকর বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। একদিন উপেন্দ্র দিবাকরকে দেখতে তাদের বাড়িতে এলে রাগান্বিতা শাশুড়ি অঘোরময়ী কিরণময়ীর চরিত্র নিয়ে পk তোলে। এই অভিযোগে ক্রুদ্ধ উপেন্দ্র দিবাকরকে নিয়ে যেতে চাইলে সেদিন অমাবস্যা বলে অঘোরময়ী বাধা দেয় এবং পরদিন নিয়ে যেতে বলে। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে খাবারের কথা বললে সে তার ঘৃণার কথা জানায়। তারপরও কিরণময়ী উপেন্দ্রকে বিদায়ের সময় নিভৃতে পা জড়িয়ে ধরে তাকে এত ছোট না– ভাবতে অনুরোধ করে। সেই কথার প্রত্যুËরে উপেন্দ্র বলে, চুপ করুন। অনেক অভিনয় করেছেন আর না। অসহ্য ঘৃণায় কিরণময়ীর মাথাটা সজোরে ঠেলে দিয়ে নাস্তিক! অপবিত্র! ভাইপার! ইত্যাদি বলে দৃকপাতমাত্র না করে বেরিয়ে যায়। ফলে আক্ষরিক অর্থে ঘর থেকে কখনো বের না হওয়া ক্রোধোb¥Ëv কিরণময়ী সেই রাতেই প্রতিশোধ– স্পৃহায় দিবাকরকে নিয়ে আরাকানের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

আকস্মিকভাবে সুরবালা য²ারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করলে শোকার্ত উপেন্দ্রও আশ্চর্যজনকভাবে কয়েকদিনের মধ্যে একই রোগে আক্রান্ত হয়। এদিকে সতীশের পিতার মৃত্যুর ফলে সে প্রভূত অর্থের মালিক হয়ে গ্রামে ডিসপেনসারি খোলে; তার হাসপাতাল খোলারও ইচ্ছা

ছিল। সে তান্ত্রিক সাধনায় লিপ্ত হয় এবং 'থাকোবাবা' নামের এক ভণ্ড তান্ত্রিককে আশ্রয় করে পঞ্চ'ম' কারের সাধনা করে। মদ্যপ থাকোবাবার সাথে বেহারীর বাদানুবাদ হলে সতীশ এতদিনের পুরনো চাকর বেহারীকে চলে যেতে বলে। কিন্তু বেহারী বাড়ি না গিয়ে কাশীতে যায় এবং সাবিত্রীকে নিয়ে ফিরে আসে। সাবিত্রীর আসার সংবাদে সতীশ বিস্মিত হলেও তাদের ভিতরের ভুল বোঝাবুঝি বেহারীর সহায়তায় অবসান হয়। সতীশ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সাবিত্রী বেহারীর নাম করে উপেন্দ্রকে চিঠি লিখে আসতে অনুরোধ করে। এদিকে পিতা ও বিধবা ভগ্নি মহেশ্বরীর অনুরোধে উপেন্দ্র জল হাওয়া বদলাতে পুরী যায়। সেখানে সে মোক্ষদার সাক্ষাৎ লাভ করে। তারই সহায়তায় উপেন্দ্র সাবিত্রীর ভগ্নিপতি ভুবন মুখুয্যের কাছ থেকে সাবিত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হয়। সেইদিনই উপেন্দ্র তল্পি বেঁধে পুরী ত্যাগ করে।

জ্যোতিষের বাড়িতে উপেন্দ্র যে দিন আসে সেদিন শশাঙ্ক-সরোজিনীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হবার কথা ছিল। কিন্তু উপেন্দ্রের কাছে সতীশের ভারী অসুখ জানতে পেরে সরোজিনী তাকে দেখতে তার বাড়িতে যেতে চায়। তারা সতীশের বাড়িতে পৌঁছলে উপেন্দ্র সাবিত্রীকে বোন বলে সরোজিনীর কাছে পরিচয় দেয়। ততদিনে সতীশ আরোগ্য লাভ করেছে। উপেন্দ্র সরোজিনীর সাথে সতীশের বিয়ে ঠিক করে সাবিত্রীকে সাথে করে নিয়ে যাবার কথা বলে। কিন্তু সতীশ সাবিত্রীকে ছাড়তে চায় না। সে তাকে বিয়ে করতে চাইলে সাবিত্রী সমাজের নিয়ম-কানুন বিবেচনায় রেখে অস্বীকৃত হয়।

এরপর কাহিনি দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। কিরণময়ী-দিবাকরের আরাকানবাসের চিত্র বাস্তবতার কাছাকাছি হলেও খুব সুখকর হয় নি। তাদের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। সেই সময়ে সতীশ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং কিরণময়ী ও দিবাকরকে জোর করে দেশে ফিরিয়ে আনে। উপেন্দ্র মৃত্যুশয্যায় সতীশকে ডেকে সরোজিনীর সাথে তার বিয়ের কথা চূড়ান্ত করে। কিন্তু তারপরও সতীশ উপেন্দ্রের কাছে এ অধিকার চায়, যে তাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে কারও ভয়ে, কোন লোভে, কোন দুর্বলতায় যেন তাকে না সে অস্বীকার করে। কিন্তু উপেন্দ্র

সমস্ত জেনে শুনেই সরোজিনী- সতীশকে এক করে দিয়ে যাচ্ছে বলে জানায়। সরোজিনী তাকে নিয়ে সুখী হতে পারবে কিনা এমন কথা জানতে চাইলে সাবিত্রী তাদের ভার নিতে চায় কিন্তু উপেন্দ্র তাকে বাধা দিয়ে বলে—

> ‘‘আসক্তির বন্ধন আর তোমার জন্যে নয়, সাবিত্রী। দুর্ভাগ্য যদি তোমাকে কুলের বাইরেই এনে ফেলেচে বোন, আর তার ভেতরে যেতে চেয়ো না। চিরদিন বাইরে থেকেই তাকে বুকে করে রেখো, এই আমার অনুরোধ।...
> ব্যথায় বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সর্বংসহা বসুমতী যেমন করিয়া তাঁহার অন্তরের দুর্জয় অM¨ৎপাত সহ্য করেন, ঠিক তেমনি করিয়া সাবিত্রী অবিচলিত মুখে সমস্ত সহ্য করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।’’ (পরিঃ৪৫, পৃ.২২৮)

সমস্ত জেনেই উপেন্দ্র এ ভার সাবিত্রীকে দিয়ে যাচ্ছে কারণ সে জানে সাবিত্রী তা বইতে পারবে। সেই মুহূর্তে পরিধানে ছিb মলিন বস্ত্র এবং চোখে তীব্র চাহনি নিয়ে কিরণময়ী Ub¥াদ অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে। দিবাকরকে লজ্জা দিতে নিষেধ করে উপেন্দ্রকে আচলে বাঁধা মা কালীর প্রসাদ খেতে বলে। তার কিছুক্ষণ পরে উপেন্দ্রের mZ¨ হয়। শোকে ও ক্রন্দনে সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠলেও নীচের ঘরে তখন কিরণময়ী নিরুদ্বেগে ঘুমাতে থাকে—এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

দুই

যে কোন উপন্যাসের শুরুতে চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় সমাপ্তিতে তা তেমন থাকে না। কাহিনির চাপে বা ঘটনার আবর্তে চরিত্র পরিবর্তিত হয়। উৎকৃষ্ট উপন্যাসে সেই পরিবর্তন আসে ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও তা লক্ষ্য করা যায়। তবে কোথাও কোথাও তার ব্যত্যয় ঘটেছে। আকস্মিকতা, অস্বাভাবিকতা, আতিশয্য কাহিনির মোড় পরিবর্তনে কোন কোন জায়গায় বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে।

চরিত্রহীন উপন্যাসের শুরুতে যে অস্বাভাবিকতা নজরে পড়ে তা এর পটভূমি রচনায়; শরৎচন্দ্র যে কাঠামো নির্মাণ করেছেন সেই কাঠামোতেই। প্রথম থেকে ষোল পরিচ্ছেদ পর্যন্ত উপন্যাসটিতে একই আবহাওয়া বিরাজমান। প্লট নির্মিত হচ্ছে, কাহিনি এগিয়ে যাচ্ছে, চরিত্রের সময় বা কাল পরিবর্তিত হচ্ছে, শুধু পরিবর্তন হচ্ছে না ঋতু তথা আবহাওয়ার। যেমন, চরিত্রহীন উপন্যাসটি শুরু হয়েছে শীতকালে। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি হচ্ছে—"পশ্চিমের একটা বড় শহরে এই সময়টায় শীত পড়ি- পড়ি করিতেছিল।"

এরপর ষোল পরিচ্ছেদ পযর্ন্ত একটানা শীতের বর্ণনা—"শীতের রৌদ্র পিঠে করিয়া মাথায় র‍্যাপার জড়াইয়া ইহাদের এই বৈঠকটি দিব্যি জমিয়া উঠিয়াছিল।" (পরি:০১)

মাস তিনেক পরে কলিকাতায়—

"আজ শীতের মধুর মধ্যাহ্নে বাসা নির্জন ও নিস্তব্ধ।" (পরি:০২)

"কোথা দিয়ে জোলো হাওয়া আসছে সাবিত্রী—জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।" (পরি:০৩)

"শীতের শীর্ণ গঙ্গা তাহারি এক প্রান্ত দিয়া অবিশ্রাম একটানা স্রোতে সমুদ্রে চলিয়াছে।" (পরি:০৪)

"বাহিরে শীতের সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি স্তব্ধ হইয়া রহিল।" (পরি:০৫)

"আজ সকাল হইতে মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল,...এক ঝলক রৌদ্র তাহার মুখের উপর গায়ের উপর পড়িয়া যেন তাহাকে এক মুহূর্তে দগ্ধ করিয়া দিয়া গেল। ...বেহারী রাখালবাবুর বিছানা রোদে দিতেছিল।" (পরি:০৮)

‘সে কিরে, তুই শুতে যা। বুড়োমানুষ হিমে থাকিসনি।’’ (পরিঃ০৯)

মাসখানেক পর—

‘‘ওপরে আসুন, এখানে বড় ঠাণ্ডা।...
এই অন্ধকার শীতল রাত্রে, এই দুরন্ত হিমের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ভিজা মাটির উপর একাকিনী বধূকে তাঁহাদের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া...উপেন্দ্রর চোখে জল আসিয়া পড়িল।’’ (পরিঃ১২)

‘‘সতীশ, একটা চুরুট দে তো রে, ভারী ঠাণ্ডা।’’ (পরিঃ১৩)

‘‘শীতের রাত্রেও তাহার কপালে মুখে ঘাম দিয়াছিল।’’ (পরিঃ১৪)

‘‘গঙ্গার শীতল বাতাসে তাহার শীত করিতে লাগিল।’’ (পরিঃ১৫)

‘সে শীতের ভয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই খনখন ঝনঝন শব্দ করিয়া মাজা-ধোয়া সারিয়া লইতেছিল।’’ (পরিঃ১৬)

এ পর্যন্ত একটানা শীতের বর্ণনার ভিতর দিয়ে কাহিনি এগিয়ে গেছে। কিন্তু শীতকাল কত মাস ধরে স্থায়ী হয় সে কথা শরৎচন্দ্র বলতে ভুলে গেছেন। আমাদের বাংলার প্রকৃতি ঋতু বৈচিত্র্যের জন্য সমাদৃত। এখানে একটানা ছয় মাস শীত থাকে না। পাশ্চাত্যের কথা আলাদা। গৃহদাহ উপন্যাসে যেমন বৃষ্টির আধিপত্য, চরিত্রহীনে তেমনি শীতের আধিপত্য। কাহিনির পটভূমিতে এটি অসতর্কতাবশত বলে মনে হয়।

উপন্যাসে যে আকস্মিক ঘটনার প্রাবল্য থাকবে তার সঙ্কেত রয়েছে শব্দ ব্যবহারের মধ্যেও। শুধু এক ও দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ ছাড়া বাকি সব পরিচ্ছেদেই ‘অকস্মাৎ’, ‘হঠাৎ’, ‘সহসা’, ‘দৈবাৎ’ এই শব্দগুলি বারংবার পাওয়া যায়। কাহিনি যতই ক্লাইম্যাক্সের দিকে গেছে ততই এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে গেছে। আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে এই শব্দগুলি ষোলবার, ষোল সংখ্যক পরিচ্ছেদে এগারবার, আটাশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে নয়বার, আটত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে নয়বার—এভাবে অসংখ্যবার—

‘‘হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।’’ (পরিঃ০২), ‘‘আকস্মিক নিস্তব্ধতায় বিস্মিত সতীশ মুখ তুলিতেই চোখাচোখি হইল।’’ (পরিঃ০৩), ‘‘হঠাৎ দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া দিবাকর পিছন ফিরিয়া দেখিল, ঝি দাঁড়াইয়া আছে।’’ (পরিঃ০৪), ‘‘হঠাৎ অপরদিকে

পাশ ফিরিয়া অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা রাত অনেক হলো—এখন ঘুমোও।" (পরিঃ০৫), "অকস্মাৎ এরূপ উËর ক্ষণকালের নিমিË উপেন্দ্রকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।" (পরিঃ০৬), "অকস্মাৎ এমন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে।" (পরিঃ০৭), "সহসা বাসায় প্রত্যাগত কেরানীদের শব্দ- সাড়ায় সে চকিত হইয়া ...পড়িল।" (পরিঃ০৮), "অকস্মাৎ বেহারীকে দেখিয়া একমুহূর্তে যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।" (পরিঃ০৯), "হঠাৎ আজ কলিকাতা যাইবার আnŸান শুনিয়াই তাহার বিদ্রোহী গৃহল²ী ধূলিশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল।" (পরিঃ১১), "হঠাৎ উপেন্দ্রর যেন অসহ্য বোধ হইল।" (পরিঃ১২), "হঠাৎ মেঘ করিয়া ভয়ানক ঝড়- বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল।" (পরিঃ১৩), "হঠাৎ কি এমন ঘটিল যে ডাক্তারের এ বাটিতে আসা অনাবশ্যক হইয়া উঠিল।" (পরিঃ১৪), "হঠাৎ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তবে আর কি হবে!" (পরিঃ১৫), "অঘোরময়ী অকস্মাৎ আগুন হইয়া উঠিলেন।" (পরিঃ১৬), "অকস্মাৎ জিহ্বা তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।" (পরিঃ১৭), "হঠাৎ মনে হইল, এই বিরাট সৃষ্টির কোথাও কোনও কোণে তাহার জন্য একটুকু স্থান আছে কিনা।" (পরিঃ১৮), "অকস্মাৎ সংশয়ে, ভয়ে কিরণময়ীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।" (পরিঃ১৯), "হঠাৎ আজ সেগুলি পুটুলি বাঁধা হইয়া আলনার অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে।" (পরিঃ২০), "সতীশের হঠাৎ মনে হইল...।" (পরিঃ২১), "অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝটিকার মত সমস্ত ওলট- পালট করিয়া দিয়া কত কাণ্ডই না এই একটা রাত্রির মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে।" (পরিঃ২২), "দাসী হঠাৎ মুখ বাড়াইয়া কহিল, বৌমা ডাকচেন আপনাকে।" (পরিঃ২৩), "উপেন্দ্র তাহার বন্ধুর আকস্মিক প্রস্থানের কথাটা বিদিত নহেন।" (পরিঃ২৪), "অত্যন্ত অকস্মাৎ নবলব্ধ চেতনার মত এই একটি কথা তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া গেল।" (পরিঃ২৫), "হঠাৎ এক সময়ে চোখ না তুলিয়াই কহিল...।" (পরিঃ২৬), "হঠাৎ মনে হল সুরবালার মুখখানি যেন এমনি।" (পরিঃ২৭), "অকস্মাৎ মেয়েটি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল, মশাই, আমাকে বাঁচান।" (পরিঃ২৮), "হঠাৎ প্রk করিল আপনার এই বনবাসের অর্থটা কি?"(পরিঃ২৯), "আকস্মিক অপবাদের প্রবল লজ্জায় দিবাকর হতবুদ্ধি হইয়া গেল।" (পরিঃ৩০), "হঠাৎ দিবাকর চমকিয়া উঠিল।" (পরিঃ৩১), "হঠাৎ হেট হইয়া দিবাকরের দাড়িটা হাত দিয়া একবার নাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।" (পরিঃ৩২), "এমন হঠাৎ যে?" (পরিঃ৩৩), "হঠাৎ কাহার কোমল হস্তস্পর্শে তাহার চমক ভাঙ্গিল।" (পরিঃ৩৪), "আকস্মিক উগ্রতায় কিরণময়ী চমকিত হইল।" (পরিঃ৩৫), "হঠাৎ কিরণময়ী চকিত হইয়া উঠিল।" (পরিঃ৩৬), "অকস্মাৎ হৃদরোগে পরেশনাথের মৃত্যু হইয়াছিল।" (পরিঃ৩৭), "দৈবাৎ সে লোকটির ইতিহাসও আজ সরোজিনীর অপরিজ্ঞাত রহিল না।" (পরিঃ৩৮), "অকস্মাৎ বেহারীর গলা শুনিতে পাইয়া সতীশ পুলকিত বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল।" (পরিঃ৩৯), "হঠাৎ মনে হইল, সাবিত্রীকে আজ যেন সে এই প্রথম দেখিল।" (পরিঃ৪০), "অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তবে আর চাইনে।" (পরিঃ৪১), "হঠাৎ কে বলিবে এ সেই সৌন্দর্যের প্রতিমা কিরণময়ী!" (পরিঃ৪২), "আকস্মিক বিপৎপাতে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।" (পরিঃ৪৩), "হঠাৎ বলিয়া উঠিল...তাঁর ব্যামো আমাকে দিয়ে তাকে ভাল করে দাও।" (পরিঃ৪৪) "হঠাৎ যেন চিনিতে পারিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ও কে, সরোজিনী?" (পরিঃ৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে সতীশ এবং সাবিত্রীর সম্পর্ক অনেক টানাপোড়নের মধ্যেও অব্যাহত রাখার জন্য ঔপন্যাসিক অস্বাভাবিক ও আকস্মিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক জমিদার পুত্র সতীশ কেন কলকাতা শহরে অফিস সহকারী, কেরানি, পিয়ন, মদ্যপদের সঙ্গে মেসে বাস করে?

সতীশ রাখালবাবুদের সাথে যে মেসে থাকে সাবিত্রী সেই বাসার ঝি। সে অত্যন্ত সুন্দরী, পরিচ্ছb, বুদ্ধিমতী ও লেখাপড়া জানা মেয়ে। স্বভাবতই সতীশ- সাবিত্রীর মনে পবিত্র 'cm‡হ'র সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সম্পর্কের এক পর্যায়ে উ™ত পরিস্থিতির কারণে একদিন সতীশ সাবিত্রী থেকে দূরে থাকার অভিপ্রায়ে পথে পথে ঘুরতে থাকে।
এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে মোক্ষদার সঙ্গে সতীশের সাক্ষাৎ হয়। মোক্ষদা এককালে পশ্চিমের শহরে সতীশদের বাসায় ঝি এর কাজ করত। তারপর সে কলকাতায় চলে আসে। বাসা ভাড়া করে থাকে। এখানেও সে ঝি এর কাজ করে। সতীশের সঙ্গে তার কোন দিন দেখা হয় নি। কিন্তু যখন সতীশ সাবিত্রীর মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে যাবার জন্য কলকাতা শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে দর্জিপাড়ার গলির মোড়ে হঠাৎ মোক্ষদার সাথে তার দেখা। মোক্ষদাই তাকে প্রথম চিনতে পারে এবং একটি চিঠি পড়ানোর জন্য পিড়াপীড়ি করে বাসায় নিয়ে যায়। সে বাসার মধ্যে একটি পরিচ্ছb কামরা ও পরিষ্কার বিছানায় তাকে বসতে দেয়। সতীশ যার মৌখিক cmহের বাগবিতণ্ডা হতে নিজেকে অকৃত্রিম ঘৃণার সাথে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মেসে না ফিরে পথে পথে ঘুরছিল অলৌকিকভাবে তারই ঘরে গিয়ে সে হাজির হয়েছে! সেই কামরাটি ছিল সাবিত্রীর। তার ঘরের চাবি কেন মোক্ষদার কাছে থাকে তা বোঝা গেল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাবিত্রীর বাড়িতে আসা হয়ে না উঠলেও এদিন হঠাৎ করে সে নিজ গৃহে হাজির—"সতীশ চমকিয়া উঠিল। মোক্ষদা মুখ ফিরাইয়া কহিল, সাবি নাকি। কখন এলি তুই? সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এইমাত্র আসছি। বাবুটিকে কোথায় পেলে মাসি?" (পরিঃ০৮, পৃ.৩৫)
সতীশ- সাবিত্রীর সাথে পাঠকও চমকে ওঠে কারণ তাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের মধ্যে দিয়ে এখানেই তাদের প্রেমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত

বা ভিÍভূমি রচিত হয়ে যায় এবং ভালোবাসা-বাসি, এবং মান-অভিমান পাশাপাশি চলতে থাকে। মোক্ষদার সাথে দেখা হওয়ার ঘটনা পরম্পরায় সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের নিভৃতে দেখা হওয়ায় তারা যে একে অপরকে ভালোবাসে ঘটনাটি পাঠকের কাছেও পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের সম্পর্ক অনাবৃত হওয়ার প্রধান কারণ মোক্ষদা। মোক্ষদার সাথে দেখা না হলে কাহিনি হয়ত এ রকম হত না।

অরুণকুমারের মতে,

> ‘‘আঠারো ঘণ্টার মধ্যে, তিনবার জোয়ার, তিনবার ভাঁটা দেখা গেল সতীশের ভালবাসায়। আকস্মিকতা ও আতিশয্যই শরৎ-সৃষ্ট চরিত্রের ভিÍ, এই সত্য এখানে আর-একবার প্রমাণিত হল। ...সতীশের ভালবাসায় আমরা দেখেছি আকস্মিকতা আর আতিশয্য, আকর্ষণ আর বিদ্বেষ।’’ [৪৩]

মোক্ষদার সাথে সতীশের এই সাক্ষাৎ যেমন আকস্মিক তেমন অস্বাভাবিক। এই ঘটনাটি উপন্যাসটির পরিণতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। তাদের দুজনের দেখা না-হলে ঘটনাটি ভিbমুখি হতো। বাসার পুরনো ঝিয়ের সাথে পথে দেখা হয়ে যাওয়া, সামান্য চিঠি পড়ানোকে উদ্দেশ্য করে তাকে সাবিত্রীর ঘরেই এনে ফেলা, (যে চিঠির উপন্যাসের সাথে কোন যোগই নেই) যে সাবিত্রীর সাথে তার টানাপোড়ন চলছিল তাকেই তার ঘরে এনে একই সাথে ভালোবাসি ও ভালোবাসি-না’র দ্বন্দ্বে ফেলে কাহিনিকে সরল করে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এভাবে শৈল্পিক সাফল্য ব্যাহত হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে মোক্ষদার মাধ্যমে সাবিত্রীর ঘরে আনীত সতীশের সাথে সাবিত্রীর আকর্ষণ ও ভালোবাসা, একই সাথে নিষ্ঠুর আঘাত ও দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সতীশের মনে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব উনচল্লিশ পরিচ্ছেদের আগে আর কাটেনি।

উপন্যাসের শেষ দিকে ঘটনার গ্রন্থিমোচনে মোক্ষদা আর একবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুরবালা য²ারোগে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী-শোকে কাতর উপেন্দ্রও আকস্মিকভাবে যখন মৃত্যু-পথযাত্রী,

---

[43] | Ai“YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›‘ cbwePvi, c‡ev³, c.52,53

তখন পিতা ও জ্যৈষ্ঠ ভমি মহেশ্বরীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে উপেন্দ্র জল হাওয়া বদলাতে পুরীতে যায়। সেখানে উপেন্দ্র যে হোটেলে উঠে সেটি ছিল ভুবন মুখুয্যের। এই ভুবন মুখুয্যে সেই ব্যক্তি যে সাবিত্রীর ভমিপতি হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিয়ে গৃহ থেকে পালিয়ে এসেছিল। কলকাতায় বাস করা মোক্ষদা ভুবন মুখুয্যেও হোটেলে কাজ করে। উপেন্দ্রকে দেখেই সে চিনতে পারে। উপেন্দ্র জানতে চায়—"তুমি এখানে চাকরি কর বুঝি?

মোক্ষদা সলজ্জভাবে কহিল, না—হ্যাঁ—তা একরকম চাকরি করা বৈ কি! মুখুয্যেমশাই বললে, আর কলকাতায় পড়ে থাকা কেন, বরং চল কোন তীর্থ স্থানে গিয়ে থাকি গে। যা হোক একটা হোটেল- টোটেল করে—" (পরিঃ৪০, পৃ.১৯৯)

উপেন্দ্রর সাথে সাথে মোক্ষদারও পুরীতে উপস্থিতি বিস্ময়কর ও আকস্মিক। উপেন্দ্রের মনে সতীশ- সাবিত্রী সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা ছিল। মোক্ষদার সাথে ভুবন মুখুয্যেকেও এখানে হাজির করা হয়েছে সাবিত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে উপেন্দ্রকে নিঃসন্দেহ করার জন্যে। মোক্ষদা ও ভুবন মুখুয্যের সাক্ষ্যে উপেন্দ্র তার ভুল বুঝতে পারে এবং সাবিত্রী সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টে যায়। এই পাল্টে যাওয়াটা শেষ পর্যন্ত বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। কারণ ব্যাপারটি জেনেই সাবিত্রীকে বোন সম্বোধন করতে মর্মরের মত শুভ্র হৃদয়ের অধিকারী উপেন্দ্রের আর বাধেনি। এছাড়াও সতীশের ঘরে যে সাবিত্রীকে বসে থাকতে দেখে এসেছিল মোক্ষদার সাথে দেখা হবার পর তার সঙ্গে আলাপ করে পূর্বাপর ঘটনা শুনে সাবিত্রী সম্পর্কে তার মন পরিষ্কার হয়ে যায় এবং রহস্যেরও মীমাংসা হয় অতি সহজেই। মোক্ষদার সাথে দেখা না হলে ঘটনা কোন দিকে মোড় নিত বলা মুশকিল। ফলে কাহিনি দ্রুত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। এই ঘটনাটি আকস্মিকতা ও একইসাথে অস্বাভাবিকতার স্বাক্ষর রেখেছে। তবে কাহিনি যে জমে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে সতীশ ও সাবিত্রীর প্রেমের সম্পর্ক আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও তা আবার পুনরুজ্জীবিত হবার সুযোগ পায় বিংশ পরিচ্ছেদে এসে। সতীশের ঘরে সাবিত্রীকে দেখে উপেন্দ্রের চলে যাওয়া এবং তারই ধারাবাহিকতায় সাবিত্রী- সতীশের তীব্র ঝগড়া এবং বিচ্ছেদের পরও রোগতপ্ত সাবিত্রীর শীর্ণ মুখের স্মৃতি ভিতরে ভিতরে

তাকে বড় কাঁদাচ্ছিল। সেই দুঃখ ভুলতেই সে কলকাতা ছেড়ে একেবারে বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগনার বৈদ্যনাথ থেকে ক্রোশ দুই দূরে 'দুমকা'র এক বাঙলো বাটিতে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিল । বৈরাগ্য নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু একদিন আকস্মিকভাবে কালবৈশাখী ঝড়ের মধ্যে ঝড়ের মতই নারীকণ্ঠের ডাক—"অকস্মাৎ মেয়েটি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল, মশাই, আমাকে বাঁচান।

বাঁচান! একমুহূর্তে সতীশের বৈরাগ্যের নেশা ছুটিয়া গেল। কামিনী- কাঞ্চন যে একান্ত হেয় এ তË ভুলিয়া গেল—বাঘের মত লাফ দিয়া সে একেবারে মেয়েটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।" (পরিঃ২৮, পৃ.১২৯)

পাঠক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে মেয়েটি সরোজিনী। এর চেয়ে বড় আকস্মিকতা আর কি হতে পারে! সরোজিনী কি করে সতীশের অজ্ঞাতবাসস্থানে পৌছে গেল ? তার একটা ব্যাখ্যা অবশ্য লেখক দেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। অজ্ঞাতবাস সুলভ হলে তাকে আর অজ্ঞাতবাস বলা চলে না। শুধু সরোজিনী একা নয় তার পুরো পরিবারই সতীশের অজ্ঞাতবাসস্থান বৈদ্যনাথে চলে এসেছে। তারা কলকাতা ছেড়ে দেওঘরে এসে থাকা শুরু করেছে। কেন এসেছে বা কখন এসেছে তার কোন উল্লেখ পযর্ন্ত কোথাও নেই। হঠাৎ তাদের এই আগমনে কাহিনির স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে ও পাঠকের বোধগম্যতা আহত হয়েছে।

এই আকস্মিকতার ফলে সাবিত্রীর অনুপস্থিতিতে সতীশ- সরোজিনীর নৈকট্য লাভের সুযোগ হয়েছে। সতীশের কাপড় পরে সরোজিনী বেরিয়ে এলে তার পানে চেয়ে সতীশ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে—

> "জুতা- মোজার পরিবর্তে পা- দু'খানি খালি, রেশমের জামা- কাপড়ের বদলে শুদ্ধমাত্র শেমিজের উপর সতীশের একখানি সাদাসিদে লালপেড়ে ধুতি পরা। দেখিয়া সতীশের দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল। সে উচ্ছসিত আবেগে বলিয়া ফেলিল, কি চমৎকারই আপনাকে মানিয়েচে! যেন ল²ী ঠাকরুনটি!" (পরিঃ২৮, পৃ.১৩২)

সতীশের কাপড় পরে সরোজিনীকে সতীশের চোখে ল²χঠাকরুন লেগেছে, সে যে শুধু মেম নয় হিন্দু নারী তা বোঝানো গেছে, সরোজিনী সতীশকে রাbা করে খাইয়ে সে যে রাbাও করতে পারে তারও প্রমাণ দিয়েছে। এ জাতীয় নাটকীয়তা উপন্যাসে আরো কয়টি জায়গায় ব্যবহার করে কাহিনিকে প্রভাবিত করা হয়েছে।

এছাড়া সরোজিনী চরিত্রটিকে আধুনিক নারীর সংস্করণ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে হ্যাট-কোট পরে চলাফেরা করে, সে গান গাইতে পারে, তার মতেরও দাম আছে এবং সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। কিন্তু তার পরও সরোজিনী কী করে উপেন্দ্রের কথাতে সতীশকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল? যখন সে জানত সতীশ অন্য কাউকে ভালোবাসে—যাকে বিয়ে করতে চায়, যাকে পেলে মাথায় করে রাখবে, যার জন্য সে সমাজ-সংসার ত্যাগ করতেও প্রস্তুত, যে মদ্যপান করে এবং সমাজ অননুমোদিত স্থানে যাওয়ারও অভ্যাস আছে, যার অসুস্থতায় শয্যাপার্শ্বে কুলত্যাগিনী ও পতিতা পল্লীতে বসবাসকারী সাবিত্রী বর্তমান, যার কথায় সে ওঠা-বসা করে—এমন লোকের প্রতি সরোজিনীর মত শিক্ষিত ও আধুনিক নারীর অনুরাগ কেমন করে জb¥ লাভ করল? এই অংশটি পাঠকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলে তাকে দোষ দেয়া যাবে না।

সাবিত্রীর সাথে 'cmহে'র সম্পর্কে জড়িয়ে বাধ্য হয়ে আগের বাসা ছেড়ে সতীশকে নতুন বাসায় চলে আসতে হয়। এখানে কিছুদিন থাকার পর হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সুস্থ হলে কলকাতার পাট চুকিয়ে পশ্চিমের বাড়িতে চলে যায়। মাসখানেক বাড়িতে থাকার পর উপেন্দ্রর অনুরোধে সতীশ আবার কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়। তারপর সতীশ স্থির করে, সে ডাক্তারী পড়া ছাড়বে না। তাই—"পরদিন সন্ধ্যার সময় কাহাকেও কিছু না বলিয়া বেহারীকে সঙ্গে করিয়া তাহার সাবেক বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, বাড়িওয়ালাকে ধরিয়া ছয় মাসের বন্দোবস্ত করিল।" (পরিঃ১৫, পৃ.৬৩)

এত দিন ধরে বাসাটি খালি পড়ে ছিল এবং সেই বাসা-ই সতীশ পুনরায় ভাড়া নিয়ে নেয়। কলকাতা শহরে বাড়ি একমাস খালি পড়ে থাকা এবং সেই বাড়িই পুনরায় ভাড়া নিয়ে নেওয়া—খুব স্বাভাবিক মনে হয় না। তাও না হয় হল কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট সাবিত্রী হঠাৎ কি করে সতীশের বাসায় এসে উপস্থিত হল সে প্রk সহজেই মনে জাগে। সতীশ জানতে চেয়েছে—"কেমন করে সে এ বাড়ির সন্ধান পেলে? সে তো জানিনে বাবু।" (পরিঃ২২, পৃ.৯৫)

বেহারীর সাথে সাথে পাঠকও উËর জানে না। কারণ লেখক জানান নি। এজন্যই মনে হয় লেখক সতীশকে ঐ বাসাতেই এনে হাজির করেছেন

যাতে সাবিত্রীর বাসা খুঁজে পেতে সমm¨ া না হয়। অবশ্য এ বাসাটাও সাবিত্রীর চেনার কথা না। কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার পর পশ্চিমের বাড়িতে মাসখানেক থেকে আবার পূর্বের থাকা বাড়িতেই ফিরে আসবে এমন কথা না থাকলেও নিরুদ্দিষ্ট সাবিত্রী মাসখানেক এখানে সেখানে ঘোরার পর ফিরে এসে খুব সহজেই সতীশের বাড়িতে পৌঁছে যায়। এখানে কাহিনির খুব সরলীকরণ করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র যে বলেছিলেন, এটি তার অল্প বয়সের রচনা, সেটাই বোধ হয় এর কারণ।

সাবিত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলেও সতীশ একান্তভাবে কামনা করেছে তার সঙ্গে দেখা হোক। অন্তর থেকে সে কখনও তাকে দূরে সরাতে পারে নি। কিভাবে যে তাদের দেখা হবে পাঠকের তা জানা ছিল না। এ অবস্থায় সাবিত্রী হঠাৎ সতীশের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে। সতীশ ছিল পাথুরেঘাটায় কিরণময়ীর ওখানে। বাসায় পৌঁছেই উপেনের টেলিগ্রাফ পায় যে সে কলকাতায় আসছে। তবে তার সতীশের ওখানে থাকার সংকল্প আছে বা সুরবালাও তার সঙ্গী হয়েছে এমন কথা টেলিগ্রাফে উল্লেখ নেই। সে স্টেশনে যাবার আগে টের পায়নি সাবিত্রী তার বাড়িতে বর্তমান। যখন ফিরে আসে তখন—

> ‘‘কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোক পুরোভাগে লইয়া মেঝের উপর সাবিত্রী পান সাজিতে বসিয়াছিল। মাথায় কাপড় নাই, আর্দ্র কেশভার সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ...নারীর রোগ ক্লিষ্ট শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের যে নিজস্ব গোপন মাধুর্য আছে, তাহাই এই কৃশাঙ্গীর সদ্য mv‡t মুখের উপর বিরাজ করিতেছিল। ... উপেন্দ্র সতীশ একেবারে দরজার উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধ্যান ভাঙ্গিয়া মুখ তুলিয়া সাবিত্রী... দুই হাত বাড়াইয়া তাহার আরক্ত মুখের উপরে আবক্ষ দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিল।
> সতীশ হতবুদ্ধির মত বলিয়া উঠিল সাবিত্রী! তুমি!’’ (পরিঃ২০, পৃ.৮৯- ৯০)

এক্ষেত্রে পাঠক আগে থেকে জানলেও সতীশের চমকে পাঠক চমৎকৃত হয়েছে। সে হতবুদ্ধি হয়েছে সাবিত্রীকে ঐ অবস্থায় ওখানে দেখে। তার পুরাতন বাসায় নতুন করে এসে ওঠা, সাবিত্রীর সেই বাসার সন্ধান খুব সহজেই পেয়ে যাওয়া এবং বর্তমান বাসায় এসে উপস্থিত হওয়া; সেদিনই উপেন্দ্রর সুরবালাকে নিয়ে তার বাড়িতে আসা এবং সাবিত্রীকে ধ্যাননিরত

অবস্থায় বসে থাকতে দেখে স্তম্ভিত উপেন্দ্রের সুরবালাকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া একই সঙ্গে অস্বাভাবিক ও আকস্মিক। এ যেন বিধাতা হাতে ধরে এনে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আর তার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য লেখককে এই সমস্ত চরিত্রকে একত্র করতে হয়েছে। কাহিনির জটিলতা সৃষ্টির জন্যই আসলে লেখক নিরুদ্দিষ্ট সাবিত্রীকে সতীশের ঘরের মধ্যে এনে ফেলেছেন এবং জটিলতা সৃষ্টির পর আবার দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকে নিরুদ্দিষ্ট করা হয়েছে। লেখকের এই আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছে প্লটের উপর। বহুবিস্তারী হলেও কাহিনি হয়ে পড়েছে সরল ও আকস্মিকতায় পরিপূর্ণ। আর এই আকস্মিকতার প্রভাবে সতীশ- সাবিত্রী এবং উপেন্দ্র- সতীশের বিচ্ছেদ হয়েছে দীর্ঘ সময়ের জন্য। এই বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই কাহিনি এগিয়ে গেছে।

এই সুযোগে সতীশ- সাবিত্রীর মাঝখানে যেমন সরোজিনীর মনে সতীশের প্রতি প্রেম সৃষ্টির সুযোগ হয়েছে, তেমনি কিরণময়ীকেন্দ্রিক অন্য একটি কাহিনি উপন্যাসে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। চরিত্রহীনে কিরণময়ীর উপস্থিতি এতটাই দীর্ঘ যে সাবিত্রীকে ছাপিয়ে কিরণময়ী প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। তখন সংশয় জাগে উপন্যাসের নায়িকা কে, কিরণময়ী না সাবিত্রী ? একুশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে সতীশ- সাবিত্রীর বিচ্ছেদ হলেও আটত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ পযর্ন্ত এই বিচ্ছেদ দীর্ঘায়িত হয়েছে। উনচল্লিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে আবার সাবিত্রীর সরব উপস্থিতি। এর মাঝে কাহিনির অনেক চড়াই- উতরাই, অনেক উত্থান- পতন ঘটে গেছে।

সাবিত্রীর খোঁজে বেহারী যখন পূর্বে মোক্ষদার বাসায় আসে তখন যে দৃশ্য লেখক দেখালেন তার জন্যে বেহারীর সাথে সাথে পাঠকও প্রস্তুত ছিল না। সতীশের নতুন বাড়িতে সাবিত্রী যায় নি এমনকি তার পুরাতন মেসেও সে কাজে যায় নি এ অবস্থায়—

> ‘তার খোঁজে বেহারী ধীরে ধীরে সাবিত্রীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। একটা কপাট বন্ধ ছিল। তাহার আড়ালে সাবিত্রী মাটির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এবং অদূরে তক্তপোষের উপর বিছানায় বিপিন মদ খাইয়া মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে। পদশব্দে চকিত হইয়া সাবিত্রী মুখ

বাড়াইয়া অকস্মাৎ বেহারীকে দেখিয়া এক মুহূর্তে যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।" (পরি:০৯, পৃ.৪৪)

এই ঘটনাটি অস্বাভাবিক ও আকস্মিক। সাবিত্রী যে মুহূর্তে ঘরে এসে মাতাল বিপিনকে তার বিছানায় শায়িত অবস্থায় দেখে বজ্রাহত হয়ে মেঝেতে বসে পড়ে, ঠিক সেই সময়েই বেহারী এসে সাবিত্রীর বাসায় ঢোকে। লেখক বেহারীকে এনে ঐ দৃশ্য দেখালেন যাতে সাবিত্রীর সম্পর্কে অবিশ্বাস দানা বাধতে পারে এবং কাহিনির মোড় পরিবর্তিত হতে পারে। এতে যে নাটকীয়তা সৃষ্টি হতে পারে লেখক তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, সাবিত্রীর অনুপস্থিতিতে মদ্যপ বিপিন মাতলামী করে সাবিত্রীর ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সাবিত্রী এসে এই অবস্থা দেখে রোষে- ক্ষোভে বিমূঢ় হয়ে বসে পড়লে—"তাহার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করিতে লাগিল, এবং মাথার মধ্যে হঠাৎ মূর্ছার লক্ষণ অনুভব করিয়া দ্বারের আড়ালে কবাটে মাথা রাখিয়া নির্জীবের মত বসিয়া পড়িল।" (পরি:০৯, পৃ.৪৬)

ঠিক ঐ মুহূর্তেই বেহারী এসে বিপিনকে সাবিত্রীর ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে। তবে শরৎ সাহিত্যে বিশেষ মুহূর্তগুলো বড় চমৎকার রচিত হয়েছে। সাবিত্রীর প্রতি বেহারীর শ্রদ্ধা মিশ্রিত স্নেহ ও ভালোবাসা থাকলেও এই দৃশ্য দেখার পর তার ভিতরে ঘৃণা তৈরি হয়। স্বভাবতই সেটা সতীশের মধ্যে আরো বেশী ঘনীভূত হয়েছে। বেহারীর মাধ্যমে সে ভুল তথ্য পায় যে, সাবিত্রী বিপিনের কাছে চলে গেছে। এটি তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে উপন্যাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তার করেছে। বিভিন্ন জায়গায় তারা মিলিত হয়েও মিলতে পারেনি। সাবিত্রী সতীশের কাছে ধরা দেয় নি। একেবারে উপন্যাসের প্রায় শেষে উনচল্লিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে তাদের মিলন হয়েছে তাও সাময়িক। উপেন্দ্র এসে আবার তাকে সতীশের জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

কিরণময়ী নাটকীয় প্রেমের জাল বিস্তার করে ভোলাভালা ও সদ্য- উদ্ভিন্নযৌবন যুবক দিবাকরকে নিয়ে যখন আরাকানে পালিয়ে যায় তখন বলা নেই কওয়া নেই সতীশ তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য সেখানে যায় এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে খুব সহজেই ঠিকানা জানা না থাকলেও অতবড় রাজ্য থেকে কিরণ- দিবাকরকে খুঁজে বের করে দেশে ফিরিয়ে

নিয়ে আসে—"এক দীর্ঘকায় পুরুষ প্রকাণ্ড একটা চামড়ার ব্যাগ বামহস্তে স্বচ্ছন্দে বহন করিয়া লইয়া সম্মুখে আসিয়া গভীরকণ্ঠে ডাক দিল বৌঠান। তাহার ডান হাতের আঙ্গুলে প্রকাণ্ড একটা হীরার আংটি রবিকরে ঝলমল করিয়া উঠিল...। আগন্তুক সতীশ। (পরিঃ৪৩, পৃ.২১৮)

এমনভাবে সতীশ সেখানে পৌঁছেছে যাতে মনে হবে আরাকানে যে কারো ঠিকানা খুঁজে বের করা খুব সহজ। লেখক কাহিনির এমন পরিণতি দিয়েছেন যা অনেকটা গোঁজামিলের মতো মনে হয়। আবার সতীশ তন্ত্রসাধকের পাল্লায় পড়ে বেহারীকে তাড়িয়ে দিলে, বেহারী বাড়ি না-গিয়ে প্রথমবারের মত কাশীতে যায়, এবং ঠিকানা জানা না থাকলেও সেখানে খুব সহজেই সাবিত্রীকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বেহারীর সাথে সাবিত্রীর কোন ঠিকানা বিনিময় না-হলেও মনে হল বেহারী জেনেই কাশীতে গেছে, যে অমুক জায়গায় সাবিত্রী অমুক সময় উপস্থিত থাকবে, সে গেলেই তাকে খুঁজে পাবে এবং ফিরিয়ে আনতে পারবে। বিষয়গুলি কোন কোন সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> "অনেক জায়গায় ঘটনার গতি দ্রুত, অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সাবিত্রীর কাশী চলিয়া যাওয়া এবং সেখান হইতে তাহাকে পুনরায় আবার বেহারীর লইয়া আসা, সতীশের হঠাৎ সাঁওতাল পরগণায় চলিয়া যাওয়া এবং সেখানে আবার হঠাৎ সরোজিনীকে উদ্ধার করা এবং তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হওয়া, যে-কিরণময়ী কোনদিন ঘরের বাহিরে যায় নাই তাহার পক্ষে দিবাকরকে লইয়া আরাকানের পথে যাত্রা করা, আবার কোন ঠিকানা না জানিয়াও সতীশের পক্ষে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা, উপেন্দ্রর ঘুরিতে ঘুরিতে পুরীতে ঠিক ভুবন মুখুয্যের হোটেলে ওঠা এবং সেখানে মোক্ষদার কাছে সাবিত্রীর পরিচয় পাওয়া—এ-সব ঘটনা কষ্টকল্পিত ও অবিশ্বাস্য মনে হয়। লেখক বহুবিস্তারী কাহিনীর অবতারণা করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় কাহিনীর বিভিb ধারার মধ্যে যোগ সাধন করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাপ্তির দিকে লইয়া যাইবার জন্যই তাঁহাকে এ-ধরনের আকস্মিক ও চমকপ্রদ ঘটনার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।" [৪৪]

চরিত্রহীন উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতেও শরৎচন্দ্র আকস্মিকতা, অস্বাভাবিকতা ও ভাবালুতার আশ্রয় নিয়েছেন। নারী চরিত্রের মধ্যে যেমন সাবিত্রী ও

---

[44] | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›`i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.170-71

কিরণময়ী চরিত্রে অস্বাভাবিকতা রয়েছে, পুরুষ চরিত্রের ভিতরে তেমনি অস্বাভাবিকতা আছে উপেন্দ্র ও সতীশে। সাবিত্রী মেসের ঝি, বিধবা ও কুলত্যাগিনী হয়েও সেকালের ইউরোপের নাইটের মত যুবক সতীশকে ভালোবেসেছে। একেবারে সৌভাগ্যের প্রিয়তম পুত্র! স্বাস্থ্য, শক্তি, রূপ, ঐশ্বয! মানুষ যা কিছু কামনা করে একাধারে সমস্ত কিছু থাকার পরও সতীশ ভালোবেসেছে মেসের ঝি কুলত্যাগিনী বিধবাকে, যাকে ভালোবেসে সে পরিবার, সমাজ, সংসার সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। লেখক তাদের প্রেমের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা একই সাথে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। এছাড়া সতীশ–সাবিত্রীর প্রেমকে কলুষিত করবার জন্য সন্দেহের আবর্ত থাকলেও তা ঘনীভূত হয়নি। সংকীর্ণ মেসের মধ্যেই গুমরে মরেছে, বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে নি। সীমিত হলেও একনিষ্ঠ প্রেম বা প্রেমের মাধুর্যই প্রকাশিত হয়েছে।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> ‘‘আকস্মিকতা আর আংশিকতা সাবিত্রী–চরিত্রে বর্তমান, যেমন আছে অন্যান্য শরৎ–সৃষ্ট চরিত্রে। সাবিত্রী–চরিত্র কেবল আকস্মিক ও আংশিক নয়, সেই সঙ্গে অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য, আর হেঁয়ালিতে ভরা।
> সাবিত্রী ‘মেসের ঝি’। কলকাতার মেসে সতীশ–সাবিত্রীর বাধাহীন প্রণয় সম্পর্ক বিশ্বাসের সীমাকে লঙ্ঘন করে যায়।’’ [৪৫]

এ সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

> ‘‘এইরূপ অনুকূল অবসর আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে—মনে হয় যেন বাস্তবতার ঠিক মর্মস্থলে অবাস্তবতার একটা সূ²তর স্পর্শ দানা বাঁধিয়াছে।’’ [৪৬]

উপেন্দ্র চরিত্রের অস্বাভাবিকতা উল্লেখ করার মত। লেখক পুরো উপন্যাস জুড়ে বলবার চেষ্টা করেছেন উপেন্দ্র একটি আদর্শ চরিত্র কিন্তু কি কারণে আদর্শ লেখক তা বলতে নি। পুরো উপন্যাসে এমন কোন প্রমাণ মেলে না যাতে আমরা উপেন্দ্রকে আদর্শ চরিত্র বলতে পারি। সে আদালতে গিয়ে

---

[45] | Ai“YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›‘ cbwePvi, c‡ev³, c.49
[46] | kxKgvi e‡›‘¨vcva¨vq, e½ mwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, cbg‘Y 2010-2011, c.138

এমন কোন পসার জমাতে পারে নি অর্থাৎ সে তার কাজে খুব দক্ষ নয়—তদুপরি অলস জীবন- যাপন করতে পছন্দ করে, হারাণের মৃত্যুর সময় সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল—এতবড় কলকাতা শহরে সে একা কি করবে। যে সব কিছু ম্যানেজ করতে পারে সে উপেন্দ্র নয়, সতীশ; তাদের দাম্পত্য জীবনও কেন অনুসরণীয় তারও কোন উল্লেখযোগ্য কারণ লেখক দেখাতে পারেন নি।

ক্ষেত্র গুপ্ত বলছেন, "তারা দুজন যে কেন আদর্শ ও প্রণম্য তার গ্রহণযোগ্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।" [৪৭] যে উপেন্দ্র সাবিত্রীকে সতীশের ঘরে বসে থাকতে দেখেই সুরবালাকে সাথে নিয়ে হন হন করে চলে গেলো উপন্যাসের শেষে বাসার ঝি মোক্ষদা ও চরিত্রহীন ভূবন মুখুয্যের কাছে সেই সাবিত্রীর সতীত্বের পরিচয় পেয়ে তাকে বোন বানিয়ে এতবড় ভালোবাসা সতীশের জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে সমাজ রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে।

ক্ষেত্র গুপ্তের মতে,

> "সতীশ- সাবিত্রীর প্রেমে ও যৌথ জীবনে উপেন্দ্র গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যদিও তা গল্পকারের জবরদস্তি বলে মনে হয়। উপেনের উপন্যাসে আরও নানা কাজ, সতীশ- সরোজিনীর আলাপ করিয়ে দেওয়া। সরোজিনীও উপেনের এত ভক্ত হয়ে পড়ে (কখন কি ভাবে হল?) যে শুধু তার নির্দেশেই সতীশ- সাবিত্রী সম্পর্ক জানার পরেও সতীশকে বিয়ে করতে রাজী হল। লেখক এভাবেই ঘটনা- বিন্যাস করেছেন—তাতে পাঠকের বিশ্বাসের উপর জুলুম করা হয়েছে।" [৪৮]

আবার সতীশ উপেন্দ্রের হাতে তৈরি। সে তার বন্ধু, ফিলোসফার, গাইড; সতীশের উপর তার অগাধ বিশ্বাস—এটিও অবিশ্বাস্য কারণ, রাখালের উড়ো চিঠি পেয়ে সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল অথচ সাবিত্রীকে সতীশের বাড়িতে বসে থাকতে দেখেই সেই চিঠিটিই সত্য হয়ে গেছে, এত বিশ্বাস সাথে সাথে অবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

---

[47] | †¶Î ¸ß, J cb¨wmK kirP›' P‡Ævcva¨vq, c_g evsjv‡'k ms¯‹iY:2011, c.156
[48] | H, c.157

আবার এত ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সতীশ যে উচ্ছ•Lল জীবন-যাপন করত, মদ্যপান করত, বিপিনের সাথে এখানে ওখানে যেত, সাবিত্রীর আঁচল ধরে টানাটানি করত এসব কিছুই উপেন্দ্র জানত না।

আবার উপেন্দ্রই উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনা যুক্ত করেছে। সতীশের সাথে তার সংস্রব বন্ধু বলে, কিরণময়ীর সাথে তার যোগাযোগ বন্ধু হারাণের স্ত্রী বলে, সরোজিনীর ভাই জ্যোতিষের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধু বলে, মোক্ষদার সাথে তার সংযোগ সতীশের বাড়ির কাজের লোক বলে, উপন্যাসের শেষে সাবিত্রীর সাথে বোন হিসেবে সম্বন্ধ ভুবন মুখুয্যের কথায় সতীত্ব অক্ষুY আছে বলে। সমগ্র উপন্যাসের কাহিনি যুক্ত করেছে এই উপেন্দ্র চরিত্রটি। তাকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত চরিত্রবান ও নমm¨ করে সৃষ্টি করতে চাইলেও উপেন্দ্র চরিত্রটি সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। সংযোগকারী চরিত্র হিসেবে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পZীপ্রেমে মুগ্ধ উপেন্দ্র স্ত্রী-বিয়োগের পর একই রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে স্ত্রীর মতই আকস্মিক মৃত্যু বরণ করে উপন্যাসের সমাপ্তিকে তরান্বিত করেছে।

কিরণময়ী চরিত্রেও একই ধরনের অস্বাভাবিকতা বর্তমান। কিরণময়ী অতুলনীয় রূপ ও ক্ষুরধার যৌবনের অধিকারী। একই সাথে বুদ্ধিমতী, বাগবৈদগ্ধ্যে অভিজ্ঞ ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী চরিত্র। শরৎ তথা বাংলা সাহিত্যে এরূপ চরিত্র দুর্লভ। কিন্তু তার চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তন—আরাকানে গিয়ে একবার এবং উপন্যাসের শেষে তারই ধারাবাহিকতায় আরেকবার—Ub¥াদ অবস্থায়, ঠিক মেনে নেয়া যায় না। অজিতকুমার ঘোষের মতে, “তাহার এরূপ পরিণতি আকস্মিক ও অবিশ্বাসজনক মনে হয়।”[৪৯]

উপন্যাসের শুরুতে সতীশ ও উপেন্দ্র কিরণময়ীর বিদ্যুৎ-শিখার মত তীব্র রূপের ঝলসানো দীপ্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেও উপন্যাসের শেষে তার Ub¥াদ অবস্থা দেখে পাঠক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছে। অসামান্য কিরণময়ী চরিত্রের অসঙ্গতি অনেক স্থানেই পরিদৃষ্ট হয়। যে কিরণময়ী অসুস্থ স্বামীর শয্যাপার্শ্বে অনঙ্গ ডাক্তারকে নিয়ে প্রেমলীলায় মেতেছিল সেই কিরণময়ী

49| AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›`i Rxebx I mvwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.375

উপেন্দ্রকে দেখেই এবং তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা সতীশের মুখে শ্রবণ মাত্রই প্রেমে পড়ে যায়। রূপ-যৌবন ও বিদ্যার অহঙ্কার নিয়ে সুরবালার সাথে দেখা করতে গিয়ে সুরবালার রূপ ও হৃদয়ের সত্যের দীপ্তি দেখে তাকে বুকে টেনে নিয়ে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। তারপরও উদ্দাম হৃদয়বৃŸির তাড়নায় সাহসী কিরণময়ী উপেন্দ্রকে প্রেম নিবেদন করে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর cmহাস্পদ দিবাকরকে নিয়ে আরাকানে পালিয়ে যায়। আবার সতীশ ফিরিয়ে নিতে আসলে সতীশের মুখে উপেন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাওয়া এবং কলকাতায় ফিরে এসেই Ub¥াদ হয়ে যাওয়া—এর কোথাও কিরণ চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি।

অরুণকুমারের জিজ্ঞাসা, কিরণের দিবাকরকে নিয়ে আরাকানে পালিয়ে যাওয়া—

"প্রতিশোধস্পৃহা, না রিরংসা? অবদমিত যৌন-জীবনের তৃপ্তিসাধনের উদগ্র কামনা, না mvyুবিকারগ্রস্ত রমণীর অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া?" [৫০]

আরাকানে দিবাকর কিরণের গায়ে হাত তুলতে কুণ্ঠিত হয়নি আবার পরমুহূর্তে তার পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতেও তার সময় লাগেনি। দিবাকরের মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। কিরণ চরিত্রের সম্ভ্রান্ততা আরাকানের বস্তির পরিবেশে ক্ষY হয়েছে আর তাই হয়ত তার গায়ে হাত তোলা কিরণ খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে কিন্তু উপেন্দ্রর অসুস্থতার সংবাদ সে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে নি। সতীশের মুখে অসুস্থতার সংবাদ শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে। এ পর্যন্ত তার চরিত্রে মূর্ছা ব্যতীত অন্য কোন অপ্রকৃতিস্থের লক্ষণ প্রকাশ পায় নি, কিন্তু সতীশ তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরপরই আকস্মিকভাবে তার মস্তিস্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। কালীঘাটে যাকে-তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করতে থাকে ভগবান কি সত্যি আছেন? সুরবালার কথা মনে হয়, তখন যদি তার কথাটা বিশ্বাস হত। তারপরই সে পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গেছে। আর তাই প্রেমাস্পদ উপেন্দ্রর মৃত্যুর সময়েও সে নির্বিcN, নিরুদ্বেগে ঘুমাতে পেরেছে।

---

[50] | Ai"YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›' cbwePvi, c‡ev³, c.60

সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা গ্রন্থে আদিত্য ওহদেদার বলছেন—"কিরণময়ীর শেষের অধঃপতন ও বিকার যেরূপ অস্বাভাবিক, তাহার শেষের উন্মËতা, তাহার আস্তিক্য-বুদ্ধির উcb¦ষ ও তাহার জড়তাও সেইরূপ মামুলি।" [৫১]

উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, খরদীপ্তির অধিকারী, চোখঝলসানো রূপের আলোকচ্ছটায় রঙ্গমঞ্চ মাতানো কিরণময়ীকে উb¥াদ বানানো হয়েছে। সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে গুলি করে মেরেছিলেন, তাও ভাল যে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার যন্ত্রনা লাঘব হয়েছিল। কিন্তু কিরণের কোন দিক দিয়েই মুক্তিলাভ ঘটেনি। অনেকসময় দেখা যায় প্রচণ্ড সংঘাত অথবা সাংঘাতিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত চরিত্রের এ পরিণতি হতে পারে কিন্তু কিরণময়ীর ক্ষেত্রে এসব কিছুই হয়নি। তারপরও লেখক অস্বাভাবিকভাবে তার উb¥াদ অবস্থা দেখিয়েছেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> "তাহার মস্তিষ্ক-বিকারের চিত্রটি অতি আকস্মিক হইয়াছে—উপেন্দ্রের আসb মৃত্যুর সংবাদে যে মূর্ছা তাহার প্রেমের গোপন কথাটি সুবিদিত করিয়া দিল, তাহার ঘোর যে তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের জন্য আচ্ছb ও অভিভূত করিবে তাহার ইঙ্গিত সেরূপ সুস্পষ্ট হয় নাই।" [৫২]

A i"YKgvi g‡Lvcva¨vq g‡b K‡ib,

> "সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে অভয়া(শ্রীকান্ত) ও কমল(শেষপ্রk) ছাড়া কিরণময়ীর মত বিদ্রোহিণী আর কেউ নেই। এবং কমল ছাড়া কিরণময়ীর মত বুদ্ধিমতী, প্রখর মননশক্তির অধিকারিণীও আর নেই। অথচ এই কিরণময়ী চরিত্রে অসঙ্গতি, আতিশয্য ও অস্বাভাবিকতা আরও বেশী পরিস্ফুট।...
> আসলে আকস্মিকতা ও অসঙ্গতি কিরণময়ী-চরিত্রের ভিËভূমি।" [৫৩]

51| m‡ikP›' ˆgÎ m¤úvw' Z, kir-mvwn‡Z¨i fwgKv(m¼jb), cKvkK:GBP.Gj.mvnv, c.37
52| kxKgvi e‡›'¨vcva¨vq, e½ mvwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, c‡ev³, c.140
53| Ai"YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›' cbwePvi, c‡ev³, c.58,60

পরিশেষে বলা যায়, চরিত্রহীন উপন্যাসের আকস্মিকতা, অসঙ্গতি ও আতিশয্য এর শিল্পসঙ্গতিতে বড় ধরনের ব্যত্যয় ঘটিয়েছে। এই উপন্যাসে আকস্মিকতা কাহিনির স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে এর পরিণতিকে প্রভাবিত করেছে। আতিশয্য ও অস্বাভাবিকতা এখানে প্রচুর আছে যা শিল্প–সৌন্দর্যকে অনেক জায়গায় হানি করেছে বলে অধিকাংশ সমালোচকই মত পোষণ করেছেন।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে,

> “শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে ‘চরিত্রহীন’ চিন্তার দৃঢ়তায় ও কল্পনার সাহসিকতায় অনন্যসাধারণ, কিন্তু রচনাসৌষ্ঠবে ইহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, কারণ ইহার মধ্যে ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও সংযম নাই।” [৫৪]

অনেক স্থানে আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা থাকার পরও এটি তার একটি শ্রেষ্ঠ রচনা এতে সন্দেহ নেই। আকারে যেমন বৃহৎ, কাহিনি পরিসরেও তেমনি বিস্তৃত, জীবনের গভীর অনুভূতি এতে ব্যক্ত, পাশাপাশি প্রেমের মাধুর্য যেমন প্রতিফলিত, জীবনরহস্যও তেমনি সুঅঙ্কিত।

---

[54] | m‡evaP›‘ †mb¸ß, k i rP›‘, mß ‘ k ms¯‹iY: AMnvqY, 1407, c.167

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকান্ত

Dhaka University Institutional Repository

‘শ্রীকান্ত’ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়ও বটে। উপন্যাসটিতে একই সাথে লেখকের ব্যক্তি ও শিল্পী-সËার প্রকাশ ঘটেছে উËমরূপে। দেড় দশকেরও বেশী সময় ধরে রচিত চার খণ্ডের শ্রীকান্ত’র সর্বত্র সমান শিল্পমনোযোগ আশা করা যায় না। চলমান সময়ের প্রবাহে লেখকের মনোভাবের বদলে শ্রীকান্ত উপন্যাসেরও পরিবর্তন হয়েছে। আত্মজীবনীমূলক রচনা শ্রীকান্তকে শুরুতে লেখক নিজের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলেও পরে তা অস্বীকার করেছেন। ভারতবর্ষ পত্রিকায় ‘শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা’ ছদ্মনামে লেখাটি প্রকাশের সময় নাম দিয়েছিলেন ‘শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী’। শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব- ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব- ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব- ১৮ এপ্রিল ১৯২৭ এবং চতুর্থ পর্ব- ১৩ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম দুই পর্ব সাহিত্যজীবনের স্বর্ণ সময়ে লিখিত। এ সময়ে তার প্রধান উপন্যাসসমূহ প্রকাশিত হয়(১৯১৬-১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)। কোন কোন সমালোচকের মতে এরপর শরৎসাহিত্য অবসাদ-আক্রান্ত হয়, ফলে শ্রীকান্ত’র শেষ দুই পর্বও এর বাইরে যেতে পারেনি।

১৫.১১.১৯১৫ তারিখে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন,

> “শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। ...আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়। ...অবশ্য শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ তো থাকিবেই, তা ছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। ...যাইহোক শ্রীকান্ত পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে তা জানাবেন। ততদিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখবো না।” [৫৫]

55| ‡MvcvjP›‘ ivq, kirP›‘ (3q LÊÑcÎvejx), c_g cKvk: AvIvp 1376, RjvB 1969, c.132

৭ ভাদ্র বাজে শিবপুর হতে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন,

> "রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে? ওসব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বইত নয়; ওসব মিছে জনরবে কান দিতে নেই।" [৫৬]

শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৪.০৮.১৯১৯ তারিখে অন্য একটি পত্রে জানাচ্ছেন,

> "রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই। থাকলেও তাকে আবার দিদি বলা কিসের জন্যে, সে কি তোমার কাছে এ সম্মান পাবার যোগ্য? ...শ্রীকান্তটা আর একবার পড়ে দেখো। হয়তো তার ওপর ঘৃণাই হবে। কিন্তু সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক মিথ্যে।" [৫৭]

দিলীপকুমার রায়কে(১৮৯৭- ১৯৮০) চতুর্থ পর্ব সম্পর্কে চিঠিতে লিখেছেন

> "উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরঞ্চ অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ ব্যাপারটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না, থাকবে গভীরতা, পু•Lানুপু•L বিবৃতি নয়, থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যারা তাদের আনন্দের জন্য। ...কিন্তু তোমার অভিমত চাই।" [৫৮]

"সেই কাঙ্ক্ষিত বাক্য শোনার পর উৎফুল্ল তিনি,

> শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারিনে—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যZ করে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যেই। তোমার মত একটি পাঠকও শ্রীকান্তর ভাগ্যে জুটেছে এই আমার পরম আনন্দ, অন্য পাঠক আর চাইনে।" [৫৯]

শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল চতুর্থ পর্বের পরেও আরেকটা পর্ব লিখবেন। ৫ জ্যেষ্ঠ, ১৩৪০ দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন,

> "পঞ্চম পর্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ করে দেবো। অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো চতুর্থ পর্ব ভালো হয়নি তবে থাকলো এইখানেই রথ।" [৬০]

56| H, c.216
57| H, c.221
58| H, c.348
59| H, c.353
60| H, c.348

শ্রীকান্তর জীবনের মতই উপন্যাসের কাহিনি ছাড়াছাড়া, ডায়েরীসদৃশ। উপন্যাসের ঐক্য সুসংহত নয়; বিচ্ছিb সময়ের নানামুখী পরিচ্ছেদের সমষ্টি। একমাত্র রাজলক্ষ্মী সমস্ত উপন্যাসের পারম্পর্য রক্ষা করে একে সুসংগঠিত করেছে। যেমন শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের বারটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদই শ্রীকান্তের কৈশোরকালের চিত্র। দ্বিতীয় পর্বে পনেরটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম দুটি এবং শেষ তিনটিতে রাজলক্ষ্মী, বাকী সবগুলিতেই অভয়া এবং শ্রীকান্তর বর্মাবাসের চিত্র। রাজলক্ষ্মী নামমাত্র উপস্থিতিতে কাহিনির ঐক্যসূত্র যোজনা করেছে। তবে একথা স্বীকার্য, এই উপন্যাসের প্রতিটি খণ্ড– চিত্রই শিল্পমাধুর্যে অনন্য।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> ‘‘চার পর্বে বিধৃত ‘শ্রীকান্ত’ মূলতঃ শ্রীকান্ত– রাজলক্ষ্মীর প্রেমের বিচিত্র টানা–পোড়েনের ইতিহাস। পেয়ে হারানো ও দূরে ঠেলার দুঃখ, ফিরে পাবার আনন্দ, ছাড়া পাবার ব্যাকুলতা ও ছাড়া পেয়ে আফসোস; নরনারীর প্রেমাকর্ষণ– বিকর্ষণের মাধুর্য ও বেদনা এই উপন্যাসে রসরূপ লাভ করেছে।’’ [৬১]

মহাকাব্যোপম উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত’র কাহিনি রাজলক্ষ্মী– শ্রীকান্তকেন্দ্রিক হলেও এর শুরুটা দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্র দিয়েঃ একটি ইন্দ্রনাথ, অন্যটি অbদাদিদি। ইন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র হবার গৌরব লাভ করেছে। অন্যদিকে অbদাদিদি পতিভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদে এদের সরব উপস্থিতি এবং এর পরেই তারা মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখকের বর্ণনা—

> ‘ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই চারিটা বসন্তের দাগ। ...ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্লভ হইলেও অসাধারণ হয়ত নয়। কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সত্যই অসাধারণ তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। ...বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত– তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি!’’ (পর্ব– ১, পরি:০১, পৃ.২)

---

[61] | Ai“YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›‘: cbwePvi, c_g †‘ÛR ms¯‹iY: Rvbqvix 2001, c.39

মোহিতলাল মজুমদার তার 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন,

> "এমনই বিশাল যে, তাহার দিকনির্ণয় বা গ্রন্থিমোচন সম্ভবপর নহে। কারণ এ চরিত্রের মূলতË প্রাণের মহামুক্তি; ইহা একই কালে আসক্ত ও নিরাসক্ত কোন বন্ধনপীড়া মানিবে না, অথচ সেই মুক্ত প্রাণেরও কি প্রেম, কি করুণা! বালকের মত ইহার বিশ্বাস, যুবকের মত ইহার বীর্য্য ও অকুতোভয়, মহাস্থবিরের মত ইহার তËজ্ঞান; যেন সকল জ্ঞান সকল প্রেম ও সকল শক্তি একটি চিরকিশোরের রূপে লীলা করিতে নামিয়াছে।" [৬২]

ইন্দ্রনাথের সাহস দুর্দান্ত, অ™ত ভয়শূন্যতা, অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়, দুর্দমনীয় তেজোদীপ্ততা, লৌহকঠিন বাহুবল পাশাপাশি তার অনন্যসাধারণ মহত্ব, কোমল হৃদয় ও ভালোবাসা শ্রীকান্তকে আকর্ষণ করেছিল। মাস দুই- তিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্য শহরে পিসিমার বাড়িতে এলেও সকল ভয়কে অতিক্রম করে ইন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে নিশীথে সকলের অগোচরে বিপুল জলধারার মË গর্জনের মধ্যে ছোট ডিঙ্গিতে চড়ে চরম উৎËজনার মধ্যে যাত্রা তো বোধহয় একমাত্র ইন্দ্রনাথের সাথেই সম্ভব। সে যে কতবড় মহাপ্রাণ তা তার নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে প্রমË জলরাশি পেছনে ফেলে জীবন- মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে স্বার্থ ত্যাগ করার মধ্যেই বোঝা যায়; অথবা অকাল মৃত্যু- দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে যখন প্রk ওঠে কি জাতের মড়া? তখন ইন্দ্রনাথই বলতে পারে "মড়ার আবার জাত কি?" বন- ঝাউ ও ভুট্টা জনারের চড়ার ফাঁকের বিপদ তুচ্ছ করে রাম নাম মন্ত্রের জোরে শ্মশানের ভয়কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চুরি করা মাছ বিক্রি করে সেই অর্থে সাপের মন্ত্র শেখার বা অন্যকে সাহায্য করার আগ্রহে চঞ্চলতার যে শিহরণ তা পাঠককেও রোমাঞ্চিত করে।

ইন্দ্রনাথের মাধ্যমে অbদাদিদির সাথে শ্রীকান্তের প্রথম দেখা হলে মনে হয়েছে যেন—"ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! যেন যুগ যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।" অbদাদিদির পাতিব্রত্য, সংস্কার, সহিষ্ণুতা, সংযম, আদর্শবোধ শ্রীকান্ত সমগ্র জীবনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ

---

[62] | †gwnZ jvj gRg'vi, kxKv‡ši kirP›', c_g we‡'¨v'q ms¯'iY: WW‡m¤i 1971, c.29

করেছে। অbদার স্বামী তার বিধবা বড় বোনের সঙ্গে দুষ্কার্য শেষে তাকে হত্যা করে পালিয়েছিল। সাত বছর পর তাদেরই বাড়ির সামনে সাপ খেলানোর সময় অbদা সাপুড়েকে স্বামী বলে চিনতে পেরে তার সাথে গৃহ ত্যাগ করে। সমাজের চোখে কুলত্যাগিনী– ভ্রষ্টা অbদার স্বামী মদ্যপ, জুয়াখোর, অত্যাচারী হলেও পতি– ভক্তিতে সে ছিল অবিচল। সাপের ছোবলে শাহজীর মৃত্যু হলে অbদা নিরুদ্দিষ্ট হয়। এখানেই অbদা পর্বের সমাপ্তি। সপ্তম পরিচ্ছেদে হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রনাথের নতুনদার কর্মকাণ্ড বর্ণিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদেই কোন আড়ম্বর ছাড়াই ইন্দ্রনাথেরও সমাপ্তি ঘটেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজলক্ষ্মীর আকস্মিক আবির্ভাব। বাল্যকালে একই পাঠশালার পোড়ো রাজলক্ষ্মী– শ্রীকান্তের যতটা না বিদ্যাভ্যাস হত, তার চেয়ে বেশী হত পাঁকা বৈঁচি ফলের মালার আদান– প্রদান। যা দিয়ে প্রত্যহ রাজলক্ষ্মী তার হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করত। কিন্তু নিজের ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতি উদাসীন শ্রীকান্ত সেই অর্ঘ্য গলাধঃকরণ করত এবং অর্ঘ্যর আকৃতি ক্ষুদ্র হলে অর্ঘ্য নিবেদনকারীর পিঠের উপর তাল পড়ত। মাত্র ন'বছর বয়সে সেই কিশোর বরের পরিবর্তে বিরিঞ্চি দেঁর বাড়ির পাচক কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঁর টাকা পণে একরাত্রে রাজলক্ষ্মী ও তার বড় বোন সুরলক্ষ্মীর একই বৈঠকে বিয়ের আয়োজন হয়। এর বছর দেড়েক পরে আধকপালী উপাধিধারী সুরলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। এরও বছর দেড়েক পর পোড়াকপালী রাজলক্ষ্মী কাশীতে কথিত ওলাওঠা রোগে মরে শিবত্ব লাভ করে। আর বর পাচক ঠাকুর বছরখানিক পর কলকাতার কোন এক হোটেলের রন্ধনশালায় রাঁধতে রাঁধতে জ্বরে মরে।

রাজলক্ষ্মীর মা ছেলেবেলায় এক মৈথিলী রাজপুত্রের হাতে রাজলক্ষ্মীকে বিক্রি করে দিয়েছিল। রাজপুত্র হঠাৎ মারা গেলে তাকে আবার বিক্রি করার চক্রান্ত করে—এবার শ্রীকান্তের বন্ধু কুমারসাহেবের কাছে। যার পরিচয় আমরা অষ্টম পরিচ্ছেদে পেয়েছি।

কুমারসাহেবের নিমন্ত্রণে তার শিকার পার্টিতে এসে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর মৃত রাজলক্ষ্মীর সাথে শ্রীকান্তের হঠাৎ দেখা। শ্রীকান্ত প্রথমে চিনতে না

পারলেও রাজলক্ষ্মী তাকে ঠিকই চিনেছে। শ্রীকান্তের চোখে বিস্ময়— "ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত, মাথার চুলগুলো তামার শলার মত" —সেই রাজল ী এই হয়েছে!" (পর্ব-১, পৃ.৪৯)

শিকার পার্টিতে রাজলক্ষ্মীর আকস্মিক প্রণয় নিবেদন তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিকতা আর মৃত্যুভয়শূন্যতার প্রভাবে রাজলক্ষ্মীর শত নিষেধ ও সানুনয় প্রার্থনা উপেক্ষা করে শ্রীকান্তের শ্মশানযাত্রা এবং অমঙ্গল আশঙ্কায় রাজলক্ষ্মীর মনোযোগ ও মমত্ব শ্রীকান্তকে তার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এই আগ্রহ ক্রমে তার মনে মোহনীয় রূপ ধারণ করার ফলে সর্বদা একটা অভাবের বেদনা চাপা সর্দির মত দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠে। তাই একদিন 'পাটনা'র উদ্দেশ্যে টিকেট কেটে ট্রেনে চড়ে বসে।
কিন্তু 'বাড়' স্টেশনেই হঠাৎ নেমে পড়ে। সেখানে সb্যাসীর আশ্রমের সন্ধান মিললে সেই মুক্তিমার্গের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে সে আর কোন পিয়ারীর কাছেই যেতে চায় না; তা সে যত মোহনীয়ই হোক। একসময় সb্যাসীর আশ্রম 'প্রয়াগ' স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে 'বিঠৌরা' গ্রামে যাত্রা বিরতি হয়। সেখানে বর্ধমান জেলার রাজপুর গ্রামের গৌরী তেওয়ারীর মেয়ের উপর অত্যাচার দেখে আদর্শ হিন্দু সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে শ্রীকান্তের মনে একটা বিদ্রোহের ভাব জেগে ওঠে।

এরপর 'আরা' স্টেশন হতে ক্রোশ আষ্টেক দূরে 'ছোট বাঘিয়া' নামক স্থানে রামবাবুর সাথে পরিচয় হয়। তাদের অসুস্থ ছেলে নবীন-জীবনকে বাঁচিয়ে নিজেই জ্বরে আক্রান্ত হয়। তাদের কৃতNতায় বিস্মিত শ্রীকান্ত এক প্রাচীন বিহারী ভদ্রলোকের দয়ায় 'আরা' স্টেশনের বাইরে নীত হয়। টেলিগ্রাম পেয়ে এখানেই রাজলক্ষ্মীর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। এবং এই প্রথম রাজলক্ষ্মী তাকে তার 'পাটনা'র বাড়িতে নিয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে শ্রীকান্ত উপলব্ধি করে রাজলক্ষ্মী সংসারে সর্বপ্রকারে স্বাধীন হলেও তার অসংযত কামনা, উচ্ছ•Lল প্রবৃË যত অধঃপথেই তাকে ঠেলুক কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, বন্ধু সতীন-পুত্র হলেও সে তার মা। রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সËেও মাতৃত্বকে জয়ী করেছে—"বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।" (পর্ব-১, পরি:১২, পৃ.৭৫)

সে আরো উপলব্ধি করে, রাজলক্ষ্মী তার বিগত জীবনের কালি অনেকখানি ধুয়ে ফেলেছে। তার এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম থেকে তাকে অসম্মানিত করে বের করে নিয়ে আসা শ্রীকান্তের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কোন দ্বিধা না করে রাজলক্ষ্মীর জন্যই রাজলক্ষ্মীকে তার ছেড়ে যেতে হবে—"বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না- ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে" —এই উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বের শুরুটা একই আঙ্গিকের—শ্রীকান্তের বিবাহ। বারো-তের বছর পূর্বে গঙ্গাজলকে অভয় দিয়ে মৃত মাতার সহস্তে লেখা একটি পত্র মারফত সে জানতে পারে তার স্বর্গবাসিনী জননী গঙ্গাজল- দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন—অন্য পাত্র পাওয়া না গেলে শ্রীকান্ত তো রইল। রাজলক্ষ্মীর আর্থিক সহায়তায় শ্রীকান্ত পাঁচ শত টাকার বিনিময়ে গ্রামের একটি সুপাত্রের সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে বর্মা যাবার প্রস্তুতি নেয়।

যদি কোনদিন ফিরে আসে তবে সে রাজলক্ষ্মীর জন্যই আসবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোরঙ্গ বিছানা নিয়ে কলকাতার কয়লাঘাটে এসে উপস্থিত হয়। বহুক্লেশে ডাক্তারী ও অন্যান্য পরীক্ষা সম্পb করে জাহাজে জায়গা পায়। এখানে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী ও জাত বোষ্টমের মেয়ে টগর, বাঙালী মেয়ে অভয়া, রুগ্ন রোহিণী'র সাথে পরিচয় হয়। আরো পরিচয় হয় সামুদ্রিক প্রবল ঝড়ের সাথেও। রোহিণীকে সঙ্গে নিয়ে অভয়া রেঙ্গুনে যাচ্ছে বর্মা রেলওয়েতে কাজ করা স্বামীর খোঁজে। 'কোয়ারেন্টাইন' কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য হলেও অভয়ার অনুরোধে শ্রীকান্ত তাই বরণ করে। এখানে অভয়ার কর্ম- নিপুনতার সঙ্গে শ্রীকান্তের পরিচয় হয়। অভয়াকে নতুন ঘরকbার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেও একটা চাকরির উমেদারিতে লেগে যায়। অভয়ার স্বামীর খোঁজ চলছে এমন সময় শ্রীকান্তের অফিস ডেস্কে একটা কেস নিষ্পΈির হুকুম আসে—কেসটা অভয়ার স্বামীর। যা নিষ্পΈির দায়িত্ব শ্রীকান্তের উপর পড়ে। লোকটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি নীচ। শ্রীকান্তের মধ্যস্থতায় অভয়া স্বামীর কাছে যেতে পারলেও কয়েকদিনের মধ্যে অত্যাচারিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। আজন্ম সংস্কার ও সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রেমিক রোহিণীর সঙ্গে

নতুন করে ভালোবাসার ঘর বাধার সিদ্ধান্ত নেয়—"একটা রাত্রির বিবাহ- অনুষ্ঠান যা স্বামী- স্ত্রীর উভয়ের কাছেই স্বcের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সারা জীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব ?" (পর্ব- ২, পরিঃ১০, পৃ.১২৭)

শ্রীকান্ত দ্বিধান্বিত, তার অbদাদিদির দ্বারা এ কাজ কখনো সম্ভব হত না। কিন্তু অভয়া দৃঢ়, অবিচলিত—সে তাদের অনাগত সন্তানদের এই শিক্ষা দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছেঃ জন্মের হিসাব নয়, সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়। অভয়ার এই সিদ্ধান্ত শ্রীকান্তের আজন্ম সংস্কারে সাময়িক দ্বিধা- দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।
বর্মা প্রবাসী মনোহর চক্রবর্তী অসুস্থ ব্যক্তির পাড়া মাড়ায় না—সেই মনোহর চক্রবর্তী মৃত্যুশয্যায় পতিত হলে শ্রীকান্ত সেবা করতে গিয়ে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে নিরুপায় শ্রীকান্ত মহা পাপিষ্ঠা সমাজ পতিতা বিদ্রোহিণী অভয়ার নতুন পাতা সংসারে মারাত্মক অসুখের বিশ্রী বোঝাটা ঘৃণাভরে নামিয়ে দিতে তার দরজার কড়া নাড়ে। অভয়ার জবাব—"তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে ? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশি ?" (পর্ব- ২, পরিঃ১২, পৃ.১৩৫)

বন্ধুর বিয়ে সংবাদ পেয়ে শ্রীকান্ত এক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে রাজলক্ষ্মীকে নতুনরূপে আবিষ্কার করে। যে বন্ধুর জন্য তাকে চলে যেতে হয়েছিল সেই বন্ধু এমনকি চাকর- বাকরদের সামনেও দর্পভাবে আপনাকে প্রকাশ করার সৌন্দর্য শ্রীকান্তকে অভিভূত করে ফেলে। রাজলক্ষ্মীর সুখের জন্য শ্রীকান্ত সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করতে অপারগ জানালে গুরুদর্শনের উদ্দেশ্যে কাশীতে গিয়ে রাজলক্ষ্মী আবার পিয়ারীরূপে আবির্ভূত হয়—"তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ- গুণ। অনেকের উপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো, শ্রদ্ধা করতে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সইতেও পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।" (পর্ব- ২, পরিঃ১৫, পৃ.১৫৫)

কাশী থেকে অভিমানভরে শ্রীকান্ত গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত উপরন্তু মানিব্যাগ খোয়া গেলে অভিমান ভুলে আবারো রাজলক্ষ্মীর শরণাপb হয়। জবাবে মৃত রাজলক্ষ্মী চৌদ্দ বছর পর জন্মভূমিতে পদার্পণ

করে। হতবুদ্ধি শ্রীকান্ত স্বামী স্বীকৃতি দিয়ে ডাক্তারবাবু, প্রসb ঠাকুরদাকে প্রণাম করতে বলে। এখানেই দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি।

তৃতীয় পর্বের শুরুতে বীরভূম জেলার ছোট্ট গ্রাম 'গঙ্গামাটি'তে যাবার আয়োজন। কিন্তু শ্রীকান্ত দ্বিধান্বিত—"যদিচ জীবনটা আমার এতদিন নিরুপদ্রবে কাটে নাই, ইহার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুলচুক, অনেক দুঃখ দৈন্যই গিয়েছে, তবুও সে সব আমার অত্যন্ত পরিচিত। ...কিন্তু এই যে কোথায় কি- একটা নূতনত্বের মধ্যে নিশ্চিত চলিয়াছি, এই নিশ্চয়তাই আমাকে বিকল করিয়াছে।" (পর্ব- ৩, পরিঃ২, পৃ.১৬৯)

এই পর্বের শুরুতে বিধাতা চাইলে তাদের কাছাকাছি আসার একটা সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে বলে লেখক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। শ্রীকান্তর একসময় মনে হয়েছে নিজেকে সমর্পিত করে রাজলক্ষ্মীর সমস্ত ভলো-মন্দের সাথে তাকে গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর মনে এই বিশ্বাস নেই যে সেও তাকে অকপটে ভালোবেসে তার সংস্রবে স্থির হয়ে বসতে পারে।

পরক্ষণেই শ্রীকান্তের মন দোলাচলে অস্থির—"সহসা মনে হইল, ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকে আমার ভালবাসিতেই হইবেঃ কোথাও কোনদিন বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এতবড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে!Ó(পর্ব- ৩, পরিঃ০২, পৃ.১৬৯)

দ্বিতীয় পর্বের মত এখানেও সাধু- সb্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছে। গঙ্গামাটির পথে 'সাঁইথিয়া' স্টেশনে দেশের মানুষের সেবা করতে আসা কুড়ি- একুশ বছরের সুকুমার সুশ্রী চেহারার এক সb্যাসী বজ্রানন্দ ওরফে আনন্দর সঙ্গে এদের পরিচয় হয়।

গঙ্গামাটিতে ঘর দুই বারুজীবী এবং এক ঘর কর্মকার আর সমস্তই ডোম আর বাউরীদের বাস। বাউরীরা বেতের কাজ আর মজুরি করে এবং ডোমেরা চাঙ্গারী, কুলা, চুপড়ি প্রভৃতি তৈরী করে 'পোড়ামাটি' গ্রামে বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করে।

গোমস্তা কাশীনাথ কুশারীমশায়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তার বিদ্রোহী ভ্রাতৃজায়া সুনন্দার পরিচয় পায়। এই তরুণী নারী ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা রাখতে স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখ ভোগ করেছে। যেদিন থেকে শুনেছে তার ভাশুরের বিষয় এক বিধবার সম্পিË সে দিন থেকে সে সমস্তই ত্যাগ

করেছে। স্বামী- পুত্র নিয়ে না খেয়ে মরবে তবু এর কড়াক্রান্তি ছোবে না। অপরদিকে ছোটজাত নবীন- মালতীর পুনঃমিলনে রাজলক্ষ্মীকে দুই শত টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। তারপর মালতী অন্যত্র বিবাহ করেছে—"নবীন মোড়ল সম্প্রতি জেল খাটিতেছে এবং মালতী তাহার ভMপতির সেই বড় লোক ছোটভাইকে স্যাঙা করিয়া উভয়ে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতে গঙ্গামাটিতে কাল ফিরিয়া আসিয়াছে।" (পর্ব- ৩, পরিঃ০৯, পৃ.২০৮)

এমনিভাবে শ্রীকান্তের দিন কেটে যাচ্ছে আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, অথচ দুঃখ কষ্টের নালিশও নাই। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত। রাজলক্ষ্মীর অভিযোগ— 'তোমাকে পাবার জন্যে যা করেছি তার অর্ধেক করলেও বোধ হয় ভগবানকে এত দিনে পেতুম। কিন্তু তোমাকে পেলুম না।" (পরিঃ১০, পৃ.২১৫)

রাজলক্ষ্মী ধীরে ধীরে ধর্মকর্মের প্রতি ঝুকেছে। এক্ষেত্রে সুনন্দা তার গুরু। তীর্থস্থান বক্রেশ্বরে জাগ্রত দেবতা এবং গরম জলের কুণ্ড আছে তাতে অবগাহন- mvন করতে পারলে তিন কোটি জন্মের সবাই উদ্ধার পাবে—এই আশায় রাজলক্ষ্মী তীর্থযাত্রা করে—

> "রতনের মুখে অকস্মাৎ তাহার তীর্থযাত্রার সংবাদ পাইয়া অভিমান বা ক্রোধের পরিবর্তে বুকের মধ্যেটা আমার সহসা করুণা ও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। পিয়ারী সত্য সত্যই নিঃশেষ হইয়া মরিয়াছে এবং তাহারই কৃতকর্মের দুঃসহ ভারে আজ রাজলক্ষ্মীর সর্বদেহ মনে যে বেদনার অর্তনাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সংবরণ করিবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। ...আমি কি চিরদিন তাহার মুক্তি পথের দ্বার আগলাইয়া থাকিব ?" (পর্ব- ৩, পরিঃ১১, পৃ.২১৭)

রাজলক্ষ্মীর মুক্তিপথের দ্বার সে আর কোন আবর্তনেই আগলে রাখতে চায় না—না সম্পদে, না বিপদে। একদিন রাজলক্ষ্মীর নিরুদ্ধ অন্তরের অশ্রুগাঢ় ডাক তার কানে মঞ্জরিত হয়েছিল বলেই অদৃষ্টের নামে তাকে ফিরতে হয়েছিল, কিন্তু আজ তার বিদায়ের ক্ষণ আসb। তাই বর্মাতে তার সাবেক চাকুরী ফিরে পাবার আবেদন জানিয়েছে, এবং তা মঞ্জুর হয়েছে।

ইতোমধ্যে সতীশ ভরদ্বাজ নামে তার এক সহপাঠীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। সে অসুস্থ হলে তার সেবা করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে সফল হয় নি। ঘটনাচক্রে তার ফিরতে কয়েকদিন সময় লাগে। এই বিচ্ছেদে

রাজলক্ষ্মীর উপলব্ধি—"এখানে না এলে বোধহয় আমি কোন দিন বুঝতে পারতাম না, তোমাকে কতবড় দুর্গতির মধ্যে টেনে এনেছি এখানকার এই কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন তো তোমার আত্মহত্যার সমান।" (পর্ব- ৩, পরি:১৪, পৃ.২৩৮)
গঙ্গামাটি থেকে শ্রীকান্তর আড়ম্বরহীন বিদায়।

মাসখানেক পর বর্মা যাবার আগে রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নেবার উদ্দেশ্যে কাশীতে এসে তার পরিবর্তনে শ্রীকান্ত হত- বিহবল হয়ে পড়ে—"শুধু থানকাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলংকার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই মেঘের মত পিঠজোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশিও আর নাই। উপবাস ও কঠোর আত্মনিগ্রহের এমনি একটা রুক্ষ শীর্ণতা ...এই একটা মাসেই বয়সেও সে যেন আমাকে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।" (পর্ব- ৩, পরি:১৫, পৃ.২৪৭)

রাজলক্ষ্মীর জন্য শুভকামনা করে শ্রীকান্তের বিদায় নেবার দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি।

চতুর্থ পর্বের শুরুতেই আবারো শ্রীকান্তের বিয়ে সংক্রান্ত জটিলতা। স্টেশনেই দেশের বাড়ির ঠাকুরদা ও রাঙাদিদির সাথে আকস্মিক সাক্ষাৎ। সঙ্গে সতেরো- আঠারো বছর বয়সের মেয়ে পুটু, তার বড় শ্যালিকার নাতনী। প্রথম দেখায় শ্রীকান্তকে পাত্র হিসেবে নির্বাচন করলে রাজলক্ষ্মীর অনুমতি নিয়ে সে জানাবে বলে কথা দিয়ে গ্রাম ছাড়ে। স্টেশনে তার পাঠশালার বন্ধু মুসলমান যুবক কবি গহরের সাথে দেখা হয়। তার মাধ্যমেই শ্রীকান্ত মুরারীপুর আখড়া তথা কমললতার সন্ধান পায়। কমললতার বয়স ত্রিশের বেশী নয়। শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, চোখমুখের ভাবটা পরিচিত। এবং এর মুখের মত সুন্দর মুখ শ্রীকান্ত আর দেখেনি। তারই টানে শ্রীকান্ত আখড়ায় দিন দশেক কাটিয়ে দেয়। কমল তাকে পথে পথে বেড়িয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাবার প্রস্তাব করে। শ্রীকান্ত বোঝে বৈষ্ণবী যে কোন কারণেই হোক আখড়া থেকে পালাতে চাইছে।

কমললতার আসল নাম উষাঙ্গিনী, বাড়ি শ্রীহট্ট, বাবা কারবারী; কলকাতায় বিয়ে হওয়া কমললতা সতেরো বছর বয়সে বিধবা হয়। তাদের বাড়ির সরকার মন্মথের ঔরসে সে একুশ বছর বয়সে সন্তান- সম্ভবা হয়। মন্মথ

তার এক পিতৃহীন ভাইপোর কাঁধে এই দোষ চাপাতে চাইলে কলেজ পড়ুয়া যতীন আত্মহত্যা করে তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিË করে যায়।
কমললতার বাবা নবদ্বীপে নিয়ে আসে তাদের বৈষ্ণব ধর্মমতে বিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু মন্মথ হঠাৎ প্রথমে দশ হাজার পরে বিশ হাজার টাকা দাবী করে বসে—“দায়ী তো সে নয়, দায়ী তার ভাইপো যতীন। সুতরাং বিনা দোষে যদি তাকে জাত দিতেই হয় তো বিশ হাজারের কমে পারবো না। তা ছাড়া ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া এ কি কম কঠিন!Ó(পর্ব- ৪, পরিঃ০৭, পৃ.২৮৮)

এর দিন চারেক পর একটি মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হলে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে m¨ন করে পথে বেরিয়ে পড়ে।

কমললতা শ্রীকান্তকে ভালোবেসেছে তার নামের কারণে। একসময় শ্রীকান্ত বুঝতে পারে কমললতা আখড়া থেকে পালাতে চাইছে সেই ভুরুওয়ালা কদাকার লোকটার কণ্ঠিবদল করা স্বামীত্বের হাঙ্গামার ভয়ে নয়—এ গহর।

আখড়া থেকে দিন দশেক পর শ্রীকান্ত ফিরে এসে দেখে কলকাতায় রাজলক্ষ্মী নিজেই তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। এর আগে সে তাকে পত্র মারফত জানিয়েছিল পুটুকে বিবাহ করে তাকে অসম্মান করা চলবে না। ক্রুদ্ধ ঠাকুরদার পীড়াপীড়িতে আড়াই হাজার টাকার বিনিময়ে পুটুর অন্যত্র বিবাহ স্থির করতে বাধ্য হয়। পরে অবশ্য ব্যতিক্রমী এই বিয়ে যৌতুক ছাড়াই সম্পb হয়।

রাজলক্ষ্মী তার বিগত দিনের অবহেলার কথা স্বীকার করে শ্রীকান্তকে জানিয়েছে স্বর্গ তার চাই না; শ্রীকান্তকে ভালোবাসা, কাছে পাওয়া যদি পাপ হয় তবে পুণ্যে তার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম হয় তবে ধর্ম”Pাঁ সে চায় না—‘তুমি কেবল একাই ফিরে আসোনি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পূজার মন্ত্র। এসেছে আমার ইষ্টদেবতা, গুরুদেব— এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ।” (পরিঃ১০, পৃ.৩১৩)

শ্রীকান্তের মুখে কমললতার কথা শুনে রাজলক্ষ্মী কমললতাকে দেখতে তার সঙ্গে আশ্রমে আসে। ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর কীর্তনের আসর বসলে রাজলক্ষ্মী সঙ্গীত পরিবেশনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার সুরের ঝংকারে বিমোহিত আশ্রমবাসী।

শ্রীকান্তের অনুভব—"রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্নেহে, সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েছি, সংসারে তার তুলনা নেই।" (পরি– ১১, পৃ.৭৫)

কলকাতায় ফিরে রাজলক্ষ্মী কুশারীমশায়ের কাছ থেকে খবর পেয়ে গঙ্গামাটি গ্রামের পাশের গ্রাম 'পোড়ামাটি' কিনে সংস্কার করে সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ওখানে, আনন্দ তার দায়িত্ব নেয়।

এ সময় নবীনের পত্র আসে গহর মৃত্যুশয্যায়। সে কিছুদিন আগে 'সুনাম' গ্রামে গিয়েছিল তার বিধবা মামাতো বোনের বিপদে সাহায্য করতে। শ্রীকান্ত পৌঁছার দু'দিন পূর্বে গহরের মৃত্যু হয়। গহরের কবিতার খাতা এবং টাকা কোনটাই কমললতার সেবাতে লাগেনি।

কমললতা মৃত্যুশয্যায় গহরের সেবা করায় তাকে অশুচি আখ্যা দিয়ে ঠাকুর ঘরে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। শ্রীকান্ত আখড়া থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনে গেলে কমললতার দেখা পায়। সে টিকিটের জন্য অনুরোধ জানালে শ্রীকান্ত তাকে বৃন্দাবনের টিকেট কিনে দেয়। একই সাথে কিছুদূর যাবার বেলায় কমললতা তাকে ভগবানের পাদপদ্মে সপে দিয়ে নিশ্চিত নির্ভয় হতে বলে। শ্রীকান্ত 'সাঁইথিয়া' স্টেশনে নেমে গেলে ট্রেন তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে চলে যায়, এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে।

দুই

চার খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' শরৎ- সৃষ্ট অন্যান্য উপন্যাসের মতই কোথাও কোথাও আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতামণ্ডিত। জীবন ও সাহিত্যে আকস্মিকতা ভিbধর্মীঃ জীবনে আকস্মিক ঘটনা অনিবার্য হলেও সাহিত্যে স্বীকার্য নয়। এখানে কার্যকারণ শ•Lলার পরিণত প্রকাশ কাম্য। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এটি কোথাও কোথাও লি•Nত হয়েছে। ফলে দৈবের নিয়ন্ত্রণে শিল্পকর্মের ঐক্য- বিনষ্টি ঘটেছে।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বটির শুরুর দিকে অনেকগুলি চরিত্রের উপস্থিতি ও কিছু কিছু আকস্মিক ঘটনার সমন্বয়ে নানা রসের মধ্যে দিয়ে প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদ একটি পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী আখ্যানে রূপলাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে এমন রসাল ও মধুর শব্দযোজনার মাধ্যমে সুগ্রন্থিত লেখনী দুর্লভ। এটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস হলেও অনেক চরিত্রের আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। তেমনই একটি আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে শ্রীকান্তের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ। পূর্ব- পরিচয় না থাকা সেËও বাঙালি ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সময় শ্রীকান্তের অনিবার্য রক্ষাকর্তা সে—"ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ।" (পরিঃ০১, পৃ.২)

অন্যদিন, অকস্মাৎ বাড়ির মধ্যে ছিনাথের বহুরূপী ছদ্মবেশে বাঘের আবির্ভাবে মেজদার সেজ উল্টিয়ে বিকট শব্দের ফিট হওয়া এবং ছোড়দা যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ রৈ চিৎকারে বাড়িসুদ্ধ লোকের যখন প্রাণ বেরোনোর দশা ঠিক সেই সময়ে—"হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। ...ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।" (পরিঃ০১, পৃ.৬)

এখানেও সে- ই রক্ষাকর্তা। আকস্মিকভাবে সবর্ত্র তার উপস্থিতি এবং সমূহ বিপদ থেকে তার দ্বারা উদ্ধার এ যেন নিয়তি নির্দেশিত।

অথবা কলকাতার বাবু নতুনদাকে নেকড়ে টেনে নিয়ে ভোজন করছে এই আশঙ্কার সামনে দাঁড়িয়েও লগি হাতে তাদের মোকাবেলা করতে যেতে পিছপা হয়নি সে।

ভয় বলতে কোন জিনিস যে সংসারে আছে এ যেন তার অজানা। তার প্রতি শ্রীকান্তর বিস্ময়- মুগ্ধ দৃষ্টি—"ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি?" (পরিঃ০২, পৃ.১১)

তার মাছ চুরির অস্বাভাবিক দুঃসাহসিকতায় ভয়বিnŸলতা, পরমুহূর্তে মাছ বিক্রি করে পয়সা অর্জনের প্রক্রিয়ায় ঘৃণা, সেই পয়সায় অbদাদিদিকে সাহায্যের চেষ্টার মমতায় মুগ্ধ, শাহজীর ছদ্মাবরণ উন্মোচনে তার প্রতি ক্রুরতায় ভীত শ্রীকান্ত একই সাথে ইন্দ্রনাথের অনেক রূপ দেখেছে। এছাড়া তার অস্বাভাবিক শারীরিক শক্তির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্রনাথের পরিণতি সম্পর্কে লেখক বলছেন—"অকস্মাৎ একদিন যেন বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল।" (পরিঃ০২, পৃ.১১)

এছাড়া অকস্মিকভাবে সাপের ছোবলে শাহজীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অbদাদিদির অন্তর্ধানও ইন্দ্রনাথের অন্তর্ধানের মতই আকস্মিকতায় পর্যবসিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অস্থির সময়ের বাঙালি মানসের প্রতিনিধি শ্রীকান্ত কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন, ছbছাড়া, ভবঘুরে যুবক। শরৎ- সৃষ্ট অন্যান্য উপন্যাসের কর্মহীন নায়কদের থেকে শ্রীকান্ত ব্যতিক্রম নয়। প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদে কিশোর শ্রীকান্তের কৈশোর- লীলা চিত্রায়ণের পরপরই অঙ্কিত হয়েছে তার যৌবনের ছবি। যখন- তখন সbyাসীর দলে নাম লেখানো শ্রীকান্ত কুমারসাহেবের শিকার পার্টিতে যখন আকস্মিকভাবে রাজলক্ষ্মীর মুখোমুখি তখন তার বয়স সাতাশ কি আঠাশ বছর। পরিপূর্ণ যুবক হওয়া সত্ত্বেও যৌবনের উদ্দাম তার মধ্যে অনুপস্থিত। সে নিজেই নিজেকে ভবঘুরে এবং বুড়া বলছে। চারটি খণ্ডের প্রত্যেকটিতেই তার এই ছbছাড়া জীবনের হতাশা ব্যক্ত হয়েছে—

> ‘‘আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।’’ (প্রথম পর্ব)

> ‘‘এই ছbছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিbসূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে।’’ (দ্বিতীয় পর্ব)

> ‘‘কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের দিবারম্ভ হয় শ্রান্তিতে, অবসান হয় অবসb গ্লানিতে।’’ (তৃতীয় পর্ব)

> ‘‘এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মত।’’ (চতুথ পর্ব)

শ্রীকান্ত চরিত্রটি ঢিলেঢালা, অবসাদগ্রস্ত। বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব রচনাকালে লেখক- জীবনের শেষপাদের অবসাদগ্রস্ততা এতে নজরে পড়ে। এই পর্বগুলিতেই শ্রীকান্ত চরিত্রটি একেবারে নিষ্ক্রিয়, কর্মহীন। তবে পুরো উপন্যাসটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এই কর্মহীন লোকটির ‘জ্বর’ ।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে শ্রীকান্তের অসুস্থ হওয়া—বিশেষ করে নির্দিষ্ট বিরতিতে জ্বরে আক্রান্ত হওয়া চোখে পড়ার মত। কাহিনির মোড় পরিবর্তনে এই জ্বরের প্রভাব ব্যাপক। শরৎ- সৃষ্ট অন্যান্য কয়টি উপন্যাসে হঠাৎ বৃষ্টি এসে যে ধরনের পরিবর্তন সূচিত করেছে ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে সেই বৃষ্টির অভাব পূরণ করেছে শ্রীকান্তের আকস্মিক ও কার্যকারণহীন জ্বর। এক থেকে চার—প্রতিটি পর্বেই তার এই জ্বরের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তবে এসব জ্বরে তার লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি কখনো, তাকে সেবা করার লোকের অভাব হয়নি। লক্ষণীয়, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী আকার ধারণ করে মৃত্যু- মিছিলে গ্রাম- শহর উজাড় হয়ে গেছে, শ্রীকান্তও এসব জায়গায় অসুস্থ হয়েছে, জ্বরে পড়েছে কিন্তু তার সে জ্বর কখনো বসন্তও নয় বা প্লেগও নয়।

শ্রীকান্তের প্রথম জ্বর হয় প্রথম পর্বের চার সংখ্যক পরিচ্ছেদে ইন্দ্রনাথের সাথে নিশীথ এ্যাডভেঞ্চারের পর—‘‘মনে পড়ে সেই রাত্রেই জ্বরটা প্রবল হয়েছিল এবং সাত আট দিন পর্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।’’ (পৃ.২০)

এগার সংখ্যক পরিচ্ছেদে রামবাবুর বাড়িতে—"মারী এইবার প্রকৃতই মহামারী রূপে দেখা দিলেন। ...সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপটিপ করিতে লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইলাম, অপরাহ্ণবেলা বমি হইয়া গেল। রাত্রি নয়টা দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে।" (পৃ.৬৮- ৬৯)

পাটনায় রাজলক্ষ্মীর বাড়িতে—"সকালে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ- মুখ জ্বালা করিতেছে, মাথা এত ভারি যে, শয্যা ত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল।" (পরিঃ১২, পৃ.৭৬)

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে বর্মায় মনোহর চক্রবর্তীর শুশ্রূষা করতে গিয়ে নিজে জ্বরে পড়ে—"আমার ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে, এবং ব্যথা করিতেছে। ...সম্প্রতি জ্ঞান থাকিতে থাকিতে নিজের বিলি ব্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে।" (পর্ব- ০২ পরিঃ১১, পৃ.১৩৪)

পিয়ারীর বাইজী সËা চোখের সামনে উন্মোচিত হতে দেখে কাশী থেকে আপাত অভিমানে শ্রীকান্ত গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলে আবারো জ্বরে পড়ে। এবার ম্যালেরিয়া—"সন্ধ্যার পর হইতেই মাথাটা টিপটিপ করিতে লাগিল, তখন বিশেষ আশ্চর্য হইলাম না। ...সকালে ঘুম ভাঙ্গিল বেশ একটু জ্বর লইয়া।" (পর্ব- ২, পরিঃ১৫, পৃ.১৫৬)

'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে তের সংখ্যক পরিচ্ছেদে পথ হারিয়ে চরম দরিদ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে আশ্রয় নিলে আবারও জ্বরে পড়ে সে—"অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন মাথা তুলিবারও শক্তি ছিল না এমনি জ্বর।" (পর্ব- ৩, পরিঃ১৩, পৃ.২৩২)

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে মুরারিপুরে বৈষ্ণবীদের আখড়ায় নির্দোষ জ্বর আরো একবার পরিলক্ষিত হয়—"জ্বরটা ঠিক সকালেই গেল না বটে, কিন্তু দু- একদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম।" (পর্ব- ৪, পরিঃ১১, পৃ.৩২৭)

এই সব নানাবিধ জ্বর উপন্যাসটিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ছেলেবেলার সেই জ্বর কালক্ষেপণ ছাড়া অন্য প্রভাব বিস্তার না করলেও রামবাবুর বাড়িতে জ্বরের কল্যাণে শ্রীকান্ত 'আরা' স্টেশনে নীত হলে রাজলক্ষ্মীর সাথে তার দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। শ্রীকান্ত সb্যাসী

হয়ে 'প্রয়াগ' চলে গেলে কি হত বলা মুশকিল তবে তার জ্বরই তাকে শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মীমুখী করে কাহিনির ধারা রক্ষা করেছে একথা বলা যায়। এখান থেকেই রাজলক্ষ্মী- শ্রীকান্তের প্রকৃত প্রেমের কাহিনি শুরু। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, 'বিঠৌরা' গ্রামে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়ে শত শত লোক মরলেও শ্রীকান্তের যা হয়েছে "তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর।" প্রতিবারই তার যা হয়েছে তা বসন্ত নয় বা প্লেগ নয়, অন্য কিছু।

বর্মা বাসকালে অসুস্থ ব্যক্তির এলাকা না মাড়ানো মনোহর চক্রবর্তী নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রীকান্তের কাঁধেই তার সেবার ভার পড়ে। প্লেগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে অনেক লোক মরেছে—মনোহর চক্রবর্তীও মৃত্যুবরণ করেছে। শ্রীকান্ত তারই সেবা করতে গিয়ে নিজেও জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি এবারও তার যা হয়েছে—"খুব সম্ভব, সে আমার প্লেগ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল।" (পর্ব- ২, পরিঃ১২, পৃ.১৩৫)
এই জ্বরের সূত্র ধরে বিদ্রোহিণী সমাজত্যাগী নারী অভয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শ্রীকান্তকে সেবার মাধ্যমে তার সংসার প্রকৃত সংসার হবার সুযোগ লাভ করেছে এবং শ্রীকান্ত আবারো রাজলক্ষ্মীর সাি৮ধ্যে আসতে পেরেছে। ফলে কাহিনি সুদূর বর্মা থেকে ভারতবর্ষে আরো একবার তার শাখা প্রশাখা বিস্তারের সুযোগ লাভ করেছে।

কাশী থেকে অভিমানভরে শ্রীকান্ত দীর্ঘদিন পর গ্রামের বাড়িতে গেলে সেখানে তার কোন কাজ না থাকায় কাহিনির অগ্রগতির প্রয়োজনে সে আবারো জ্বরে পড়ে। নিজেরই বাড়ি থেকে তার মানিব্যাগ চুরি হয়ে যায়। টাকার প্রয়োজনে আবারো রাজলক্ষ্মীর শরণাপ৮ হয়। যে মৃত রাজলক্ষ্মী গ্রাম ছেড়েছে প্রায় দশক- দুই, সেই রাজলক্ষ্মী সমস্ত লজ্জা- শরম বিসর্জন দিয়ে শৈশব ভূমিতে এসে দাঁড়ানোর সাহস করেছে শ্রীকান্তের সেই বিখ্যাত জ্বরের কারণে। আবারও রাজলক্ষ্মীর সাথে পাটনা যাত্রা। সুস্থ হয়ে একেবারে গঙ্গামাটি—নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের মিলন আশা করা গেলেও বাহ্যত সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হয়। রাজলক্ষ্মী ধর্ম-কর্ম নিয়ে মেতে ওঠে। তার উদাসীনতায় বিস্মিত শ্রীকান্ত সতীশ ভরদ্বাজকে উদ্ধার করতে গিয়ে চক্রবর্তী মশায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এবং সেখানে হঠাৎ জ্বরে পড়ে। এজন্য দিন চারেক তাকে সেখানে অবস্থান করতে হয়। রাজলক্ষ্মীর সাথে মানসিক দূরত্ব বাড়ানোর জন্যই হয়ত এই জ্বরের প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থ পর্বে মুরারীপুর আখড়ায় শ্রীকান্তের জ্বর এবং রাজলক্ষ্মীর আহ্লাদীপনা পাঠকের মনে যুগলের রোমান্স জাগালেও এই জ্বরের কারণে রাজলক্ষ্মীর অতিরিক্ত উৎকণ্ঠায় তাদের ভেতরের কথাটা কমললতা-বড়গোঁসাইজীর গোচরে আসে। ফলে তাদের সম্পর্কের ধোঁয়াশা বা বিয়ে না হওয়ার ব্যাপারটায় সন্দেহ ঘনীভূত হয়। তাই ঠাকুরের মালা-চন্দন দিয়ে কণ্ঠীবদল করার অনুরোধ করে। রাজলক্ষ্মীর যে দ্বিধা সমগ্র উপন্যাসে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছিল তারই সমাধানের প্রস্তাব সে নিজেই নাকচ করেছে—"ওঁর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে ও আদেশ করো না। আমার ছেলেবেলার সে রাঙা মালা আজও চোখ বুজলে ওঁর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখতে পাই।" (পর্ব- ৪, পরি:১১, পৃ.৩২৭)

সমরেন্দ্রকুমার জানা মনে করেন,

> "রাজলক্ষ্মী সমাজ পরিত্যক্তা বাইজী বলে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর গভীর প্রণয় ও প্রণয়জাত দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও মিলনের নানা কাহিনীকে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে সন্নিবেশিত করলেও শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের প্রেমকে বিবাহের মধ্য দিয়ে সার্থক করে সামাজিক স্বীকৃতি দান করতে পারেন নি।" [৬৩]

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলছেন,

> "শ্রীকান্ত রুগ্ন বটে। কারণে অকারণে বারে বারে সে অসুস্থ হয়। আর পরিশ্রমজীবী সদাব্যস্ত রাজলক্ষ্মীকে কখনোই অসুস্থ হতে দেখি না, যদিও সে না খেয়েই থাকে অধিকাংশ সময়, mান করে যখন তখন। রুM হয়ে শ্রীকান্ত মহৎ হয় কেননা রাজলক্ষ্মীকে সে সুযোগ দেয় সেবার।" [৬৪]

---

[63] | mg‡i›'Kgvi Rvbv, AvawbK hM'wó‡Z kirmwn‡Z¨i mgm¨vejx, c_g cKvk: gvN 1388, Rvbqvix 1982, c.113

[64] | wmivRj Bmjvg †PŠaix, kirP›' I mvgšev', প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ.১০৭

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> "'শ্রীকান্ত' তে রাজলক্ষ্মীকে যদি শ্রীকান্তর বারবার অসুস্থতার সুযোগে সেবা করিবার, তথা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ না দিয়া শ্রীকান্তকে স্বাভাবিক সুস্থ রাখা হইত,—শরৎচন্দ্রের কাহিনীগুলির বিন্যাস বা পরিণতি সেক্ষেত্রে বর্তমানের মত যে প্রায় ক্ষেত্রেই হইত না তাহা বলা বাহুল্য।" [৬৫]

প্রেমের অকারণ আকস্মিকতা শ্রীকান্ত উপন্যাসে বিরল নয়। দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একটি রাজলক্ষ্মী- শ্রীকান্তের আকস্মিক সাক্ষাতে আকস্মিক প্রেমের প্রকাশ; অন্যটি শ্রীকান্ত- কমললতার প্রথম সাক্ষাতে দ্রুতগতির প্রণয় নিবেদন।

রাজপুত্র কুমারসাহেবের শিকার পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে কাশীতে কথিত ওলাওঠা রোগে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর আগে মৃত্যুবরণ করা বাল্যসখী রাজলক্ষ্মী ওরফে পিয়ারীর সাথে শ্রীকান্তের আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটে—

> "ঠিক চিনিতে পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছিল। ...কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি, কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিয়া, আমি ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম!" (পর্ব- ১, পরিঃ০৮, পৃ.৪৯)

শ্রীকান্ত' র রাজলক্ষ্মীকে কিছুতেই মনে পড়ছিল না এমনকি পাঁচ বছর বয়সের ঘটনা পযন্ত সে তb তb করে খুঁজে এই মেয়ের কোন অস্তিত্ব পায়নি অথচ তার পরেই হঠাৎ মনে পড়ে যায়। এটি উভয়ের জন্য যেমন আকস্মিক তেমনই অপ্রত্যাশিতও বটে। শুরুতে শ্রীকান্ত চিনতে না পারলেও রাজলক্ষ্মী তাকে ঠিকই চিনেছে। তাই শ্রীকান্তর মনে হয়েছে—"সে রাত্রে আমাকে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি এমন আর সে কখনও শুনায় নাই। মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।" (পর্ব- ১, পরিঃ০৮, পৃ.৪১)

দয়িতকে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে পাবার উচ্ছ্বাস হয়ত সে তার মন প্রাণ উজাড় করা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছে।

---

[65] | k¨vgm›`i e‡›`¨vcva¨vq, k i r-‡PZbv, c_g cKvk: Awkb 1374, c.598

চিনতে না পারায় শ্রীকান্ত যতটা না বিচলিত রাজলক্ষ্মীর আকস্মিক ভালোবাসার প্রকাশে সে আরও বেশি বিnÿল—"ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায় ?"
রাজলক্ষ্মীর এই প্রckর জবাবে শ্রীকান্ত বলেছে—"তোমাকে মনেই- বা কবে করেছিলাম যে, ভুলে যাবো না? বরং আজ চিনতে পেরেছি দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি।" অথচ ঘণ্টা তিন- চারেক পরেই শ্রীকান্তর অনুভূতি—"আমার- সমস্ত মনটা উন্মË উর্ধ্বশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।" আকস্মিকভাবে শ্রীকান্তের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে।

লেখক নিজেও এই ঘটনাকে আকস্মিক বলে উল্লেখ করেছেন—"কুমারসাহেবের সঙ্গে শিকারে যাওয়া—দৈবাৎ পিয়ারীর গান শুনিতে বসিয়া এমন কিছু একটা ভাগ্যে মিলিল যাহা যেমন আকস্মিক তেমনই অপরিসীম।" (পর্ব- ৪,পরিঃ১, পৃ.২৫১)

এই আকস্মিক ঘটনার উপর ভিË করেই উপন্যাসের পরবর্তী কাহিনি এগিয়েছে। প্রথম অংশের সাতটি পরিচ্ছেদের কোন উল্লেখ এই অংশ- পরবর্তী আর পাওয়া যায় না। রাজলক্ষ্মীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল শ্রীকান্ত তাকে কেন্দ্র করে উপগ্রহের মত চারপাশে ক্রমাগত ঘুরেছে এবং কাহিনি একেকটি বিচ্ছিb ঘটনার মধ্যে দিয়ে রাজলক্ষ্মীর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

প্রথম পর্বের মত চতুর্থ পর্বেও একই ঘটনার পুনরাবৃË দেখা যায় শ্রীকান্ত - কমললতা সম্পর্কে। কমললতাকে প্রথম দেখায় মনে হয়েছে চোখমুখের ভাবটা খুব পরিচিত, কোথায় যেন দেখেছি। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে শ্রীবৃন্দাবনধামের উদ্দেশ্যে সঙ্গী হবার আnÿান—"চলো না গোসাই, বেরিয়ে পড়া যাক।" একদিন পার না হতেই কমললতার প্রণয় নিবেদন—"সবে কাল সন্ধ্যায় তো তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না।" পাঠকের সাথে সাথে শ্রীকান্তও বিস্মিত—"এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয় নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্বে কখনো পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই।" (পর্ব- ৪, পরিঃ৭, পৃ.২৮৪)
এই দু'জনের আকস্মিক প্রণয় নিবেদনের মধ্যে কমললতারটি শ্রীকান্তের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও রাজলক্ষ্মীর প্রণয় নিবেদনের উপর ভিË করেই উপন্যাসের বিস্তার।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> ‘‘শরৎ উপন্যাসের একটি প্রধান উপাদান ভাবাবেগের আতিশয্য, অbদাদিদি ও ইন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তা দেখেছি। অপর প্রধান উপাদান আকস্মিকতা—রাজলক্ষ্মী ও কমললতার ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায়। যে রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্তই সম্পূর্ণ ভুলেছে, কুমারসাহেবের শিকার- পার্টিতে যার সcmহ তিরষ্কারেও তাকে মনে পড়ে না, আকস্মিকভাবেই তাকে মনে পড়ে যায়। রেগে গেলেই দাঁত দিয়ে অধর চেপে ধরে,—এই অভ্যাসটা কার তা কিছুতেই শ্রীকান্তের মনে পড়ছিল না, কাশীতে তার মরণের কথা রটানো হয়েছিল, এ সংবাদ শোনামাত্রই তার মনে পড়ে যায়, এ সেই রাজলক্ষ্মী (পর্ব- ১, অধ্যায়- ৮)। ঊনিশ- কুড়ি বছর পরে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং শ্রীকান্তের জন্যে গভীর উৎকণ্ঠার ছদ্মবেশে ভালবাসার প্রকাশও আকস্মিক—‘আমাকে চিনতে পার না, আমার মুখের ’পরে বলে তুমি পৌরুষী করে গেলে, কিন্তু আমার মেয়ে মানুষের মন তো! বিপদের সময় আমি তো আর বলতে পারবো না- এঁকে চিনিনে।’ ...দশ দিনের আশ্রমবাসে ভালবাসার প্রকাশ যে আকস্মিকতা- চিহ্নিত তা অবশ্যস্বীকার্য।’’
>
> ‘‘প্রথম দেখাতেই সবিস্ময় পরিচিতি, দুটি বাক্যেই বর্ণনার আতিশয্য ‘ভয়ানক আশ্চর্য’, ‘সবিস্ময়ে মনে হইল।’ তারপরই (অধ্যায় ৬) শ্রীকান্তের মুগ্ধতা। আকস্মিক বিস্ময় থেকে অপ্রত্যাশিত মুগ্ধতায় পৌঁছতে শ্রীকান্তের সময় লেগেছে দু- তিন ঘণ্টা। উভয়ের ঘনিষ্ঠতায় দ্রুতগতি, কমললতার ভালবাসা- প্রকাশে দ্রুতগতি। সবটাই আকস্মিকতা- মণ্ডিত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কমললতার প্রণয়- নিবেদন(অধ্যায় ৭) এতই দ্রুতগতি ও আকস্মিক...।’’ [৬৬]

রাজলক্ষ্মী চরিত্রের যে মাধুর্য ও সৌকর্য তা তার যাপিত জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সে পতিতা হলেও শুদ্ধান্তঃকরণশালিনী। সে বাইজী জীবনের আড়ালে তার সম্ভ্রম বা শ্রীকান্তের প্রতি এমন প্রেম কি মন্ত্রবলে রক্ষা করে এসেছে তার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। আবার রাজলক্ষ্মীর ভাষ্যমতে, বামুনঠাকুরের সঙ্গে তাদের বিয়েটা সম্পূর্ণ হতে পারেনি এজন্য গাঁয়ের লোক আধকপালী বলে ডাকত। অথচ সে সারাজীবন বৈধব্যের আচার- আচরণ পালন করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

---

[66] | Ai“YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›‘: cbwePvi, c‡ev³, c.37-38

ক্ষেত্র গুপ্তের মতে,

> ‘‘রাজলক্ষ্মী তার বিবাহিত জীবনের দুর্দৈব, তার বাইজী জীবনের বৈচিত্র্য, দীর্ঘকালীন অদর্শন এবং আর কোনকালে দেখা না হওয়ার ষোলআনা সম্ভাবনার মধ্যেও কিভাবে তার প্রণয়ের দীপটি মনে জ্বালিয়ে রেখেছিল তা ভেবে শ্রীকান্ত অবাক হয়েছিল। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরিচয় জানার পরে শ্রীকান্ত কিভাবে এত দ্রুত, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শায়কবিদ্ধ পাখির মত লুটিয়ে পড়ল।’’ [৬৭]

অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> ‘সেই যে ছোটবেলায় যে ম্যলেরিয়াজীর্ণ মেয়েটি লোভী ও নির্মম শ্রীকান্তকে ভালোবেসেছিল, সেই ভালোবাসা বাইজী জীবনের শতপ্রকার কলুষিত কামনা ও বিলাস সম্ভোগের মধ্যেও কিভাবে বেঁচেছিল তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।’’ [৬৮]

পথে-ঘাটে আকস্মিকভাবে বিশেষ ব্যক্তির দেখা পেয়ে যাওয়া শরৎ-সাহিত্যের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কাশীর ফেরত-ট্রেনের মধ্যে বসে শ্রীকান্ত ভাবছে আমি কারো অধীন নই আবার নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নেই। এমনি সময় অকস্মাৎ ঠাকুরদা ও রাঙ্গাদিদির সঙ্গে প্লাটফর্মে দেখা। সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে, নাম পুটু। পাত্র খুঁজছে। আইবুড়ো শ্রীকান্ত যে মনোনীত হবে এতে আর আশ্চর্য কি? এখানে আর জ্বর নয় রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের মানসিক দূরত্ব ঘুচাতে আকস্মিক সাক্ষাতের মাধ্যমে শ্রীকান্তের বিয়েকেই আর একবার সামনে আনা হয়েছে। এটি একই ঘটনার পুনরাবৃÍ।

বর্মা যাবার আগে গঙ্গাজল-দুহিতার সঙ্গেও এমনি বিয়ের কথা চলছিল। উভয় ক্ষেত্রেই রাজলক্ষ্মী বাধ সেধেছে তবে পার্থক্য এখানে যে, সেই সময় বিয়েতে তার অ-মত ছিল না—কিন্তু পাত্রী পছন্দ হয়নি, আর এবার বিয়েতেই অমত। সেটা ছিল দ্বিতীয় পর্বের শুরু আর এটা চতুর্থ পর্বের শুরুতে। ভঙ্গী এক, প্রসঙ্গ এক, পরিণতি এক। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থের বিনিময়ে অন্যত্র বিবাহ স্থির হয়েছে। শ্রীকান্তকে কাশী থেকে অবহেলায়

---

[67] | †¶Î ¸ß, Jcb¨vwmK kirP›‘ P‡Ævcva¨vq, c_g evsjv‡‘k ms¯‹iY:2011, c.104
[68] | W. AwRZKgvi †Nvl, Rxebwkíx kirP›‘, c_g cKvk: †de“qvix 1984, c.61

বিদায় দেওয়ার যে মর্মান্তিক আত্মগ্লানি রাজলক্ষ্মী অনুভব করেছে চতুর্থ পর্বের সবটা জুড়ে তা সংশোধনের চেষ্টা করেছে।

আবার স্টেশনে নেমেই হঠাৎ গহরের সাথে দেখা—"স্টেশনে পদার্পণ মাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল; পরেরটা আসিতে ঘণ্টা দুই দেরি। সময় কাটাইবার পন্থা খুঁজিতেছি,—বন্ধু জুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি মুহূর্তকয়েক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্রীকান্ত না?" (পর্ব- ৪, পরি:০২, পৃ.২৫৩)

গহর তার পাঠশালার বন্ধু—বছর পাঁচেকের বড়, কবি এবং কিছুটা পাগলাটে ধরনের। সংসারে তার কেউ নেই অগাধ সম্পদ ছাড়া। পথে দেখা হলে সে শ্রীকান্তকে জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। সেই সূত্রে কমললতার সাথে দেখা এবং কাহিনি ভিb খাতে প্রবাহিত। গহরের সাথে পথে আকস্মিকভাবে দেখা না হলে কাহিনি কোন দিকে মোড় নিত বলা মুশকিল। তবে রাজলক্ষ্মীর সাথে শ্রীকান্তের সম্পর্কের রোমান্টিকতা এই পর্বে বেশী পরিস্ফুট। এক্ষেত্রে হয়ত কমললতার চরিত্রটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। তবে উপন্যাসে কমললতার আকস্মিক আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলছেন,

> "কমললতা এই উপন্যাসে খানিকটা খাপছাড়াভাবে প্রবেশ করিয়াছে।—সে বিধবা, ব্রহ্মচর্য তাহার ধর্ম, কিন্তু কূলপ্লাবী প্রেমের স্রোতে তাহার ব্রহ্মচর্য-ব্রত ভাসিয়া গিয়াছে। আবার ইহার পরে তাহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা অপ্রত্যাশিত ও হৃদয়বিদারক।" [৬৯]

অন্য এক জায়গায় তিনি আরও বলছেন,

> "নায়িকা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কমললতার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু সেই সাক্ষাৎ ও সংস্পর্শ একটু আলগা ধরনের এবং এই গ্রন্থের চারটি পর্বের গঠন বিচার করিলে ইহা ত্রুটি বলিয়াও মনে হইতে পারে।" [৭০]

এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় আকস্মিক ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীকান্তের বর্মা বাসকালে। আট বছর পূর্বে বর্মা চাকরি করতে আসা স্বামীর খোঁজে অভয়া রোহিণীকে সাথে নিয়ে জাহাজে চড়ে। তথ্য শুধু এটুকুই স্বামী বর্মা রেলওয়েতে কাজ করে। বর্মা পৌঁছে রেল কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ

---

[69] | m‡evaP›‘ †mb¸ß, kirP‡›‘i Rxeb I mwnZ¨, c_g cKvk: kveY 1385, c.123
[70] | H, c.114

করা হলে তারা জানায় দুই বছর পূর্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এরকম একটা লোককে বর্মামুলুক থেকে খুঁজে বের করা একরকম অসম্ভবই ছিল। কিন্তু লেখক খুব সহজে কাজটি করেছেন। শ্রীকান্তের অফিসে—

> "কেরানী টেবিলের উপর একটা ফাইল রাখিয়া গেল—উপরে নীল পেন্সিলে বড় সাহেবের মন্তব্য। তিনি কেসটা আমাকে নিজেই নিষ্পÈ করিতে হুকুম দিয়াছেন। ...আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরানীকে সেখানকার সাহেব ম্যানেজার কাঠ চুরির অভিযোগে সাসপেন্ড করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরানীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী।" (পর্ব- ২, পরিঃ০৮, পৃ.১১৪)

জাহাজভর্তি লোকের মধ্যে শ্রীকান্তের কাছেই রোহিণীর অসুস্থতায় সাহায্যের জন্য অভয়ার আবেদন, বর্মাতে শ্রীকান্তের অফিসে তারই টেবিলে অভয়ার স্বামীর ফাইল পাঠানো, কেস নিষ্পÈর জন্য শ্রীকান্তকেই বড় সাহেবের হুকুম, অফিসের বস হওয়ার সুবাদে চাকুরী ফেরতের আশ্বাসে খুব সহজে অভয়াকে তার স্বামীর কাছে প্রেরণ—এই সব আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে কাহিনির সরলীকরণ করে মেলানোর কাজটি আপাত- সহজ হয়ে গেলেও শিল্পের দিক থেকে রচনাটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

এই উপন্যাসে কোথাও কোথাও অসঙ্গতির চিত্র বর্তমান।

গঙ্গাজল- দুহিতার বয়স তের বছর গ্রন্থে উল্লেখ আছে—"বছর বার- তের পূর্বে গঙ্গাজলের অনেক বয়সে একটি কন্যারZ জন্ম গ্রহণ করে।"
রাজলক্ষ্মী গ্রাম ছেড়েছে কমপক্ষে চৌদ্দ বছর, গঙ্গাজল কন্যার জন্মেরও আগে। যাকে সে কখনো চোখে দেখেনি তাকে চেনা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ সে বলছে—"এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভালো নয়, তাকে আমি ছেলেবেলা দেখেচি।" (পর্ব- ২, পরিঃ১, পৃ.৮৬)

বাল্যকালে নয় বছর পাঠশালায়, বনে- বাদাড়ে একসাথে কাটালেও শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে প্রথম দেখায় চিনতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করেছে, "আচ্ছা কে তুমি ? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেচি বলেও তো মনে হয় না।" (পর্ব- ১, পরিঃ০৮) শিকার পার্টিতে পাঁচ- ছয়দিন একসাথে কাটানোর পরও তার

মনে হয়েছে একে কখনো চোখেও দেখি নাই। অথচ শ্রীকান্তর অসুস্থতায় প্রায় দুই দশক পর রাজলক্ষ্মী গ্রামে গেলে বৃদ্ধ ঠাকুরদা তাকে দেখেই বলেছে, "মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে।" (পর্ব- ২, পরি:১৫, পৃ.১৫৯)

আকস্মিকভাবে শ্রীকান্তর অস্বাভাবিক অর্থ সমাগম ঘটে। বর্মা থাকাকলে ঘোড়দৌড় খেলায় সবর্স্ব হারানো এক বড়দরের সাহেবকে হাজার দুই টাকা ধার দিয়েছিল সে। টাকা চেয়ে পাঠালে কর্জের চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি—প্রায় আট হাজার টাকা। এ যেন আকস্মিকভাবে দৈবের নির্দেশে অর্থ- প্রাপ্তি ঘটা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলছেন,

> "শ্রীকান্তকে দেখছি অনুপার্জিত অর্থ পেয়ে যাচ্ছে একেবারে আকস্মিকভাবে। বর্মার এক জুয়া০ সাহেবকে টাকা ধার দিয়েছিল, বিনিময়ে পেয়ে গেল আসলের চারগুণ। এই সমস্ত পাওয়া শরৎচন্দ্র পছন্দ করেন; এবং এভাবে পাওয়ার মধ্যে যে আকস্মিকতা ও দৈবনির্ভরতা থাকে সেও শ্রীকান্তীয় ভুবনের একটা সাধারণ নিয়ম, কেননা জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহটা সেখানে নেই—যে প্রবাহটির চরিত্র অবশ্যই সামাজিক। স্মরণীয় যে, শ্রীকান্ত হারিয়ে- যাওয়া রাজলক্ষ্মীকে পেয়েছে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তার সাক্ষাতও ঐ রকমেই ঘটে।" [৭১]

সুনন্দাকে অভয়ার মতই বিদ্রোহিণী করে সৃষ্টি করা হয়েছে তবে অভয়ার বিদ্রোহ সমাজের বিরুদ্ধে আর সুনন্দার ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভয়া চরিত্রটি সুঅঙ্কিত হলেও সুনন্দা চরিত্রটিতে অস্বাভাবিকতা রয়েছে। সুনন্দা চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে লেখকের নিজের মনেই সন্দেহ রয়েছে। ঊনিশ- কুড়ি বছরের সুনন্দা সম্পর্কে তিনি নিজেই কৈফিয়ত দিচ্ছেন—

> "অনেকেই মনে করিবেন ইহা অ™ত, হয়ত অনেকেই মাথা নাড়িয়া কহিবেন, এ- সকল কেবল গল্পেই চলে। তাঁহারা অনেকেই বলিবেন, আমরাও বাঙ্গালী, বাঙ্গলাদেশেরই মানুষ, কিন্তু সধারণ গৃহস্থঘরে এমন হয় তাহা তো কখনো দেখি নাই! তা বটে। কিন্তু প্রত্যুËরে শুধু ইহাই বলিতে পারি, আমিও এদেশেরই

[71] | wmivRj Bmjvg †PŠaix, kirP›' I mvgšev', c‡ev³, পৃ.৭৩

> মানুষ এবং একটির অধিক সুনন্দা এ দেশে আমারও চোখে পড়ে নাই। তত্রাচ ইহা সত্য।" (পর্ব- ৩, পরি:০৮, পৃ.২০০)

লেখক সত্য বললে পাঠকের বিশ্বাস না করে উপায় নেই। তবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য যে ধরনের যুক্তি উপস্থাপন বা কার্যকারণশৃ•Lলা প্রয়োজন তা উপন্যাসে অনুপস্থিত।

অbদাদিদির চরিত্রটিকে শ্রীকান্তের জবানীতে মহিমান্বিত করে গড়ে তুললেও এই চরিত্রটিতে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। লৌকিক চরিত্র হবার জন্য তার মধ্যে যে ক্রোধ, ক্ষোভ, ঈর্ষা অবশ্যম্ভাবী তা অbদা চরিত্রে অনুপস্থিত। আবার স্বামীর প্রতি এত অনুরক্তির পর তার মিথ্যাচার ও জুয়াচুরির কাহিনি প্রকাশ করা অbদার চারিত্র্য- বৈপরীত্য নির্দেশ করে।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের মতে,

> "অbদাদিদির চরিত্র আদর্শস্থানীয় হলেও তাকে রক্তমাংসের মানবীর পরিবর্তে অতিমানবীয় বলেই মনে হয়। মানবীয় চরিত্রে এই জাতীয় আদর্শ ও সহনশীলতা সাধারণত দেখা যায় না।" [৭২]

উপন্যাসের কোথাও কোথাও আপাতবিচ্ছিb খণ্ড কাহিনি যোজনা মূল প্রসঙ্গটিকে অকারণ বিলম্বিত করেছে। যেমন কাশী ফেরত এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর মড়া সৎকার প্রসঙ্গ, শ্মশানযাত্রার প্রাক্কালে নিরুদিদির অসহনীয় যন্ত্রণার ভৌতিক চিত্র, শ্মশানযাত্রার পরের দিন আবার একই জায়গায় উপস্থিতির বর্ণনা, সb¨াসী হবার পর প্রয়াগ যাত্রার প্রাক্কালে গৌরী তেওয়ারীর দুই অসহায় কন্যার অমানবিক যন্ত্রণার চিত্র প্রসঙ্গ, বর্মী মেয়ের প্রতারণার ফাঁদে পড়ার গল্প, সতীশ ভরদ্বাজ, বৃদ্ধ চক্রবর্তীর কাহিনি, দরিদ্র ঠাকুরমশায় এবং তার স্ত্রীর আতিথেয়তার কাহিনি, যশোদার কুকুর প্রসঙ্গের অবতারণা ইত্যাদি।

---

[72] | D¾jKgvi gRg‘vi m¤úvw‘Z, kirP›‘:†‘k Kvj mvwnZ¨, c_g cKvk: Gwcj 2000, c.15

k¦শানযাত্রার পরের দিন শ্রীকান্ত আবারও শ্মশানে গিয়ে হাজির। কাহিনির প্রয়োজন যাকে বলে তা হয়ত এখানে ছিল না কিন্তু প্রকৃতির অপরূপ রূপের বর্ণনা এবং মৃত্যু সম্পর্কিত একটি মূল্যবান দর্শনের বর্ণনাই হয়ত এই পরিচ্ছেদ রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে—

> "অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে তো কোনদিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দু- চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।" (পর্ব- ১, পরি:১০, পৃ.৬০)

পরিশেষে বলা যায়, মননশীল এই লেখক আবেগ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা বৈচিত্র্যময় মানব জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রের সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেমের বিচিত্র কাহিনির শিল্পিত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। চার খণ্ডের বৃহৎ এই উপন্যাস মনোমুগ্ধকর এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে কিছু কিছু অংশে আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা এসেছে এবং তার দ্বারা কাহিনি প্রভাবিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গৃহদাহ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গৃহদাহ' উপন্যাসটি গতানুগতিক ধারা থেকে ব্যতিক্রমধর্মী একটি রচনা। এটি ১৩২৩ থেকে ১৩২৬ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন বছর ধরে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ১৩২৬ এর ফাল্গুনে(১৯২০ খ্রিস্টাব্দ) পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তিনি রেঙ্গুনে থাকা অবস্থায় গৃহদাহ উপন্যাসটি রচনা শুরু করেন এবং শেষ করেন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার বাজেশিবপুরে বসবাসকালে। এই উপন্যাসটিকে তিনি তার শ্রেষ্ঠ লেখা মনে করতেন। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও তাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৭৩] সমালোচকদের মতও অনুরূপ।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯২– ১৯৭০) বলেন, "গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম।" [৭৪]

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে, "গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।" [৭৫]

অজিতকুমার ঘোষের মতে, "গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা সুসংবদ্ধ ও শিল্পসার্থক উপন্যাস।" [৭৬]

শহরের পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত ত্রিভুজ প্রেমের এই উপন্যাসটিতে দেশি ও বিদেশি কয়েকটি উপন্যাসের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। তবে যে সব ঔপন্যাসিক ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন তাদের মধ্যে টমাস হার্ডি(১৮৪০– ১৯২৮), তলস্তয়(১৮২৮– ১৯১০), এইচ. জি. ওয়েলস(১৮৬৬– ১৯৪৬), জন গলসওয়ার্দি(১৮৬৭– ১৯৩৩) প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের লেখা তিনি পড়েছিলেন কিনা এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'(১৯০৩), 'ঘরে– বাইরে'(১৯১৬) উপন্যাস দুটি যে একাধিকবার পাঠ করেছিলেন এতে সন্দেহ নেই। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি উপন্যাসই তিনি মনোযোগ সহকারে

---

[73] | m‡i›'bv_ M‡½vcva¨vq, kir cwiPq, Iwi‡qÈ eK †Kv¤úvwb, Kwj KvZv-12, g'Y mvj bvB|

[74] | kxKgvi e‡›'¨vcva¨vq, e½ mwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, cbg'Y: 2010-2011, c.142

[75] | m‡evaP›' †mb¸ß, kirP›', mß'k ms¯‹iY:AMnvqY 1407, c.155

[76] | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›'i Rxebx I mwnZ¨wePvi, ZZxq ms¯‹iY: AMnvqY 1414, wW‡m¤i 2007, c.209

পড়েছিলেন। গৃহদাহ প্রকাশের মাত্র চার বছর আগে ১৩২২ সালে ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এটি দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে সুকুমার সেনের ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে উল্লেখ, ‘গোরা’ পড়েই তিনি লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন।[৭৭]

নর-নারীর সম্পর্ক এবং চরিত্রের মনোজগত বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনার চেয়ে গৃহদাহ অনেক বেশি পরিণত। মন¯Ë নির্ভর উপন্যাসটির কাহিনি অচলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। প্রধান দুই পুরুষ চরিত্র মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ভালোবাসা ও ভালোলাগাকে কেন্দ্র করে কাহিনি ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে একটা বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্য দিয়ে তার জীবনের যথার্থ ট্র্যাজেডি সূচিত করেছে। তার করুণ পরিণতির জন্য দ্বিধান্বিতা অচলা নিজে যেমন দায়ী, বৃËিতাড়িত সুরেশ এবং কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠ মহিমও তেমনি সে দায় এড়াতে পারে না। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, ‘অচলা ঘটনা-তাড়িত, আকস্মিকতা-লাঞ্ছিত।’[৭৮]

মহিম ও সুরেশ পরম বন্ধু। মহিম দরিদ্র এবং সংযমী; সুরেশ ধনী, প্রবৃËিতাড়িত এবং ব্রাহ্মবিরোধী। মহিমের ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করার সম্ভাবনা এবং ব্রাহ্মধর্মের ঘোর-বিরোধী সুরেশের সেখানে বাধা প্রদানের মধ্য দিয়ে গৃহদাহ উপন্যাসের মূল কাহিনির সূত্রপাত।

ব্রাহ্ম-বিরোধী, নাস্তিক সুরেশ হিন্দু সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল—সে চায় না, তার সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু মহিম, যাকে সে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে, সে ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করে ব্রাহ্মদের দল পুষ্ট করুক। তাই সে মহিমকে একমাস অচলার সাথে দেখা করতে নিষেধ করে। কিন্তু সপ্তাহখানেক মহিমের দেখা না পেয়ে, মহিম অচলার ওখানে গেছে ভেবে, সে উপযাচক হয়ে কেদারবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। তার উদ্দেশ্য মহিমকে ব্রাহ্ম মেয়ের মোহ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা। কিন্তু ঘটনা

77| mKgvi †mb, ev½vjv mwn‡Z¨i BwZnvm(cÂg LÊ), Iô g‘Y: †m‡Þ¤i 2010, c.226

78| Ai“YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›`ª: cbwePvi, c_g †`ÔR ms¯‹iY: Kwj KvZv c¯K ‡gjv, Rvbqvix 2001, gvN 1407, c.79|

ঘটে অপ্রত্যাশিত। একটি সতেরো-আঠারো বছরের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের, ছিপছিপে পাতলা, অতিশয় সুশ্রী, সুকুমার ও বুদ্ধিদীপ্ত মেয়েকে দেখেই—"সুরেশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া চক্ষের পলকে মুগ্ধ হইয়া গেল।" (পরিঃ৩, পৃ.২৩৭) তার এই মুগ্ধতাবোধেই গৃহদাহ উপন্যাসের সর্বনাশের বীজ নিহিত। সুরেশ যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তাতে সফলকাম হতে পারেনি। কারণ মহিম সম্পর্কে সে যেসব তথ্য অচলাকে দেয় তার চেয়ে বরঞ্চ বেশিই অচলার পূর্ব থেকেই জানা ছিল। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই মহিম সম্পর্কে দোষারোপকে কৃত-অপরাধ বিবেচনা করে ক্ষমা চাইতে গেলে অচলার হাতের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়। নেশাগ্রস্তের মত টলতে টলতে সে বাড়িতে গেলে মহিমকে সেখানে উপস্থিত দেখে অবাক হয়। মহিমকে অনুরোধ করে বলে অচলার সাথে সাক্ষাতে তার পক্ষ থেকে আর কোন বাধা নেই। কিন্তু মহিম সাক্ষাৎ না করেই জরুরি প্রয়োজনে বাড়ি চলে যায়। একথা জানাতে সুরেশ পরদিন অচলার কাছে আসে। এরপর পর পর আসা যাওয়া চলতে থাকে।

যে ব্রাহ্মদের সে ঘৃণা করত সেই ব্রাহ্মদের বাড়িতে পরিচয়ের চতুর্থ দিনে রাbাকরা খাবার খায়, অচলাকে উন্মত্ত অবস্থায় আলিঙ্গন করে, কেদারবাবুর তিন-চার হাজার টাকার ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এরপর দিন দশ-বারো কেটে যায়। এরই মধ্যে অচলার সাথে সুরেশের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। মহিমের পরিবর্তে তার ধনী বন্ধু সুরেশকে কেদারবাবু জামাতারূপে মনোনীত করেন।

একদিন বায়স্কোপ দেখে ফেরার পথে কেদারবাবু গাড়ি থেকে নেমে সমাজে গেলে এক আবেগঘন পরিবেশে সুরেশের চোখে জল দেখে অচলা—"তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে তো তোমার হাতেই দিয়েছেন।" (পরিঃ৯, পৃ.২৫৭) ঠিক এমনি সময়ে গাড়ি বাড়ির সম্মুখে আসলে সুরেশ সযত্নে সাবধানে অচলার হাত ধরে নীচে নামিয়ে উভয়ে একসঙ্গে তাকিয়ে দেখে—'ঠিক সম্মুখে মহিম দাঁড়াইয়া' (পরিঃ৯, পৃ.২৫৭) এবং সেই নিমিষের দৃষ্টিপাতেই এই দুটি নর-নারী একেবারে যেন পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মহিম নিজেও কম বিস্মিত হয়নি সুরেশের ব্রাহ্ম পরিবারের সাথে এত কম সময়ে এত ঘনিষ্ঠ

হতে দেখে। তারপরও দুর্ভেদ্য আত্মদুর্গে বসবাসকারী মহিমের মনের ভার লাঘব হয় যখন অচলা বলে—"তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্যে রেখে গেলে?" (পরিঃ১০, পৃ.২৬০) এই বলে সে তার হাতের আংটি মহিমকে পরিয়ে দিয়ে বলে—"আমি আর ভাবতে পারিনে। এইবার যা করবার তুমি করো।" (পরিঃ১০, পৃ.২৬০)

এতগুলো বিরুদ্ধ ও প্রচণ্ড শক্তি প্রতিহত করে অচলা তার কাছে ফিরে আসবে এই বিশ্বাস মহিমের না থাকলেও শেষপর্যন্ত অচলা মহিমকেই বিয়ে করার সঙ্কল্পে অটল থাকে। ফলে সুরেশ প্রবঞ্চনাকারী অপবাদে কেদারবাবু ও অচলাকে—'বাপ- মেয়েতে ষড়যন্ত্র করে শিকার ধরার ব্যবসা করছে'—এইসব বলে প্রচণ্ড অপমান করে প্লেগ রোগাক্রান্ত বন্ধু নিশীথের চিকিৎসায় সাহায্যার্থে 'ফয়জাবাদ' চলে যায়। এর মাসখানেক পর মহিমের সাথে অচলার বিয়ে ঠিক হয়।

আগামী পরশু অচলার বিয়ে—মহিমের চিঠি পেয়ে এই সময়েই পরোপকারী সুরেশ আগুনে পোড়া ক্ষত নিয়ে কেদারবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হলে ক্ষত দেখে অচলার চোখ দিয়ে অশ্রু মুক্তার আকারে একটির পর একটি ঝরে পড়তে থাকে। অত অপমানের পর সুরেশকে অচলা কি করে ক্ষমা করল জানতে চাইলে অচলা জানায় সে একটি দিনের জন্যও রাগ করেনি। সুরেশের আমন্ত্রণে কেদারবাবু ও অচলা তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে সুরেশের ঐশ্বর্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিবাহ পূর্ববর্তী সুখ- কল্পনার পরিবর্তে এই অপরিমিত ঐশ্বর্যের মাধুর্য দর্শনে ভারাক্রান্ত হৃদয় দুই- একদিন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। তারপরও বিয়ের দিন শুভদৃষ্টির সময় মহিমের মুখ দেখে অচলার প্রাণ আনন্দে মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আবাল্য কলকাতায় লালিত শিক্ষিত, সুশীল, প্রগতিশীল ব্রাহ্ম পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত অচলার মনে গ্রাম সম্পর্কে কবিতা ও কল্পনার সৌরভ ছিল কিন্তু শ্বশুর- বাড়ি যাত্রা পথেই কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ, বৈরী আবহাওয়া, পল্লীর নিরানন্দ পরিবেশের কারণে তার সৌন্দর্যবোধ অর্ধেক তিরোহিত হয়ে যায়। এরপর জরাজীর্ণ মেটে বাড়িঃ প্রতিবেশিদের আচরণ, তাদের মুখ চাওয়া- চাওয়ি, গা টেপাটেপি, প্রত্যাগমনকালে

ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্ম বলে ঘৃণা; মহিমের কাউকে কিছু না জানিয়ে মৃণালকে আনতে চলে যাওয়া—এসবই একটি বিরুদ্ধ পরিবেশের ইঙ্গিত ছিল অচলার জন্য। এগুলি তার মনে প্রভাব বিস্তার করে।

মৃণাল আসাতে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলেও গ্রাম্য ঠাট্টা- তামাসা ও মহিমের সাথে তার সম্পর্ক আবিষ্কারে অচলার মন মহিমের প্রতি বিরূপ হয়ে সংশয়, অশান্তি ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। এটি আরও ঘনীভূত হয় যখন মৃণাল অচলার ছোঁয়া খেতে পারবে না বলে মহিমের বাড়ি থেকে চলে যায়। ঠিক সেই সময়ে আকস্মিকভাবে সেখানে সুরেশ এসে হাজির হলে ঘটনা আরও জটিল আকার ধারণ করে। সুরেশ এসেই বুঝতে পারে মহিম- অচলার দাম্পত্য- সঙ্কট চলছে। অনেক নাটকীয়তার পর দাম্পত্য কলহের জের ধরে অচলা এক সময় বলে ফেলে—"সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।" (পরি:১৮, পৃ.২৯৭)

এই কলহ চূড়ান্তরূপ পায় মহিমকে লেখা মৃণালের একটি চিঠি অচলার চোখে পড়ায়, মৃণাল লেখে—"সেজদামশাই গো, করছ কি? পরশু থেকে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে তোমার মৃণালের চোখ- দুটি ক্ষয়ে গেল যে!" (পরি:১৯, পৃ.২৯৭)

এরপরই আকস্মিকভাবে তাদের গৃহে আগুন লাগে। অচলা মহিমকে রেখে সুরেশের সঙ্গে কলকাতার পটলডাঙ্গায় তার বাবার কাছে ফিরে আসলে কেদারবাবু ব্যাপারটি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। সন্দেহের আঙ্গুল তোলেন তাদের দিকে।

দিন দশ- বারো পরে পীড়িত মহিমকে সুরেশ তার বাড়িতে নিয়ে আসে এবং পিসিমাকে পাঠিয়ে অচলাকেও আনে। মৃণালকে ছুটি দিয়ে অচলাকে মহিমের সেবার ভার দেয়। অচলা সেবার মাধ্যমে আবার তার স্বামীর কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করে। মহিমের প্রতি অচলার সবচেয়ে বড় অভিমান ছিল স্ত্রী হয়েও সে একটি দিনের জন্যও স্বামীর দুঃখ- দুশ্চিন্তায় অংশ নিতে পারেনি। এই সময়ে সেবার মধ্য দিয়ে অচলা তার স্বামীকে একান্ত আপনার করে পেতে চায়—

> "মহিম কোনদিন বেশী কথা কহে না; কিন্তু আজ সহসা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক অচলা, বড় দুঃখ ছাড়া কোনদিন কোন বড় জিনিস লাভ করা যায় না। আমার বাড়িও আবার হবে, রোগও একদিন সারবে; কিন্তু এর থেকেও যে অমূল্য বস্তুটি লাভ করলুম, সে তুমি। আজকাল আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আর বোধ হয়, আমার একটি দিনও কাটবে না।" (পরিঃ২৬, পৃ.৩২৪)

সমগ্র উপন্যাসে মহিমের পক্ষ থেকে এই একটি রোমান্টিক উক্তি অচলার মনে বসন্ত বাতাসের দোলা দিয়ে যায়। পাশাপাশি সচেতনভাবে অচলা যদিও সুরেশকে এড়িয়ে চলতে চায় কিন্তু তার প্রতি সুরেশের মনোযোগ লক্ষ্য করে অবচেতন মনের মধ্যে অনির্বচ্য রোমাঞ্চকর আনন্দ অনুভব করে। উচ্ছ্বাসপ্রবণ সুরেশের আত্মবিস্মৃত আবেগভরে অকস্মাৎ অচলার হাতখানা সজোরে চেপে ধরার ফলে অচলার বুকের রক্ত বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হয়ে বিন্দু বিন্দু ঘামে ললাট ভরে ওঠা, রাতে চোরের মত ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অচলার গায়ে নিজের চাদর দিয়ে পরম মমতায় আচ্ছাদিত করার ফলে অচলার রোমাঞ্চ জাগা, মৃণালকে সতী বলায় ঈর্ষার জাগরণ এবং 'জeŸলপুরে' যাত্রার দিন সকালবেলা সুরেশের স্বাস্থ্যের দুশ্চিন্তায় তাকে তাদের সঙ্গী হবার জন্য অশ্রু সজল চোখে নিমন্ত্রণ—এসবই সমান্তরালভাবে এগিয়েছে।

মহিম কিছুটা সুস্থ হলে বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তারা জeŸলপুরে যাত্রা করে। অচলার সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে সুরেশ তাদের সঙ্গী হয়। ট্রেনে করে জeŸলপুরে যাবার পথে 'এলাহাবাদে' গাড়ি পরিবর্তন করার কথা ছিল। কিন্তু পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশ এই সুযোগটা গ্রহণ করে। এলাহাবাদ পৌছানোর অনেক আগেই 'মোগলসরাই' স্টেশনে অচলাকে নামিয়ে সে ট্রেন পরিবর্তন করে।

অচলা যখন বুঝতে পারে সুরেশ তার স্বামীর কাছ থেকে তাকে চিরকালের মত বিচিছb করে নিয়ে এসেছে তখন তার অবস্থা মরণাহত এক নারীর মত। চরম বিশ্বাসঘাতক সুরেশকে অচলা খুনি এবং তাদের গৃহদাহের জন্য অভিযুক্ত করলে সুরেশ তাকে প্রলুব্ধকারী ও দুর্বার বেগে উৎÊজিত করার জন্য দায়ী করে এবং অসতী বলে। তিক্ত কথার এক পর্যায়ে অচলা

ডিহরীতে নেমে গেলে সুরেশ তার পিছু নেয় এবং তার দ্বারা আর কোন অকল্যাণ হবে না জানিয়ে তাকে আর অবিশ্বাস করতে নিষেধ করে।

তারা একটি সরাইখানায় ওঠে। সুরেশ অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে, অচলা ডাক্তারের জন্য ছোটাছুটি করতে থাকলে রামচরণ লাহিড়ী নামক এক ব্যক্তি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ট্রেনে রাক্ষুসী নামের যে মেয়েটির সঙ্গে অচলার পরিচয় হয়েছিল সেই মেয়ের শ্বশুর এই রামচরণবাবু। এদের বাড়িতেই তাদের আশ্রয় লাভ ঘটে।

হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠাবান সেবক রামবাবুর আশ্রয়ে অচলা- সুরেশ স্বামী- স্ত্রী হিসেবে কিছুকাল বসবাস করলেও তাদের মধ্যে একটি দূরত্ব অচলা সবসময় বজায় রাখে। অচলার ভোগ- বিলাস ও আরাম- আয়েশের জন্য সুরেশ সেখানে বাড়ি কেনে, কলকাতা থেকে গাড়ি আনে, কিন্তু অচলার সাড়া আর তেমনভাবে পায়নি। সুরেশের চুম্বনে—"অপমানে আজও অচলার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুটি ঠিক তেমনি বিছার কামড়ের মত জ্বলিয়া উঠিল।" (পরিঃ৪০, পৃ.৩৮৪) কিন্তু তারপরও বৃদ্ধ রামবাবুর cmহ ভালোবাসার লোভে এক Db¥Ë ঝড়- বৃষ্টির রাত্রে অচলা নিজের পবিত্রতা খুইয়ে বসে—"বৃদ্ধ শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া একদৃষ্টে ওই অর্ধমৃত নারীদেহের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।" (পরিঃ৩৭, পৃ.৩৬৯) রামবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে সেখানে এই লজ্জিত নর- নারীর অকস্মাৎ মহিমের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। মহিমকে দেখে অচলা মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

এরপর কাহিনি দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। সুরেশ অচলার ভার আর বহন করতে পারছে না বলে জানায়—"তখন ভাবতুম, কি করে তোমাকে পাবো; এখন অহর্নিশি চিন্তা করি, কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার ভার যেন আমি আর বইতে পারিনে। ...মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন অসহ্য ভারী, এ স্বcও ভাবিনি।" (পরিঃ৪০, পৃ.৩৮৩) 'মাঝুলি'তে 'প্লেগ' মহামারী আকার ধারণ করেছে সংবাদ পেয়ে পরোপকারী সুরেশ চিকিৎসায় সাহায্যার্থে সেখানে গিয়ে যথেষ্ট সাবধানী হওয়া সত্ত্বেও নিজেও সংক্রমিত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে সুরেশের লেখা চিঠি পেয়ে মহিম সেখানে আসে। রামবাবুর সহায়তায় মৃতদেহের সৎকার করে।

অচলা– সুরেশের সত্যিকার সম্পর্ক জানতে পেরে রামবাবু জাত গেল বলে প্রায়শ্চিËর জন্য কাশীতে ছোটেন। অচলা মহিমেরই হাত ধরে ডিহরীতে ফিরে আসে। জানতে চায় তার মত অভাগিনীদের জন্য বিদেশের মত এদেশেও কোন আশ্রম আছে কিনা? মহিম সে প্রkর জবাব দিতে পারেনি। কিন্তু মৃণাল হয়ত এর উËর দিতে পারবে বলে তার মনে হয়—"আশ্রমই বল আর আশ্রয়ই বল, সে যে তার কোথায়, এ খবর সেজদিকে আমি দিতে পারব, কিন্তু সে ত তোমারই দেওয়া হবে।" (পরিঃ৪৪, পৃ.৪০০)

সম্ভাবনাময় জীবনের জয়গানের এমনই একটা ইঙ্গিত প্রদানের মধ্য দিয়ে গৃহদাহ উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দুই

‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে বেশ কিছু জায়গায় আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কোথাও কোথাও তীব্র নাটকীয়তা ঘটনার মোড় পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উপন্যাসের আরম্ভ, মধ্যভাগ বা চরম উৎকর্ষ, পরিণতি ও পরিসমাপ্তি সর্বত্রই সামঞ্জস্যপূর্ণ প্লটের প্রয়োজন হয়। এই উপন্যাসটির কাহিনির বুনন ও গঠনকৌশলে যথেষ্ট শক্তিমËার পরিচয় পাওয়া গেলেও সমান্তরালভাবে কাহিনিকে এগিয়ে নিতে লেখককে কোথাও কোথাও আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ সব জায়গায় তিনি কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেননি। ফলে কিছু দুর্বলতা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুকুমার সেনের মতে, “অকস্মাৎ পীড়া অথবা মূর্ছা ঘটাইয়া কাহিনীর জট কাটিয়া দেওয়া শরৎচন্দ্রের প্লট রচনার একটি সাধারণ কৌশল। গৃহদাহে এই কৌশল বারবার চোখে পড়ে।” [৭৯]

কাহিনির পরিপুষ্টি সাধনে কখনো কখনো দৈব নির্ভরতা অনিবার্য হয়ে পড়ে কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হলে তখন আর স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয় না। দৈব নির্ভরতা রচনাটির জন্য কল্যাণকর সব সময় নাও হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের ক্ষেত্রে অনিবার্য উপাদানরূপে এটিকে ব্যবহার করেছেন কিন্তু তার রচনার উৎকর্ষ সব কিছুকে ছাপিয়ে নিয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে পু•Lানুপু•L বর্ণনার মাধ্যমে মনো- জটিলতা ও আরোপিত দ্বন্দ্বে ক্ষত- বিক্ষত প্রধান তিনটি চরিত্রের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি এবং তাদের জটিলতা অবসানে ও পরিসমাপ্তিতে উËীর্ণ হতে যেসব আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন তা আলোচনার দাবী রাখে।

মহিম ও সুরেশ বাল্যবন্ধু। একজন হতদরিদ্র, নিষ্প্রভ ও অন্তর্মুখি; অন্যজন বিশাল বিত্ত বৈভবের অধিকারী ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ—তার গায়ের জোর যেমন অসাধারণ, অন্তরটাও তেমনি mেহশীল। প্রথমব্যক্তি ছাত্রবৃË পরীক্ষায় বৃË পেয়ে জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করে এম.এ পাস করে ওকালতি

---

[79] | mKgvi †mb, ev½vjv mvwn‡Z¨i BwZnvm(cÂg LÊ), Iô g‘Y: †m‡Þ¤i 2010, c.226

পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়, দ্বিতীয়জন সচ্ছলতায় ডাক্তার হবার বাসনায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। দুজনের কারোরই বাবা-মা জীবিত নেই। সুরেশের দু'বছর বয়সের সময় তার পিতা-মাতা স্বর্গীয় হন। আর মহিমের জন্মের সময়ই তার মাতা এবং মহিম কিছুটা বড় হলে তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ করার মত তাদের কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই। সুরেশের এক পিসিমা আর মহিমের বাবার বন্ধুর কন্যা মৃণাল ছাড়া আর কারো উপস্থিতি আমাদের নজরে পড়েনি। দু'জনই পরিবার ছাড়া মানুষ। লেখক সচেতন ভাবেই হয়ত তাদের এমন পারিবারিক পরিমণ্ডল তৈরি করেছেন। পরিবারের দিক থেকে তাদের এমন মিল থাকলেও চরিত্র ও সম্পদের দিক থেকে তারা একেবারে বিপরীত।

মহিম স্বল্পবাক হলেও তার কথা ওজন-বিশিষ্ট, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রকাশবিমুখ, সংযমী, শান্ত-ধীরস্থির এবং গম্ভীর প্রকৃতির। তার অন্তর্মুখি চরিত্র নিজের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা অপরের কাছে প্রকাশে উৎসাহী নয়। অপরদিকে সুরেশ উচ্ছ্বল, আবেগী, অসংযত ও প্রবৃËতাড়িত।

মহিম এবং সুরেশ দুজনের চরিত্রের এতটুকু মিল না থাকা সেË্বও তারা একে অপরের প্রাণের বন্ধু। এরকম দুই বিপরীত চরিত্রের মানুষের মধ্যে যে বন্ধুত্ব একেবারেই অসম্ভব তা নয়, বাল্যকাল থেকে তারা একই স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন-রত ছিল, একই সাথে জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করে, সুখ-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকে, সুরেশ দুই দুইবার—একবার ছেলেবেলায় বসন্ত রোগে মৃতপ্রায় হলে, আর একবার মুঙ্গেরের গঙ্গায় নৌকাডুবিতে নিজের জীবন বিপb করে মহিমের প্রাণ রক্ষা করে। কলকাতায় মহিমের ঘর-বাড়ি কিছু নেই সে মেসের বাসিন্দা—এবং গ্রামমুখি। অথচ বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সুরেশ মহিমের গ্রামের নামটা পর্যন্ত জানে না। অচলার কথা থেকে জানা যায় গ্রামটা কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরেও নয়—"চব্বিশ পরগণার রাজপুর গ্রামতো বেশী দূর নয়।(পরিঃ৪, পৃ.২৩৯)

বাল্যকাল থেকে একই সাথে লালিত-পালিত, অন্তরঙ্গ, ও প্রাণরক্ষাকারী বন্ধু সুরেশের পক্ষে মহিমের গ্রামের নাম না জানাটা অস্বাভাবিক। সুরেশ

যখন তার বন্ধু মহিমকে ব্রাহ্ম মেয়ের কবল থেকে উদ্ধারের অভিপ্রায় নিয়ে কেদারবাবুর গৃহে এসে উদ্দেশ্য সিদ্ধে সফল-প্রায়, এমনি এক পর্যায়ে কেদারবাবু তাকে মহিম সম্পর্কে খোঁজ এনে দিতে বলায় তার উËর ছিল—"কিন্তু বিপদ হয়েচে এই যে, আমি তাদের গ্রামের নামটাও জানিনে।" (পরিঃ৪, পৃ.২৩৯)

এমনকি কেদারবাবু নিজেও মহিমের গ্রামের নাম জানেন না। দীর্ঘ দুই বছর ধরে পরিচিত মহিমের সাথে তার একমাত্র আদরে লালিত কন্যার বিয়ে দেবেন বলে স্থির করেছেন—অবাধে মহিমের সাথে মেলামেশা করতে দিচ্ছেন। কলকাতায় মহিমের কোন গৃহ না থাকায় বিয়ে করে অচলাকে গ্রামে নিয়ে যাবে, এসব জানা সËও তিনি জানেন না তাদের গ্রামের নাম, সাংসারিক অবস্থা কেমন—

> "বছর-দুই পূর্বে সমাজে যখন তাঁর কথায় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমি নিজেই তাঁকে সসম্মানে বাড়িতে ডেকে এনে অচলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, সে কি এমনি করেই তার প্রতিফল দিলে! উঃ... মহিমের সাংসারিক অবস্থা জানা ত দূরের কথা, কোb গ্রামে যে তার বাড়ি তাই আমরা জানিনে।" (পরিঃ৪, পৃ.২৩৮)

আবাল্য সুহৃদ সুরেশ এবং দুই বছর ধরে পরিচিত দায়-গ্রস্ত পিতার কন্যা সমর্পণ করতে চাওয়া কেদারবাবুর পক্ষে মহিমের গ্রামের নাম না জানাটা বিস্ময়কর।

শরৎ-সাহিত্যের অন্যান্য অনেক উপন্যাসের নায়কদের উৎসহীন ধনার্জনের মত এখানেও সুরেশের বিপুল বিË-বৈভবের অর্থনৈতিক উৎস সম্পর্কে লেখক নীরব থেকেছেন। এ ব্যাপারে ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মত উল্লেখযোগ্য,

> "সুরেশকে জমিদারপুত্র বলেই মনে হয়, তার চালচলন ও বড়লোকত্ব দেখে। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ভিতটা উন্মোচিত হয়ে নেই, গৃহের ভিতের মতই অর্থনৈতিক ভিত মাটির নীচে পোতা আছে। এবং এরা, এই সকল ব্যক্তিরা, টাকা-পয়সা কোথা থেকে পায়, সে-বিষয়ে লেখকের কোন আগ্রহই নেই,

> অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম থেকে এরা এতদূরে অবস্থিত, উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে এমনি যোগাযোগবিহীন যে, তারা নিজেরাও সে-বিষয়ে আদৌ সচেতন নয়।[৮০]

সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থান-পতনের মত অচলার মনের গতির নানামুখি পরিবর্তন শেষে মহিমের প্রেমই জয়ী হয়। তবে মহিমের মত এত নিষ্ক্রিয় একটি লোকের সাথে অচলার মত এমন একটি মেয়ে কি উপায়ে যুক্ত হল সেটি হুমায়ুন আজাদের জিজ্ঞাসা,

> ‘‘অচলার সাথে মহিম কীভাবে সম্পর্কিত হয়, কিভাবে বিনিময় হয় তাদের হৃদয়ের, তার কোন বিবরণ পাই না; বিস্মিত হই এত অক্রিয় একটি পুরুষ কিভাবে জয় করলো বাঙলা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান, শিক্ষিত, মননশীল, প্রাজ্ঞ, সুরুচিসম্পb, সুগভীর অচলাকে?’’ [৮১]

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মহিম অচলাকে বিয়ের মাধ্যমে লাভ করে। বিয়ের পর গ্রামের বিরুদ্ধ পরিবেশ, নববধূ দর্শনে প্রতিবেশিদের তিক্ত মধুর মন্তব্য অচলার কানে সুধা বর্ষণ করেনি, মৃণালের উপস্থিতি কিছুটা সুবাতাস দিলেও মহিমের সাথে তার সম্পর্ক আবিষ্কার অচলার দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরাতে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া স্বামীর নির্বিকার ঔদাসীন্য, অনমনীয় কর্তব্যপরায়ণতা ও নীরস আচরণের কারণে তাদের ভাব-ভালোবাসা আদান-প্রদানের রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে পারেনি। এর উপরে বিনা আহ্বানে তাদের গৃহে প্রবৃËপরায়ণ সুরেশের আকস্মিক আগমনে দাম্পত্য সংকট চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

নতুন সংসারে স্থির হবার জন্য অচলার যে সময়ের প্রয়োজন ছিল পারিপার্শ্বিক চাপে তা সে পায়নি। প্রমË জলোচ্ছ্বাসের মত সুরেশের আগমন এবং তার উন্মË প্রেমের প্রকাশ; অভিমানাহত অচলার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা প্রকাশের মুহূর্তে আকস্মিকভাবে মহিমের উপস্থিতিতে সৃষ্ট-সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় মহিম সুরেশকে বলে—‘‘না সুরেশ, কাল তুমি নিশ্চয় বাড়ি যাবে। কোন ছলে আর দেরি করা চলবে না।’’ (পরি:১৯, পৃ.২৯৯) অচলাও মৃণালের চিঠির প্রসঙ্গ তুলে ঈর্ষাযুক্ত মনের জমাটবদ্ধ ক্ষোভ

---

[80] | wmivRj Bmjvg †PŠaix, kirP›‘ I mvgšev‘, c_g cKvk:‡m‡Þ¤i 1978, c.5

[81] | ûgvqb AvRv‘ m¤úvw‘Z, a“c‘x mvwnZ¨gvjv, c_g cKvk:dvêb 1405, †de“qvix 1999, c.(fwgKv:6)

প্রকাশে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে। মহিম তার ভুল বুঝতে পেরে অভিমানাহত স্ত্রীর অভিমান ভঙ্গের অভিপ্রায়ে রুদ্ধ কপাটের প্রতিবন্ধকতায় ব্যর্থ হয়ে নিজেই কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রামM হয়ে পড়ে। তখনই আকস্মিকভাবে ঘটে গৃহদাহের মত ঘটনা—

> ‘‘সহসা মুদিত- চক্ষে তীব্র আলোক অনুভব করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। শিয়রের খোলা জানালা দিয়া এবং চালের ফাঁক দিয়া অজস্র আলোক ও উৎকট ধুমে ঘর ভরিয়া গিয়াছে এবং অত্যন্ত সাfbকটে এমন একটা শব্দ উঠিয়াছে যাহা কানে প্রবেশমাত্রই সর্বাঙ্গ অসাড় করিয়া দেয়। কোথায় যে আগুন লাগিয়াছে, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াও ক্ষণকালের জন্য সে হাত- পা নাড়িতে পারিল না। কিন্তু সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার মাথার ভিতর দিয়া যেন ব্রহ্মাণ্ড খেলিয়া গেল।’’ (পরিঃ১৯, পৃ.৩০১)

কিন্তু মহিমের গৃহে আগুন লাগার কোন কারণ জানা যায়নি। কেন হঠাৎ করে তার ঘরে আগুন লাগল, এটি কোন দৈব নির্দেশ বা ব্যক্তি ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ কি না লেখক তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। সুরেশ বার বার জিজ্ঞাসা করেছে—‘‘আগুন লাগার জন্যে আমাকে তো তুমি সন্দেহ করোনি? মহিম তাহার হাত দুটো সজোরে ধরিয়া ফেলিয়া শুধু বলিল, ছি!...অনেক দুঃখ পেয়ে তুমি যাই কর না কেন, যাকে ‘ক্রাইম’ বলে সে তুমি কোনদিন করতে পার না বলে আজও আমি বিশ্বাস করি।’’ (পরিঃ২০, পৃ.৩০৬)

আমাদের প্রতীতিও সেরূপ। সুরেশ অসংযমী, বন্ধুপZীলোভী, অদম্য সবই ঠিক কিন্তু তার চরিত্রে এতখানি নীচতা লেখকের সাথে সাথে পাঠকেরও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, সে মহিমের ঘরে আক্ষরিক অর্থে আগুন লাগাতে পারে। আবার গ্রামবাসী যে ক্রোধবশত আগুন লাগিয়েছে এমন কোন কথাও তিনি বলেননি। শুধু ভিখু বাঁoজ্যের কথায় বোঝা যায় ব্রাহ্মমেয়েকে বিয়ের ফলে ব্রহ্মার অকৃপা হয়েছে, এপর্যন্ত- ই। আর কোন ইঙ্গিতও নেই।

কাহিনির মোড় পরিবর্তনে এই গৃহদাহের প্রয়োজন ছিল, কার্যকারণহীন ভাবে সেটি সংঘটিত হয়। এই বস্তুগত গৃহদাহের ফলে আক্ষরিক অর্থে মহিম- অচলার একমাসের স্বল্প দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। অচলার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সুরেশের জন্য যে সমবেদনা ও অনুরক্তি লুকায়িত ছিল

সেটি পুনরায় মহিমের সম্মুখে প্রকাশিত হলে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে নৈকট্য লাভের আগেই যোজন যোজন দূরত্ব তৈরি হয়। হৃদয়ের অতি গোপন রক্তক্ষরণের সাথে আক্ষরিক গৃহদাহের নিবিড় সংযোগ রয়েছে।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু তার 'শরৎ সমীক্ষা' গ্রন্থে বলেছেন,

> "কেন যে মহিমের ঘরে আগুন লাগল—তার স্পষ্ট কারণ সম্পর্কে লেখক নীরব থেকেছেন। একবার অবশ্য অচলা সুরেশকে এ-জন্যে দায়ী করেছিল—'তুমি সব পারো। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে।' তবে এই উক্তি যতটা বিরক্তি ও ক্রোধের প্রকাশ বলে মনে হয়, ততটা আন্তরিক বিশ্বাসের অভিব্যক্তি নয়।" [৮২]

ড. অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> "এই গৃহদাহের কারণ লেখক স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা নিছক দৈব ঘটনা, না শত্রুভাবাপb গ্রামবাসীদের কাজ, না ঈর্ষাপরায়ণ সুরেশের কাণ্ড তাহা ঠিক বুঝা যায় না।" [৮৩]

গৃহদাহ উপন্যাসে বাইরের ঘটনা দ্বারা অন্তরের দ্বন্দ্ব- ক্ষত চিত্র প্রকাশে আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা সহকারে বৃষ্টিকে ব্যবহার করা হয়েছে। বলা যায় উপন্যাসের কাহিনি বৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বৃষ্টির চমৎকার, শৈল্পিক ও মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার শরৎচন্দ্রের এ উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। চরিত্রের মনোজগতের সাথে প্রকৃতির এমন সমšয় অন্যান্য উপন্যাসে বিরল। তাছাড়া কাহিনির পট যখনই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে তখনই বৃষ্টি এসে তা অতি সহজেই করে দিয়েছে।

বিয়ের পর মুগ্ধ অভিভূত অচলার শ্বশুর- বাড়ি যাত্রা পথে প্রথম বৃষ্টির দেখা পাওয়া যায়। শ্রাবণ মাস বৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে অচলার মনের পট পরিবর্তনে বৃষ্টি এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিত বৃষ্টির মাধ্যমে তিনি প্রারম্ভেই দিয়ে রেখেছেন।

82| ï×mË em, kir mgx¶v, wØZxq g'Y: AvIvp 1384, c.5
83| AwRZKgvi †NvI, kirP‡›'i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.201

গ্রাম সম্পর্কে অচলার মনে যে কবিতা ও কল্পনার সৌরভ ছিল তা নিয়ে শ্বশুর- বাড়ি যাত্রা পথে বৃষ্টি তার নব- বিবাহের অর্ধেক সৌন্দর্য তিরোহিত করে। বৃষ্টির কল্যাণেই পথ কর্দমাক্ত, পল্লীগৃহ অধিক নিরানন্দ ও ম্লান, সেই সাথে অচলার মনের অন্ধকারও তরান্বিত হয়।

অসুস্থ মহিমের শয্যাপার্শ্ব থেকে মৃণালকে সরিয়ে অচলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বৃষ্টি ভূমিকা রাখে। কিভাবে? বৃষ্টির দরুণ শীত পড়ায় বৃদ্ধা শাশুড়ির সেবা করতে মৃণালকে দ্রুত বাড়ি ফিরতে হয়। তার ছেড়ে যাওয়া আসনে অচলা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।

সাধারণত ব্যক্তি উদ্যোগে যাত্রার সঙ্কল্প আবহাওয়ার অবস্থা বিবেচনা করেই সম্পb হয়। এখানেও তাই হয়েছে। অসুস্থ মহিমকে নিয়ে ফাল্গুনের মাঝামাঝি বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যাবার সঙ্কল্প থাকলেও সুরেশের পিসিমা পাঁজি দেখে তা পরিবর্তন করে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে দিন ধার্য করে দেন। সেই মতই সবাইকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু যাত্রার দিন সকাল থেকেই আকস্মিকভাবে বৃষ্টির আগমনে অশনি সঙ্কেতের ইঙ্গিত মেলে। ফাল্গুন মাসে সাধারণত বৃষ্টি হয় না এবং সেই মতেই যাত্রার দিন ধার্য ছিল। এমন নয় যে, এর ব্যতিক্রম হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমরা বিধাতার ক্রীড়নক মাত্র। সৃষ্টিকর্তা চাইলেই যখন তখন যত্র তত্র বৃষ্টি; চাইকি ঝড় জলোচ্ছ্বাসও হতে পারে।

গৃহদাহ উপন্যাসেও এমনই কিছু হয়েছে। আর তাই লেখকের প্রয়োজনে পঞ্জিকার পাতা অস্বীকার করে এই উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৃষ্টি এসেছে ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন সুপ্ত অনুরাগের বশবর্তী অচলার নিমন্ত্রণ কোনভাবে অগ্রাহ্য করতে না পেরে দুরতিক্রম্য হৃদয়াবেগতাড়িত সুরেশও আবহাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অচলা- মহিমের সঙ্গী হয়—"বাহিরে মেঘাচ্ছb আকাশ, টিপি- টিপি বৃষ্টির আর বিরাম নাই। ...এমনি সময় অচলা চাহিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড একটা ব্যাগ হাতে করিয়া সুরেশ আসিতেছে।" (পরিঃ২৭, পৃ.৩২৯)

এই টিপ-টিপ বৃষ্টিই কিছুক্ষণ পর—"অবিশ্রাম বারিপাতের সঙ্গে বাতাস যোগ দিয়া এই দুর্যোগের রাত্রিকে যেন শতগুণ ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। জানালার কাচের ভিতর দিয়া চাহিয়া তাহার দৃষ্টি পীড়িত হইয়া উঠিল— তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই সূচীভেদ্য অন্ধকার তাহার আদি-অন্ত যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।" (পরিঃ২৭, পৃ.৩৩৩)

উপন্যাসে ফাল্গুন মাসের অবিশ্রাম বারিপাত, দুযোর্গের রাত এবং সূচীভেদ্য অন্ধকার বৈশাখ মাসের কাল বৈশাখী ঝড়ের সাথে তুল্য হতে পারে। প্রকৃতির নিয়ম অগ্রাহ্য করে, লেখকের প্রয়োজনেই প্রত্যেকটি জায়গায় মুষলধারা বর্ষণ হয়। আকস্মিকভাবে নানা স্থানে বৃষ্টিকে এনে লেখক কাহিনির অগ্রগতির কাজটি সহজ করে নিয়েছেন।

যাই হোক এমন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির প্রভাবেই এলাহাবাদে মধ্যরাত্রে ট্রেন পরিবর্তন করার কথা থাকলেও রাত্রি নয়টার সময় মোগলসরাইতে সুরেশের সাথে ট্রেন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং অন্ধকারের কারণে আলো এত অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, অচলা স্টেশনের নামটা পযর্ন্ত পড়তে পারেনি, যদিও সে আধুনিক ও শিক্ষিত তবু তার শিক্ষা এখানে কোন কাজেই লাগেনি—"অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায়, অচলা সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, পোস্টের উপর দূরে দূরে স্টেশনের লণ্ঠন জ্বলিতেছে; কিন্তু এই প্রচণ্ড জলের মধ্যে সে আলোক এমনি অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার সাহায্যে কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।" (পরিঃ২৭, পৃ.৩৩৪)

এমন আদি-অন্ত গ্রাস করা অবিশ্রাম বারিপাতের দ্বারা সূচীভেদ্য অন্ধকার সৃষ্টি করা না হলে অচলাকে ভুলিয়ে মহিমের সাথে বিচ্ছেদ ঘটানো এত সহজে হয়ত সম্ভব হত না। বৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির দ্বারা প্লটের ক্লাইম্যাক্স বা চরম উৎকর্ষ সূচিত হয়, এখানেই প্রথম অংশের সমাপ্তি। এরপর কাহিনির মোড় পরিবর্তিত হয়ে কলকাতা থেকে ডিহরীতে গিয়ে পৌছায়।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে,

> ‘‘মহিমকে ছাড়িয়া সুরেশ ও অচলার মোগলসরাইতে নামিয়া ডিহরীতে যাওয়া গৃহদাহ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা আকস্মিক ও অ™ত ঘটনা।’’ [৮৪]

পরস্ত্রীলুব্ধ বিশ্বাসঘাতক সুরেশ কর্তৃক অচলাকে নিয়ে ট্রেন পরিবর্তনের পর দুজনের মনের অবস্থা বোঝাতেও লেখক বৃষ্টির আশ্রয় নিয়েছেন—

> ‘‘বাহিরে মË রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছ•Lল ঝড়- জল তেমনিভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নর- নারীর অন্ধ- হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।’’ (পরিঃ২৮, পৃ.৩৩৬)

একে অপরকে কঠিন অনুযোগে বিদ্ধ করে গালমন্দ করে—অচলাকে প্রলুব্ধকারী, গণিকা, লোভী বলায় অসহ্য বিস্ময়ে সে আহত ফণিনীর ন্যায় সুরেশকে গৃহে অMি- সংযোগের দ্বারা হত্যাপ্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে ছাড়েনি। তবু পরস্পরকে তারা ছেড়ে যেতে পারেনি এই বৃষ্টিরই কল্যাণে। সমস্যা একান্ত জটিল হয়ে উঠলেও অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজেই সুরেশ ডিহরীর সরাইখানায় আকস্মিকভাবে মৃতবৎ হয়ে পড়ায় অচলার মন আবার তার দিকে ফেরে এবং যাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল সেই অসুস্থ সুরেশের সেবা করেই তাকে সুস্থ করে তোলার প্রানান্ত চেষ্টা করতে হয়। বৃষ্টি তাদের বিচ্ছিb হতে দেয়নিঃ স্বামী- স্ত্রীরূপে রামবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে।

এরপর পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে শীতকালে আমরা আবার আকস্মিকভাবে বৃষ্টির দেখা পাই—‘‘কয়েকদিন হইতে আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হইয়া এক ঝড়- বৃষ্টির সূচনা করিতেছিল।’’ (পরিঃ৩৫, পৃ.৩৬০) লেখক এই ঝড়- বৃষ্টির ভিতর দিয়েই সুরেশ কর্তৃক অচলার চিËজয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তার ভোগ বিলাসের জন্য ক্রয়কৃত নতুন গৃহে পদার্পণ করান। ‘পরদিন

---

[84] | m‡evaP›‘ †mb¸ß, kirP›‘, c‡ev³, c.157

প্রভাত হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছbû—এই মেঘাচ্ছb আকাশ মাথায় নিয়েই অচলাকে সুরেশের নতুন বাড়িতে যেতে হয়।

সুরেশের সাথে অচলার অনৈচ্ছিক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সীমাহীন অন্ধকারের পথে অগ্রসর হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে—

> 'সেই বাহিরের বারিপাতের আর বিরাম নাই; রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, বৃষ্টির প্রকোপ যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বহুদিনের অবর্ষণে ধরিত্রী শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; মনে হইতে লাগিল তাহার সমস্ত দীনতা, সমস্ত অভাব আজিকার এই রাত্রির মধ্যেই পরিপূর্ণ করিয়া দিতে বিধাতা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।" (পরি:৩৭, পৃ.৩৬৮)

বৃদ্ধের সনির্বন্ধ অনুরোধ, cmহের মোহ এবং পুনঃ পুনঃ উcËজনা অচলাকে আচ্ছb করে সুরেশের নির্জন শয়ন মন্দিরের দিকে নিয়ে গেছে। হয়ত তার নিজের মনের সুপ্ত অনুরাগও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল—'তাহার মনে পড়িল, এমনি এক ঝড়- জল- দুর্দিনের রাত্রিই একদিন তাহাকে স্বামীহারা করিয়াছিল। আজ আবার তেমনি এক দুর্দিনের দুরতিক্রম্য অভিশাপ তাহাকে চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে।" (পরি:৩৭, পৃ.৩৬৯)

অভিশপ্ত বর্ষণমুখর রাত্রিতে স্বামীহারা, বৃষ্টিmাত দিনে সুরেশের নতুন গৃহে আগমন, দুর্দিনের রাত্রিতে বৃদ্ধের দ্বারা তাড়িত হয়ে cmহের মোহে শয়ন মন্দিরে গমন, দুরতিক্রম্য দুর্যোগে সুরেশ কর্তৃক মিলনে সীমাহীন অন্ধকারে পতন—অচলার জীবনের ট্র্যাজিডিকে অনিবার্য করে তোলে। সুরেশের সাথে সংযোগহীনতায় তার উপায় ছিল না, সংযোগেও উপায় হল না।

সুরেশের উন্মËতা ছিল অচলার দেহ কেন্দ্রিক। মন ও দেহ যে পৃথক দুটি সËা এটি সে প্রথম উপলব্ধি করে অচলার সাথে সংযুক্তির পর। তার উপলব্ধি মন ছাড়া যে দেহ তা এমন অসহ্য ভারী একথা স্বcেও ভাবেনি। তাই বহু আকাি¶তকে লাভ করায় না ছিল আনন্দ, না ছিল উল্লসিত হবার মত পূর্ণতা। মিলনে বিচ্ছেদ দুরীভূত হবে ভেবেছিল কিন্তু মিলনে বিচ্ছেদ তরান্বিত হয়েছে। এখানে মিলন দয়িতাকে কাছে না এনে দূরে

ঠেলে দেয়। ফলে হৃদয়ের প্রীতি ও সহানুভূতি প্রতি মুহূর্তের বৃশ্চিক দংশনসম বোধে রূপান্তরিত হয়।

প্রকৃতির উন্মËতায় মিলনের বর্ণনা—"বাহিরের মË প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।" (পরিঃ৩৭, পৃ.৩৬৯)

লেখার চমৎকারিত্ব বর্ণনাটির ভিতরে প্রতিফলিত। মিলন সম্পর্কিত কোন কথা না বলেও প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনার মাধ্যমে তিনি সমস্ত কথাই খণ্ড খণ্ড চিত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। এ বর্ণনা বড় শিল্পীর বৃহৎ শিল্পের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব বর্তমান। *(এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাণী'তে শরৎচন্দ্র একবার লিখেছিলেন, "আলিঙ্গন তো দূরের কথা চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের কোথাও দিতে পারিলাম না।" [৮৫]
এই উপন্যাসে তার কথার ব্যত্যয় দেখতে পাই। এমনকি 'চরিত্রহীনে'ও চুম্বন দৃশ্য বর্তমান।)

আগেই বলা হয়েছে যে, উপন্যাসটিতে লেখক অনেক সময় নাটকীয় পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষ করে মহিমের দৃশ্য চিত্রায়ণের ক্ষেত্রেই এটি বারবার পরিলক্ষিত হয়। যখন যেখানে প্রয়োজন বৃষ্টির মত মহিমও সেখানে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়ে ঘটনার জটিলতা সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

মহিমকে ব্রাহ্ম মেয়ের কবল থেকে উদ্ধারে বদ্ধপরিকর সুরেশ নিজেই যখন অচলাকে দর্শনমাত্র মুগ্ধ- অভিভূত, দুর্বার প্রেমাকা•¶ায় উন্মË, ঘনিষ্ঠতা তৈরিতে মরিয়া, অচলার হৃদয়ও দ্বিধা- দোদুল চিËে সমর্পণে চেষ্টারত এবং কেদারবাবুও তাকেই জামাতা করার ¯‡c বিভোর, এমনি এক বিnÿল সময়ে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির সঙ্কল্পে তারা বায়স্কোপ প্রদর্শনীতে যায়। ফেরার পথে কেদারবাবু পথে নেমে সচেতনভাবে অচলা- সুরেশকে নৈকট্য লাভের সুযোগ দিয়ে সমাজে গেলে স্বাভাবিকভাবে তাদের ঘনিষ্ঠতার একপর্যায়ে সুরেশের উন্মË প্রণয় নিবেদনে বিচলিত অচলা বলে বসে, আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে তো তোমার হাতেই দিয়েছেন। সুরেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে

85| m‡evaP›' †mb¸ß, kirP›', c‡ev³, c.138

অচলার হাত বারংবার চুম্বন করছে এমনি এক আবেগঘন পরিবেশে আকস্মিকভাবে ভুতের মত মহিমের উপস্থিতি সুরেশ- অচলার সাথে সাথে পাঠককেও চমকিত করে—

> "গাড়ি বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সহিস দ্বার খুলিয়া সরিয়া গেল, সুরেশ নিজে নামিয়া সযত্নে সাবধানে অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া উভয়েই একসঙ্গে চাহিয়া দেখিল, ঠিক সম্মুখে মহিম দাঁড়াইয়া এবং সেই নিমিষের দৃষ্টিপাতেই এই দুটি নর- নারী একেবারে যেন পাথরে রূপান্তরিত হইয়া গেল।
>
> পরক্ষণেই অচলা অব্যক্ত আর্তস্বরে কি একটা শব্দ করিয়া সজোরে হাত টানিয়া লইয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।
>
> মহিম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, সুরেশ, তুমি যে এখানে?" (পরিঃ৯, পৃ.২৫৭)

মহিম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয় সুরেশের নৈকট্য দেখে আর পাঠক বিস্মিত হয় মহিমকে উপস্থিত দেখে। ঠিক ঐ মুহূর্তে মহিমের উপস্থিতি ঘটনা হিসেবে অবশ্যই আকস্মিক কিন্তু এই আকস্মিক ঘটনার কার্যকারণের ইতিহাস লেখক ব্যাখ্যা করেননি। উনিশ দিন ধরে যে ব্যক্তির কোন খোঁজ নেই, অচলা- সুরেশের রোমান্টিক মুহূর্তের ঐ দৃশ্য দেখানোর জন্যই সেই ব্যক্তিকে হঠাৎ তাদের মুখোমুখি দাঁড় করানো আরোপিত ঘটনা। মহিম বেশিক্ষণ কলকাতায় থাকেনি। লেখক বলেছেন—"কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী ঔষধ কিনিতে মহিম কলকাতায় আসিয়াছিল। সুতরাং রাত্রের গাড়িতেই বাড়ি ফিরিয়া গেল।" (পরিঃ১০, পৃ.২৫৮) কিন্তু কার জন্য ঔষধ কিনে এত দ্রুত মহিম বাড়ি ফিরে গেল? যার জন্য কলকাতায় তাকে ছুটে আসতে হয়েছিল—তার কোন উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে নেই। মহিমের তো এক মৃণাল ছাড়া আর কেউ ছিল না। আর মৃণাল অসুস্থ এমন কথা পুরো উপন্যাসেই নেই। এর চার দিন পর মহিম আবার কেদারবাবুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়—"সুরেশের গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল—এমনি সময়ে দুর্গ্রহের মত ধীরে ধীরে মহিম আসিয়া অকস্মাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।" (পরিঃ১০, পৃ.২৫৮)

ষোড়শ পরিচ্ছেদে মৃণালের প্রসঙ্গ নিয়ে যখন অচলা- মহিমের দাম্পত্য- সঙ্কট ঘনীভূত, কলহ চরমে, সেই মুহূর্তে হঠাৎ আসা সুরেশ উপলব্ধি করে অচলা সুখে নেই। প্রবৃত্তিতাড়িত যুবক অচলার দুঃখ জানতে চেয়ে

নিজের হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করে তার উপর অচলার সম্পূর্ণ অধিকার এখনও বর্তমান বলে জানায়। এসব কথায় অচলা দুঃখ পায় জানালে সুরেশ জানতে চায়, 'দুঃখ কি পাও অচলা?' অচলার উক্তি, 'আমি কি পাষাণ সুরেশবাবু?'—বলে বিগত দিনের দাম্পত্য কলহের সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা চোখ দিয়ে ঝরঝর করে গলে পড়লে সুরেশেরও অশ্রুভারে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। এমনই এক আবেগময় মুহূর্তে মহিম সেখানে অপ্রত্যাশিত হলেও কোন এক দৈব নির্দেশেই সে সেখানে হাজির হয়। বেলা এক প্রহরের মধ্যে ফিরে আসার কথা থাকলেও তার আকস্মিক উপস্থিতি পরিস্থিতিকে অস্বাভাবিক করে তোলে—

> "ঠিক দ্বারের বাহিরেই জুতার শব্দ শোনা গেল, এবং পরক্ষণেই মহিম ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল, কি হে সুরেশ, চা– টা খেলে?
>
> সুরেশ সহসা জবাব দিতে পারিল না। সে কোন মতে মুখ নীচু করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া ফেলিল, এবং অচলা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতবেগে মহিমের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম চৌকাঠের ভিতর এক পা এবং বাহিরে এক পা দিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।" (পরিঃ১৬, পৃ.২৯০)

এখানেও ঠিক সেই একই নাটকীয়তা। দাম্পত্য– জটিলতা ঘনীভূত করতে এই ঘটনাটিও বৃহৎ ভূমিকা পালন করে। ফলে সাময়িক বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ডিহরীতে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সুরেশ– অচলার পরস্পরকে পাওয়া না পাওয়ার বেদনা এবং পেয়ে হারানোর দ্বিধা– দ্বন্দ্ব, ব্যর্থ প্রণয়ীর নিষ্ফল আক্রোশ আবার সম্ভোগ চরিতার্থতায় কলুষিত অনুভব—এমনই জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি কামনায় অস্থির সুরেশ শেষ আশ্রয়ের একটা জায়গা খুঁজেছে অচলার অন্যত্র যাবার বাসনায়। দোদুল্যমান অচলা না পেরেছে স্বামীকে ভালোবেসে তার ঘর করতে, না পেরেছে সুরেশের ভালোবাসার অংশীদার হয়ে তার সত্যিকার সঙ্গী হতে। দারিদ্রকে সে যেমন মন থেকে গ্রহণ করতে চায়নি, ঐশ্বর্যকে সে তেমনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি। উভয়দিকের দ্বিধা– দ্বন্দ্বেই তার জীবনের পরাজয় ও ট্র্যাজিডি মহীরুহ আকার ধারণ করে।

জীবনের দুর্বিষহ কাল অতিক্রমে রামবাবুর অপত্যস্নেহ ও সামাজিকতার লোভ তখনও হয়ত কিছু অবশিষ্ট ছিল ফলে রাক্ষুসীরা কলকাতা থেকে ফিরে এলে অচলা ধনী গৃহিণীর উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সুরেশের সাথে রামবাবুর গৃহে পদার্পণ করেঃ তখনও সে জানে না জীবনের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক মুহূর্ত তারই জন্য অপেক্ষারত—

> ‘সেই বিরাট ওয়েলার যুগলবাহিত বিপুলভার অশ্বযান সমস্ত গৃহ প্রকম্পিত করিয়া দেখিতে দেখিতে গাড়ি বারান্দার নীচে আসিয়া থামিল।
>
> জমকালো নূতন পোশাকপরা সহিসেরা গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং সুরেশ নিজে নামিয়া হাত ধরিয়া অচলাকে অবতরণ করাইল।...
>
> এসো এসো, আমার মা এসো! এই পরিচিত কণ্ঠস্বরের ব্যগ্র-ব্যাকুল আবাহনে তাহার হাসিমাখা চোখের দৃষ্টি মুহূর্তে নামিয়া আসিয়া বৃদ্ধের উপর নিপতিত হইলঃ কিন্তু তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজ মহিম—তাহারই প্রতি চাহিয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। চোখে চোখে মিলিল, কিন্তু সে চোখে আর পলক পড়িল না। সর্বাঙ্গে মণি-মুক্তা অচলার তেমনি ঝলসিতে লাগিল, হীরা-মানিকের দীপ্তি লেশমাত্র নিষ্প্রভ হইল না, কিন্তু তাহাদেরি মাঝখানে প্রস্ফুটিত কমল যেন চক্ষের নিমিষে মরিয়া গেল।” (পরিঃ৪০,পৃ.৩৮৪)

সেই একই চিত্র। এর চেয়ে বড় আকস্মিকতা আর কী হতে পারে। পাঠক হচ্ছে মহিম কী করে রামবাবুর বাড়িতে এল? ভাঁড়ারপুরের ভবানী চৌধুরীর ছেলের হাউস টিউটর হিসেবে মহিম চাকুরি নিয়েছে এই সংবাদ আমরা আটত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে মৃণালকে লেখা চিঠির মাধ্যমে জানতে পেরেছি—“মহিম কোন একটা বড় জমিদার-সরকারের গৃহ-শিক্ষকের কর্ম লইয়াছে।” (পরিঃ৩৮, পৃ.৩৭০) কিন্তু এই রামবাবুরই ভাঁড়ারপুরের ভবানী চৌধুরীর মামাশ্বশুর হওয়া, এর বাড়িতেই মহিমের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি এবং এদের সাথেই তার ডিহরীতে রামবাবুর বাড়িতে বেড়াতে আসা যেমন অস্বাভাবিক আবার তেমনই অচলা-সুরেশের ‘উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বিরাট ওয়েলার যুগলবাহিত বিপুলভার অশ্বযানে’ চড়ে রামবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ এবং সুরেশ নিজে নেমে হাত ধরে অচলাকে অবতরণ করানোর মুহূর্তেই সেখানে মহিমের উপস্থিতি বিস্ময়কর ও আকস্মিক। এই আকস্মিকতার ধাক্কায় অচলা নিজের মৃত্যু কামনা করে, সুরেশ মাঝুলিতে প্লেগের চিকিৎসা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং

পাঠক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয় আর এরই মাধ্যমে উপন্যাসের দ্রুততর সমাপ্তি ত্বরান্বিত হয়।

তবে একথা উল্লেখ না করলেই নয় যে, সুরেশের মৃত্যু ব্যর্থ প্রণয়ীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা মনে করলে তার প্রতি অবিচার করা হয়, সে সত্যিকার অর্থেই সাহসী এবং পরোপচিকীর্ষু, উপরন্তু তার এমন একটা উদার মন ছিল যে সে স্বাচ্ছন্দ্যে, অবলীলায় সমস্ত ভোগ ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে ত্যাগ করে যেতে পারে। এখানেই এ চরিত্রটির সাফল্য।

জব্বলপুরে যাত্রার উদ্দেশ্যে ট্রেনে ওঠার পর অচলা ইন্টার ক্লাসের মেয়েগাড়িতে সমবয়সী সঙ্গী পেয়ে যার সাথে গল্পে মাতে তার নাম রাক্ষুসী। সে আরায় যাবে ঠিকেদার স্বামী সন্দর্শনে। তার শ্বশুর-বাড়ি ডিহরীর শোন নদের তীরে। নব-পরিচিত অচলাকে ডিহরীতে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে আরা স্টেশনে নেমে যায়। এ পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।
অচলাকে নিয়ে সুরেশের ট্রেন পরিবর্তন করা, সরাইখানায় ওঠা এবং তাদের সাহায্যের জন্য রামবাবুর এগিয়ে আসা এবং তাদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণও ঘটনা হিসেবে স্বাভাবিক; কিন্তু সেই বাড়িটিই রাক্ষুসী তথা বীণাপাণির শ্বশুরবাড়ি এবং রামবাবুই তার শ্বশুর হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা।

আবার এখানেই শেষ নয় বিস্ময়ের তখনও কিছু বাকি। বীণাপাণি পরিবারসহ অসুস্থ জাঠ-শাশুড়িকে দেখতে কলকাতায় যেতে চাইলে অচলার জিজ্ঞাসার উËরে রাক্ষুসী জানায়, তার শ্বশুর-বাড়ি কলকাতার পটলডাঙ্গায়।
অচলার পিতৃগৃহ কলকাতার পটলডাঙ্গায়, আবার রাক্ষুসীর শ্বশুরবাড়িও কলকাতার পটলডাঙ্গায়—কি বিস্ময়কর যোগাযোগ!

কেউ প্রk করতে পারেন পটলডাঙ্গায় অচলার বাড়ি বলে আর কারো বাড়ি কি সেখানে হতে পারে না? অবশ্যই পারে। কিন্তু ট্রেনে যে মেয়ের সাথে পরিচয়, পালিয়ে ডিহরীতে তারই শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে ওঠা, আবার সেই

মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি কলকাতার পটলডাঙ্গায়-ই হওয়া শুধু বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিকই নয় এটি বিশ্বাসের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যায়।

আপাতদৃষ্টিতে এই যোগাযোগটি সাদামাটা মনে হলেও উপন্যাসে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। ডিহরীতে সমাজ-সংসার-বিচ্ছিb অচলা-সুরেশকে মহিমের মুখোমুখি দাঁড় করাতে লেখক কলকাতার সাথে ডিহরীর যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে বীণাপাণির মাধ্যমে সমাধান খুঁজেছেন। তার শ্বশুরবাড়ি পটলডাঙ্গায় না হলে মহিমকে ডিহরীতে আনা হয়ত সম্ভব হত না অথবা অন্য কোন উপায় ভাবতে হত। ত্রিভুজ প্রেমের প্রধান পাত্র-পাত্রী যখন মুখোমুখি তখন অনিবার্য ট্র্যাজিক পরিণতি দ্রুততর গতিতে সমাপ্তির দিকে ধাবিত।

এখানে লেখকের বহুবিস্তারী চিন্তার ফসল এবং যোগসূত্র স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বীণাপাণি কার্যকরী ভূমিকা রাখে। জব্বলপুরে ট্রেনে ওঠার পর তাদের পরিচিত হওয়া, অচলার হঠাৎ ডিহরীতে নেমে ডাক্তার খোঁজার ছলে তার শ্বশুর রামবাবুর সাথে পরিচয় ঘটা, তাদের বাড়িতেই আশ্রয় লাভ, শাশুড়িকে দেখার ছলে পটলডাঙ্গার সাথে যোগাযোগ, গৃহশিক্ষক মহিমের ছাত্রের পিতার শ্বশুর রামবাবু হওয়ার সুবাদে তাদের সাথে পরিচিতি লাভ, সেই সূত্রে মহিমের ডিহরীতে বেড়াতে আসা এ সমস্তই পরিকল্পিত ভাবে অঙ্কিত হয়েছে অচলা-সুরেশের মুখোমুখি মহিমকে দাঁড় করিয়ে তাদের মেকি আলো ঝলমলে দাম্পত্যরূপ দেখনোর নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যই। আর এ সব প্রতিটি ঘটনাই অস্বাভাবিক ভিতের উপর রচিত।

পুরো উপন্যাস জুড়েই এই ধরনের নানা নাটকীয়রীতি ব্যবহার করে পাঠকের কৌতূহলকে উজ্জীবিত করে রাখা হয়েছে। অচলার সাথে সুরেশের আকস্মিক পরিচয়ের পর থেকে সুরেশের মৃত্যু এবং অচলার মহিমের কাছে ফেরার একটা ইতিবাচক ইঙ্গিত পর্যন্ত প্রতিটা ক্ষেত্রে এই নাটকীয় রীতি অবলম্বনে প্লটকে আকর্ষণীয় করে পাঠকের ভালোলাগাকে প্রভাবিত করা হয়েছে।

ড. অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> "ঘটনার আকস্মিকতা, এক পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ বিপরীত পরিস্থিতির অবতারণা, চরিত্রের দ্রুত রূপান্তর প্রভৃতির মধ্যে নাটকীয় রীতি লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসে মুহুর্মুহু এই ধরনের নাটকীয় রীতি প্রয়োগ করিয়া পাঠকের মনকে কৌতূহলে আগ্রহে ভরিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্ম মহিলার প্রতি প্রবল বিদ্বেষ লইয়া সুরেশ অচলার কাছে গেল কিন্তু আবার সেই মহিলার প্রতিই সে দুর্নিবার আকর্ষণ লইয়া ফিরিল। সুরেশ ও অচলার পারস্পরিক হৃদয় বিনিময় যখন বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিল তখনই হঠাৎ ধূমকেতুর ন্যায় মহিমের আবির্ভাব এবং অচলা তাহাকেই বিবাহ করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া বসিল। আবার মহিমের সঙ্গে অচলার বিবাহ স্থির হইয়া যাইবার পর সুরেশের বাড়ীতে তাহার অপরিমিত ঐশ্বর্য দেখিয়া অচলার ভাবান্তর ঘটিল। অচলা স্বামীর সংসারে মন নিবিষ্ট করিতে যখন চেষ্টা করিতেছে তখনই আবার সুরেশ তাহার মূর্তিমান সর্বনাশ রূপে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচলা স্বামীর সঙ্গে বিদেশযাত্রার সুখস্বc যখন বিভোর তখনই ক্লেশকর দুঃস্বcর মত সুরেশ স্টেশনে আসিয়া হাজির হইল। ডিহরীতে অচলা সুরেশের সংসারে নিজেকে মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে সেই সময়েই হঠাৎ মহিমের সেখানে আবির্ভাব। এমনিভাবে শরৎচন্দ্র একটি ঘটনার মধ্যে বিরুদ্ধ ঘটনার আঘাত হানিয়া কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।" [৮৬]

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, গৃহদাহের আট- দশ দিন পর সুরেশ যখন অসুস্থ মহিমকে তার বাড়িতে নিয়ে আসে কেদারবাবু বা অচলা কেন মহিমকে তাদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি ? এই প্রckর উËর মেলে না। অিM সংযোগে সমস্ত কিছু নিঃশেষ হয়ে যাবার মত বড় ঘটনা সংঘটিত হবার পরও কেদারবাবু বা অচলা কেন মহিমের খোঁজ নেয়নি ? এ বিষয়ে তাদের কোন তৎপরতাও লক্ষ্য করা যায় না। অসুস্থ স্বামীকে নিজ গৃহে নিয়ে সেবা করে সুস্থ করাই মনে হয় স্বাভাবিক হত।

অথচ একমাস ধরে সুরেশের গৃহে অবস্থান করে তাকে এড়িয়ে চলা, নিজের প্রতি সুরেশের মনোযোগে পুলকিত হওয়া, তাকে ভালোবেসে ফেলেছে কিনা এই নিয়ে সংশয়ে ভোগা, সুরেশের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদ্বিM হয়ে অশ্রু- বিসর্জন—এই ধরনের নানা নাটকীয়তা অচলার নিজের

---

[86] AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›'i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.209-210

মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সৃষ্টি করে তেমনি প্রবৃÈর প্রবল তাড়নায় তাড়িত সুরেশের সুপ্ত বাসনাকে উদ্দীপিত করতেও প্ররোচিত করে। ফলে হাওয়া পরিবর্তনে যাত্রার সময় তার অশ্রুসজল নয়নের নিমন্ত্রণ অস্বীকার করতে না পেরে সুরেশ তাদের পথের সঙ্গী হয় এবং তার এই হৃদয় দৌর্বল্যের কারণে উপন্যাসটি একটি অনিবার্য ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে ধাবিত হয়।

উপন্যাসের মধ্যে দুই তিনটি জায়গায় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ অচলার বয়সের হিসাবে।
দ্বিতীয়তঃ মাসের উল্লেখে।
তৃতীয়তঃ সুরেশের কাছ থেকে নেওয়া টাকার সংখ্যায়।

প্রথমতঃ কাহিনির প্রারম্ভে উল্লিখিত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি সুরেশের সাথে অচলার পরিচয়ের সময় তার বয়স সতেরো-আঠারো বছর—"একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া পিতার কাছে একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।" (পরিঃ৩, পৃ.২৩৭)

উপন্যাসের শেষ দিকে একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায় তখন অচলার বয়স একুশ বছর—"শয্যায় শুইয়া অচলা ভাবিতেছিল, এই ত তাহার একুশ বৎসর বয়স, ইহার মধ্যে এমন অপরাধ কাহার কাছে সে কি করিয়াছে যেজন্য এতবড় দুর্গতি তাহার ভাগ্যে ঘটিল।" (পরিঃ৪১, পৃষ্ঠাঃ৩৮৫)

উপর্যুক্ত উক্তি দ্বারা বোঝা যায় সুরেশের সাথে তার পরিচয়ের পর তিন থেকে চার বছর সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু উপন্যাসটির সময় গণনা করলে এটিতে কোনভাবে এত দীর্ঘ সময়ের হিসাব পাওয়া যায় না। সুরেশের সাথে পরিচয়ের 'দুই মাস' পর মহিমের সাথে অচলার বিয়ে হয়। বিয়ের পর অচলা মহিমের গ্রামের বাড়িতে 'একমাসে'র দাম্পত্য জীবন-যাপন করে। সুরেশের আতিথ্য গ্রহণের 'পাঁচ-ছয়' দিন পর গৃহে অM-সংযোগের ঘটনাটি ঘটলে তার সাথে অচলা কলকাতায় ফিরে আসে—"ইহার পরে **আট-দশদিন** পিতা-পুত্রীর যে কি করিয়া কাটিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।" (পরিঃ২২, পৃ.৩১৩)

আট-দশদিন পর অসুস্থ মহিমকে সুরেশ তার নিজের বাড়িতে এনে রাখলে সেখানে 'মাসখানেক' অচলা অসুস্থ স্বামীকে সেবা করার সুযোগ পায় বলে উল্লেখ। এখান থেকেই জব্বলপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং ডিহরীতে অবতরণ। রামবাবুর বাড়িতে তারা 'মাসখানেক' অবস্থান করে—এর প্রমাণ আমরা পাই সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদে অচলার নিজের উক্তিতে—"এক মাস হয়নি তুমি এতবড় অসুখ থেকে উঠেছ—বারবার আমাকে আর কত শাস্তি দিতে চাও?" (পরিঃ৩৭, পৃ.৩৬৮)

কন্যা নিরুদ্দেশের পর মৃণালের বাড়িতে কেদারবাবুর উপস্থিতিও একমাস, অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদে—"প্রায় মাসখানেক হইল, কেদারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেই অবধি আর ফিরিতে পারেন নাই।" (পরিঃ৩৮, পৃ.৩৭০)

এরপর কাহিনি অল্প সময় অতিবাহিত হয়ে সমাপ্তির দিকে গেছে। ফলে সব মিলিয়ে মাস ছয়েকের হিসাব পেতে পারি। কোনভাবেই তিন থেকে চার বছর নয়। এজন্য সতেরো/ আঠারো বছর বয়সের অচলার মাস ছয়েকের মধ্যে তার জীবনের তিন/ চার বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক।

তবে এই সময়ের মধ্যে অচলার জীবনের উপর দিয়ে যে সাইক্লোন বয়ে গেছে তাতে তার জীবনের তিন/ চার বছর নয়, ভাবার্থে তিরিশ/ চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়াও বিস্ময়কর কিছু নয়।

দ্বিতীয়তঃ গৃহদাহ উপন্যাসটি শুরু হয়েছে গ্রীষ্মকাল দিয়ে। প্রচণ্ড গরমের কথা বলা হয়েছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে (সুরেশ সম্পর্কে)—"একে এই গরম, তাহাতে এত বেলা পর্যন্ত mvনাহার নাই—গতরাত্রে এতটুকু ঘুমাইতে পারে নাই—তাহার পায়ের নীচের মাটিটা পর্যন্ত যেন অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল।" (পরিঃ৬, পৃ.২৪৮)

এর দুই মাস পর অচলা বিয়ে করে শ্বশুর-বাড়ি যাত্রা করে শ্রাবণ মাসে—"তাহার পরে শ্রাবণের এত স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রহরে মাথার উপর ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘাচ্ছb আকাশ ও নীচে সংকীর্ণ কর্দমাচ্ছb পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ দিয়া পালকি চড়িয়া অচলা একদিন স্বামী গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।" (পরিঃ১৪, পৃ.২৭৪)

প্রতিবেশিদের অম্ল-মধুর সম্বোধনে অচলার চিÉ যখন বিমুখ, সেই সময়ে লেখকের বর্ণনা—"বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। সেই বর্ধিত-বেগ বারি ধারার মধ্যে কখন যে দিনশেষের অত্যল্প আলোক নিবিয়া গেল, কখন শ্রাবণের গাঢ় মেঘাস্তীর্ণ আকাশ ভেদ করিয়া মলিন পল্লীগৃহে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল কিছুই ঠাহর হইল না।" (পরিঃ১৪, পৃ.২৭৫)

আমরা জানি বিয়ের মাস দেড়েক পর গৃহদাহের ফলে অসুস্থ মহিমকে সুরেশ তার বাড়িতে নিয়ে আসে। সুরেশের পিসীমা অচলাকে মহিমের অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে তাকে নিয়ে যেতে এলে—"এই শীতের অপরাহ্ণে ঠাণ্ডার মধ্যে তাহাকে কিছুমাত্র গরম জামা-কাপড় না লইয়া, খালি গায়ে, অনভ্যস্ত সাজে বাহিরে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বৃদ্ধ পিতার বুকে বাজিল।" (পরিঃ২২, পৃষ্ঠাঃ৩১৪)

উল্লেখ্য গ্রীষ্মের দুই মাস পর শ্রাবণ এসেছে ঠিক আছে কিন্তু শ্রাবণের দেড়মাস পরে শীতকাল এল কিভাবে? দারুণ শীতের বর্ণনা এই সময়ে লেখক বেশ কটি পরিচ্ছেদ জুড়ে দিয়েছেন। মাঘ মাসের কথা উল্লেখ করেছেন ছাব্বিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে—"মাঘ মাস যখন শেষ হইয়াই আসিতেছে এবং পথের অল্পসল্প ক্লেশও যখন সহ্য করিতে সমর্থ, তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার যাত্রা করাই কর্তব্য।" (পরিঃ২৬,পৃ.৩২৫)

বায়ু পরিবর্তনের জন্য মহিমের যাত্রার দিন স্থির হয় ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে—"ফাল্গুনের মাঝামাঝি যাত্রার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সুরেশের পিসীমা পুরোহিত ডাকাইয়া পাঁজি দেখাইয়া মাসের প্রথম সপ্তাহেই দিন স্থির করিয়া দিলেন।" (পরিঃ২৬, পৃ.৩২৬)

শ্রাবণের প্রায় আড়াই মাস পর ফাল্গুন মাস আসে। তারা জব্বলপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সুরেশ-অচলা যখন ডিহরীতে রামবাবুর বাড়িতে আশ্রয় লাভ করে তখন থেকে আবার শীত শুরু হল কী করে? একত্রিংশ পরিচ্ছেদে লেখক চমৎকার শীতের বর্ণনা দিয়েছেন—"শীতের সূর্য অপরাহ্ণবেলায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, এবং তাহারই ঈষÉপ্ত কিরণে শোন নদের পার্শ্ববর্তী সুদূর বিস্তীর্ণ বালু-মরু ধু-ধু করিতেছিল।" (পরিঃ৩১, পৃ.৩৪৪)
এবং এর পরে প্রায় সবটা জুড়ে শীতের কথা বলা হয়েছে। শুধু চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে আবার একবার 'ফাল্গুনের অপরাহ্ণ বেলার' উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাপারটা এমন দাড়িয়েছে গ্রীস্মের 'দুই মাস' পর শ্রাবণ, শ্রাবণের 'দেড় মাস' পর শীত, শীতের 'এক মাস' পর ফাল্গুন, ফাল্গুনের 'কয়েক দিন' পর আবার শীত, এর 'এক মাস' পর আবার ফাল্গুন এসেছে।

তৃতীয়তঃ উপন্যাসের ছয়টি জায়গায় কেদারবাবুর ঋণের টাকার উল্লেখ আছে। তার তিন জায়গায় চার হাজার টাকা এবং তিন জায়গায় পাঁচ হাজার টাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরেশের সাথে কেদারবাবু ও তার কন্যা অচলার পরিচয়ের চার দিনের মাথায় ঋণের কথা প্রসঙ্গে সুরেশ জানতে চায়, কত টাকা ঋণ? সাত সংখ্যক পরিচ্ছেদে —"কেদারবাবু বলিলেন, ঋণ? আমার ব্যবসাটা বজায় থাকিলে কি এ আবার একটা ঋণ। বড়জোর হাজার তিন- চার।" (পৃ.২৫১)

আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে—"সুরেশ বলিতে লাগিল, দৈবাৎ অনেক টাকার মালিক আমি। অথচ টাকা কড়ির উপর কোনদিন কোন মায়াই আমার নেই। হাজার- চারেক টাকা আমি স্বচ্ছন্দে হাতছাড়া করতে পারি।" (পৃ.২৫৩)

নয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে—"উনি বাবার চার হাজার টাকা দেনা শোধ করে দিয়েছেন।...আমি সেদিন যখন বাড়ি যাই, তখন এদের তুমি চিনিতে না। এর মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলই বা কি করে, আর একটা ব্রাহ্ম পরিবারের বিপদে চার হাজার টাকা দেবার মত তোমার মনের এতখানি উদারতা এল কোথা থেকে।" (পৃ.২৫৭- ৫৮)

বার সংখ্যক পরিচ্ছেদে কেদারবাবু অচলাকে বলছেন—"এত লোক ত আছে, কিন্তু কে কারে পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা একটা কথায় ফেলে দিতে পারে, বল দেখি!" (পৃ.২৬৮)

বাইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে কেদারবাবুর মনের কথা—"বড়লোক জামাতার কাছে কর্জ করিয়া বিবাহের পূর্বেই হাজার-পাঁচেক টাকা লওয়াও তিনি দোষের মনে করেন নাই; এবং বাড়িটা যখন তাহার থাকিবে, তবে পরিশোধের দুশ্চিন্তাও তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে নাই।" (পৃ.৩১০)

বাইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে কেদারবাবু সুরেশকে—"গড়িমসি করে তোমার সেই টাকাটার একখানা রসিদ দেওয়া আর ঘটে উঠেনি। পাঁচ হাজার টাকার হ্যাণ্ড-নোট লিখেই দিলুম—সুদ বোধ হয় আর দিতে পারব না; তবে এই বাড়িটা তো রইল, এর থেকে আসলটা শোধ হতে পারবেই।" (পৃ.৩১২)

এটি ইচ্ছাকৃত ভুল নয় অসাবধানতাবশত ঘটে থাকতে পারে বলে মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতেপূর্ণ আবেগধর্মী উপন্যাস গৃহদাহের প্রধান তিনটি চরিত্রের মনোজগতের অনধিগম্য রহস্যের অবসানে কাহিনি সমাপ্ত হলেও রিক্ত অচলার জীবনের ট্র্যাজেডি পাঠককে গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়। নারী হৃদয়ের রহস্য জটিল অভিব্যক্তি অপূর্ব চিত্রের সাহায্যে পু•Lানুপু•L বর্ণনার মাধ্যমে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে পাঠকের চিËকে গভীর ব্যঞ্জনায় অবসিত করে। আজন্ম লালিত সংস্কার ও দুরতিক্রম্য হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার চরিত্রটিকে শিল্পের উচ্চপর্যায়ে উËীর্ণ হতে সহায়তা করেছে। তবে মহিমের অস্বাভাবিক প্রস্তর-কঠিন নির্লিপ্ততা ও সুরেশের আকস্মিক Ub¥Ë আবেগ—অচলার দোলাচলবৃËির মুখ্য-প্রতিনিধিত্বকারী হলেও, উপন্যাসের সমাপ্তিতে অচলার জীবনের নৈঃসঙ্গিক-নিস্তব্ধতা, জীবন্মৃত রঙহীন সাদা-কালো পরিস্থিতি, যে কোন ট্র্যাজেডির তুলনায় এই পরিণতির চিত্রটি উচ্চস্থান দাবী করে একথা স্বীকার্য। গ্রন্থমধ্যে কিছু আকস্মিকতা, অস্বাভাবিকতা ও অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও চরিত্রের মনো-বিশ্লেষণের নিপূণতায়, প্রকৃতির সাথে মানব মনের সাদৃশ্য কল্পনায়, স্থানের ব্যাপ্তিতে, বর্ণনার মাধুর্যে, রচনারীতির কৌশলে এটি তার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম তা বলাই যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দেনা- পাওনা

Dhaka University Institutional Repository

'দেনা- পাওনা' শরৎচন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এটি প্রথমে মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২৭ থেকে ১৩৩০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ভাদ্র- ১৩৩০ (১৪ অগাস্ট ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় এবং পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাসই পাঠক নন্দিত ছিল। কোন কোন সমালোচক দেনা- পাওনা উপন্যাসটিতে বিদেশী উপন্যাসের ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন। সুকুমার সেন বলেছেন, "বর্মাতে থাকতে শেষের দিকে তিনি ইংরেজী উপন্যাস থেকে কিছু কথাবস্তু নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেসব উপন্যাস যেমন 'দËা' ও 'দেনা- পাওনা' প্রকাশিত হয়ে জনসমাদর লাভ করল।"
১৮৮৯- ১৮৯৯ এই দশ বছর ধরে রচিত লেভ তলস্তয়ের 'রিজারেকশনের' সাথে 'দেনা- পাওনা' উপন্যাসের কাহিনির মিল খুঁজে পেয়েছেন ড. অজিতকুমার ঘোষ। 'রিজারেকশনের' অত্যাচারী জমিদার নেLলিউদভের সঙ্গে 'দেনা- পাওনা' উপন্যাসের জীবানন্দ চরিত্রের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে এর বেশি নয়।

উপন্যাসটি কাহিনি এবং চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে অন্য উপন্যাসগুলির তুলনায় একটু ভিন্নধর্মী। চণ্ডীগড়ের প্রাচীন দেবতা চণ্ডীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মন্দির। এই মন্দির বীজগাঁয়ের জমিদারিভুক্ত। 'দারুণ কুক্রিয়াসক্ত, পাপপঙ্কে আকণ্ঠ- wbgMÛ জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী রাজ্য পরিদর্শনচ্ছলে চণ্ডীগড়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং মাত্র পাঁচদিনের মধ্যেই তার অনাচার ও অত্যাচারে গ্রামখানি জ্বলে যাবার উপক্রম হয়েছে। মন্দিরে যে সমস্ত দেবোËর সম্পাËি ছিল জমিদার গাঁয়ে পদার্পণ করে ঘোষণা করলেন যে এই গাঁয়ে কোন দেবোËর সম্পাËি নেই। দেবীর সম্পাËি‡K জমিদারী অংশ বলে দাবী করে গোমস্তা এককড়ি নন্দীকে নির্দেশ দেওয়া হয় সেবায়েতের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের। এমতাবস্থায় মন্দিরের সেবায়েত তারাদাস চক্রবর্তী পাঁচ ছ'শ টাকা খাজনা পরিশোধ করতে না পেরে পালিয়ে যায়। জমিদারের পেয়াদারা এ নিয়ে কটুক্তি করায় সেবায়েতের কন্যা ভৈরবী ষোড়শী—"cj আমিই যাবো—তোদের মাতালটা আমাকে কি করতে পারে দেখি গে।" (পরি:২, পৃ.১৬৬) এই বলে পরিণাম- ভয়হীন

Ub¥াদিনীর ন্যায় নিজেই দ্রুতপদে অগ্রসর হয়। যখন ষোড়শী ভৈরবী জমিদারের শান্তিকুঞ্জে গিয়ে ঢোকে তখন সন্ধ্যা উËীর্ণ। ঝোঁকের বশে এসে পড়লেও আসার পর সে যথার্থ ভীত হয়ে পড়ে। পাণ্ডুরতা নেমে আসে তার মুখে। মদের তীব্র গন্ধ, ময়লা- আবর্জনা, আMেয়াস্ত্র, বন্য পশুর কাঁচা চামড়া, পাইকদের হল্লা তার মনে ভয়- বিnয়লতা সৃষ্টি করে। কিন্তু অকস্মাৎ প্রচণ্ড কলিক ব্যথায় জমিদার জীবানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়ায় রাতে তার উপর অত্যাচার করতে পারেনি—"আজকের মত ও ঘরে বন্ধ থাকো, কাল তোমার সতীপনার বোঝাপড়া হবে।" (পরি:৩, পৃ.১৭১) বলে ষোড়শীকে রাত্রে আটকে রাখে। একই সময়ে জমিদারের বহুদিনের শত্রু জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কে- সাহেবও সে অঞ্চলে এসেছিলো। ভৈরবীর পিতা তারাদাসের অভিযোগ পেয়ে পরদিন প্রভাতে ম্যাজিস্ট্রেট শান্তিকুঞ্জে গিয়ে হাজির হয়। ফলে সব মিলিয়ে এক রুদ্ধশ্বাস চরম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মনে হয় জমিদার জীবানন্দকে তার বহুদিনের অপকর্মের মাশুল গুনতে হবে। কিন্তু শেষ পযর্ন্ত তার কিছুই হয় না। কারণ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রkর উত্তরে ভৈরবী জানায় সে নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছে। কেউ তার গায়ে হাত দেয় নি। কোনরূপ লাঞ্ছিত না হয়ে ভৈরবী মন্দিরে ফিরে আসে। ভৈরবীর আচরণে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, তার পিতা, উপস্থিত সবাই, এমনকি জমিদার নিজেও হতবাক হয়ে পড়ে। সেখান থেকে কাহিনি অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়।

পরদিন প্রভাত থেকে ষোড়শীর ব্যতিক্রমী জীবনের সূচনা হয়। সমাজপতি, সমাজের নেতৃবৃন্দ ও তাদের সহযোগী ষোড়শীকে ভৈরবী পদ থেকে সরিয়ে দিতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। জমিদার অন্তরের মধ্যে প্রবলভাবে তাকে কামনা করলেও প্রকাশ্যে বিতাড়িত করতে চায়। এর জোরালো প্রতিবাদ করে গ্রামের দিকপাল জনার্দন রায় চৌধুরীর কন্যা হৈমবতী। পিতার বিরুদ্ধাচারণ করতে এবং ষোড়শীর পক্ষ নিতে সে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ষোড়শী আর পূজা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ষোড়শীকে নিয়ে যখন বিচারের প্রস্তুতি চলছে এমন সময়ে আকস্মিকভাবে একজন মুসলমান ফকিরের প্রবেশ ঘটে—"ঠিক এই সময়ে ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া, সেই ভণ্ড মুসলমান ফকির ধীরপদক্ষেপে প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।" (পরি:৮, পৃ.১৯২)

ফকিরের সঙ্গে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের বাদানুবাদ হলে তারা ফকিরকে নিন্দা করায় ফকির সাহেব বলেন—

> "কিন্তু আপনারা, বিশেষ করে আপনি (জনার্দন রায়) নিজে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, কিসের জন্য শুনি? ষোড়শী তো একা নয়, আরও অনেক মেয়ে আছে। গ্রামের বুকের মধ্যে বসে লোকটা যখন রাত্রির পর রাত্রি মানুষের মান-ইজ্জত অপহরণ করছিল, তখন কোথায় ছিলেন শিরোমণি, কোথায় ছিলেন জনার্দন রায়? সে যখন গরীবের সর্বস্ব শোষণ করে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করে নিয়ে গেল, তার কতখানি বুকের রক্ত আপনি তাদের জমিজমা, বাড়িঘরদ্বার বাঁধা রেখে যুগিয়েছিলেন শুনি?" (পরিঃ৮, পৃ.১৯৪)

এই উক্তির ফলে সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং একটা তীব্র কণ্ঠের রেশ চারদিকে ছড়িয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ষোড়শীকে নিয়ে চলে যাবার সময় হৈমবতী ফকিরের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাইলে তাকে তার স্বামীসহ তিনি আশ্রমে আমন্ত্রণ জানান। পরে তার স্বামী নির্মলবাবু একাকী ফকিরের আশ্রমে তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। ইতোমধ্যে ষোড়শীও সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু উভয়েই ফকিরের দেখা না পেয়ে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়।

পথে দু'জনেই প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়লে ষোড়শী দ্বিধাহীন চিত্তে হাত ধরে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। অন্যকেউ না জানলেও হৈমর কাছে বিষয়টি ধরা পড়ে। নির্মল যে ষোড়শীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে তা সে অনুভব করে। পরবর্তীতে ষোড়শীর চিঠি পেয়ে নির্মলবাবু আটশো ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে ষোড়শীর হয়ে আইনি লড়াই লড়তে আসে।

অপরদিকে অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী কর্তৃক প্রজাদের একমাত্র জীবিকা অর্জনের উপায় পুরুষানুক্রমে ভোগ করা জমি এক মাদ্রাজী সাহেবকে বিক্রির চক্রান্ত নস্যাতে ষোড়শী সোচ্চার হতে তাদের উজ্জীবিত করার ফলে জমিদার জোতদারের সাথে তার অবস্থান হয় মুখোমুখি। ফলে নিজের প্রজাদের সে হুকুম দিয়ে রাখে কেউ ঝামেলা করতে চাইলে তারা যেন জবাব দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় বীজগাঁয়ের জমিদার-গোষ্ঠীর প্রমোদভবন, শান্তিকুঞ্জ প্রজাদের ক্রোধের দাহে ভস্মীভূত হয়। কিন্তু তার আগেই ষোড়শী এবং জমিদার জীবানন্দ চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়।

অলকার প্রেম- মুগ্ধ জমিদার বারবার তার কাছে ছুটে যায়, তার সমস্ত ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে। নির্মলকে লেখা চিঠির ছিb অংশ পাঠ করে সাময়িক ঈর্ষা জাগলেও প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী এই নারীর প্রতি আকৃষ্ট উভয়ের ভুল ভাঙ্গাতে ষোড়শীই সচেষ্ট হয়। এবং সকল মোহ ত্যাগ করে ষোড়শী ভৈরবীর পদ ছেড়ে মুসলমান ফকিরের কুষ্ঠাশ্রমের উদ্দেশ্যে 'শৈবাল-দীঘিতে' চলে যায়। তারপর জমিদার তারই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে প্রজাদের সাথে মিলিত হয়। জমিদারের এমন একান্ত আত্মসমর্পণ ষোড়শীর সর্বস্ব জয় করে তাকে জীবানন্দমুখি করে তোলে।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে ষোড়শী জীবানন্দের কাছে ফিরে আসে। তার এই ফিরে আসার পেছনে হৈম, তার স্বামী, তার ছেলে, তার দাস- দাসী, তার ঐশ্বর্য, তার সংসারযাত্রার অসংখ্য বিচিত্র ছবিও ছায়াবাজির মত প্রভাব বিস্ত ার করে। জীবানন্দের স্ত্রী- পরিজন ফিরে পাবার হাহাকারও তার কাছে অবিদিত থাকেনি। ষোড়শীর ফিরে আসা এবং জীবানন্দকে সাথে করে নতুন জীবনের পথে নিয়ে যাবার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপন্যাসের শেষে ষোড়শীর হঠাৎ ফিরে এসে জীবানন্দকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন,

> ''নবলব্ধ কর্মজগত হইতে জীবানন্দ যেমন আকস্মিকভাবে বিচ্ছিb হইয়া গেল তেমনি তাহার স্বয়ং আয়োজিত শান্তিভোগের শেষ পর্বটিও যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।'' [৮৭]

[87] | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›'i Rxebx I mwnZ¨wePvi, ZZxq ms¯‹iY: AMnvqY 1414, wW‡m¤i 2007, c.222

Dhaka University Institutional Repository

দুই

‘দেনা- পাওনা’ উপন্যাসে বেশ কিছু আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। পটভূমির বিশালত্ব, কাহিনির অভিনবত্ব, চরিত্রসৃষ্টির চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও নাটকীয়তা উপন্যাসের স্বাভাবিক গতিকে প্রভাবিত করে। উপন্যাসের প্রারম্ভটা অতি নাটকীয় ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং একই সাথে প্রবল উৎকণ্ঠা বিরাজমান। আকস্মিকতার ব্যবহার এখান থেকেই শুরু এবং পুরো উপন্যাসটিই এই একমুখি ঘটনাস্রোতে বহমান। পার্শ্ব কোন ঘটনা উপন্যাসটিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি।

উপন্যাসের প্রথম দিকে কাহিনি বেশ জমজমাট হয়ে উঠে এবং একধরনের রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শুরুতে কাহিনি ক্ল্যাইম্যাক্সে পৌছে যায় এবং শেষে বিরাট অংশই সেই ক্ল্যাইম্যাক্স থেকে অবতরণের দৃশ্য। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করায় ঘটনা একটি বিশেষ নাটকীয় অবস্থায় পৌছায়। ম্যাজিস্ট্রেটের বার বার জিজ্ঞাসার উত্তরে ষোড়শী সত্য প্রকাশ করতে পারেনি—

> ‘কে- সাহেব ষোড়শীর আপাদমস্তক পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম ষোড়শী ? তোমাকেই বাড়ি থেকে ধরে এনে উনি বন্ধ করে রেখেছেন ?
> ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচি, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি।
> চক্রবর্তী চেঁচামেচি করিয়া উঠিল, না হুজুর, ভয়ানক মিথ্যে কথা! গ্রামসুদ্ধ সাক্ষী আছে। মা আমার ভাত রাঁধছিল, আটজন পাইক গিয়ে মাকে বাড়ি থেকে মারতে মারতে টেনে এনেছে।
> ম্যাজিস্ট্রেট জীবানন্দের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া ষোড়শীকে পুনশ্চ বলিলেন, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সত্যি কথা বল। তোমাকে বাড়ি থেকে ধরে এনেছে ?
> না, আমি আপনি এসেচি।
> এখানে তোমার কি প্রয়োজন ?
> ষোড়শী শুধু কহিল, আমার কাজ ছিল।
> সাহেব একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, সমস্ত রাত্রিই কাজ ছিল ?
> ষোড়শী তেমনি মাথা নাড়িয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, হাঁ সমস্ত রাত্রিই আমার কাজ ছিল। ওর অসুখ করেছিল বলে বাড়ি ফিরে যেতে পারিনি।” (পরিঃ৪, পৃ.১৭৪)

ষোড়শীর এই উক্তির পর কাহিনির নাটকীয়তা অধিকাংশই শেষ হয়ে যায়। এবং যে দুর্যোগের ঘনঘটা গড়ে উঠেছিল সেটাও কেটে যায়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে প্রk জাগে কেন সে জমিদারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি। কেন ভৈরবী জীবানন্দকে রক্ষা করেছে? সে শুনেছে জমিদারের অত্যাচারের কথা, সে দেখেছে তাকে কিভাবে নির্যাতনের জন্য বন্দী করে রেখেছে; অভিযোগ করলে জীবানন্দের বড় ধরনের শাস্তি হতে পারত। কিন্তু ষোড়শী কাউকে কিছু বলেনি; চুপ করে থেকেছে। পাঠক বুঝতে পারে যে দুজনের মধ্যে এমন কোন রহস্য আছে যা ষোড়শীকে এই ভূমিকা নিতে বাধ্য করেছে। বাইরের লোকের কোন প্রkর উËরই সে দেয় নি, এমনকি তার সবচেয়ে আপনজন ফকির সাহেবের অনুরোধেও সে কিছু বলেনি—

> "ও লোকটাকে যে তুমি কেন এমন করে বাঁচিয়ে দিলে এর কোন মীমাংসাই তো খুঁজে পাইনে ষোড়শী?...
> ফকির সাহেব, ওই পীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানোই কি উচিত হত?...
> ফকির বলিলেন, ওই লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই, এ তো তুমি জানো! তার শাস্তি হওয়া উচিত।
> এবার ষোড়শী বহুক্ষণ পর্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি সমস্ত জানি। তাঁকে শাস্তি দেওয়াই হয়ত আপনাদের উচিত, কিন্তু আমার কথা কাউকে বলবার নয়—তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি কোন দিন পারব না।" (পরি:৯, পৃ.১৯৫)

সেদিন রাতে ঘটে যাওয়া অত্যাশ্চর্য ঘটনার ভিতরের কাহিনি অন্য কেউ না জানলেও পাঠকরা জানতে পারে যে জীবানন্দ- ষোড়শী পরস্পর স্বামী-স্ত্রী। মূল রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—কথা প্রসঙ্গে জীবানন্দ বলেছিল সে বাদুড়বাগানের মেসে ছিল—"ষোড়শী হঠাৎ উৎসুককণ্ঠে প্রk করিয়া ফেলিল, আপনি কি কখনো বাদুড়বাগানের মেসে ছিলেন?
জীবানন্দ কহিল, হাঁ। ওই সময়ে একটা প্রণয়কাণ্ডের বৃন্দে হয়েছিলুম—ব্যাটা আয়ান ঘোষ কিছুতেই ছাড়লে না—পুলিশে দিলে। যাক সে অনেক কথা।" (পরি:৪, পৃ.১৭৩)

এতে ষোড়শী বুঝতে পারে বাল্যকালে এই লোকটির সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু জীবানন্দ তখনও তাকে চিনতে পারে নি। পরদিন সকাল বেলায় কথা প্রসঙ্গে জীবানন্দ সেটি জানতে পারে—

Dhaka University Institutional Repository

> "কিন্তু আমাকে কি সত্যিই এখনো চিনতে পারেন নি? ভালো করে চেয়ে দেখুন দিকি? জীবানন্দ নীরবে চাহিয়া রহিল, বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার চোখের পলক পর্যন্ত পড়িল না। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিল, বোধ হয় পেরেছি। ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?
> ষোড়শী হাসিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল আমার নাম ষোড়শী।" (পরিঃ৫, পৃ.১৭৬)

এখান থেকে সমস্ত কিছু জীবানন্দের সাথে সাথে পাঠকের কাছেও পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এর পরের সম্ভাব্য ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। এক দুর্দান্ত জমিদারের অত্যাচারের নিমিত্তে একজন ভৈরবীকে ধরে নিয়ে আসা, এবং তখনই, বিশ বছর পর আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হওয়া যে, যাকে ধরে নিয়ে এসেছে সে তারই স্ত্রী। তারপরই অত্যাচারী জমিদারের কিছুদিনের মধ্যেই ভাল মানুষে পরিণত হওয়া—সংসারে এর চেয়ে বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য ঘটনা আর কি হতে পারে। তখনই পাঠক বুঝতে পারে উপন্যাসের অগ্রগতি কোন পথে যাবে। জীবানন্দকে তার স্বামী হিসেবে জানার পর ষোড়শীর মধ্যে আবহমান কালের হিন্দু সধবার বৈশিষ্ট্য জেগে ওঠে, যে শত দোষ করলেও স্বামীকে কখনও বিপদে ফেলা যাবে না বরং প্রাণপণ তাকে রক্ষা করতে হবে। ক্ষেত্র গুপ্ত এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন,

> "ষোড়শী- জীবানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার যে কতটা ঘটনাবহুল এবং নাটকীয় তা বলা হয়েছে। উপসংহারে ষোড়শীর প্রত্যাবর্তন ও জীবানন্দের সঙ্গে মিলনেও ঘটনাগত কিঞ্চিৎ আকস্মিকতা আছে।" [৪৪]

আগেই বলা হয়েছে শরৎচন্দ্রের দেনা- পাওনা উপন্যাসটি তীব্র নাটকীয়তা ও চরম উë্জনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এটি চরমে পৌছেছে যখন ষোড়শী জমিদারের প্রমোদকুঞ্জ নামক পিশাচপুরীতে প্রবেশ করেছে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অবস্থায় পিশাচের খাঁচায় সে ঢুকে পড়েছে। যখন ভুল বুঝতে পেরেছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে জানে না কেমন করে এ হিংস্র শ্বাপদের কাছ থেকে রক্ষা পাবে। সম্মান ও সতীত্ব রক্ষায় অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে করজোড়ে প্রার্থনা করেছে, আর্তনাদ করেছে, হাহাকার

---

[৪৪] | †¶Î ¸ß, J cb¨wmK kirP›' P‡Ævcva¨vq,c_g evsjv‡'k ms¯‹iY:2011, c.202

করেছেঃ উËরে পেয়েছে নিষ্ঠুর হাসি। শিকার ও শিকারি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যে শিকার প্রাণ ভয়ে ভীত, সতীত্ব রক্ষায় আর্তনাদ করছে, শিকারি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতঃ ঠিক সেই মুহূর্তে, বিধাতার কোন এক অনির্দেশ্য নির্দেশে আকস্মিকভাবে দৃশ্যপট পাল্টে গেল।

অজিতকুমার ঘোষ বলছেন,

> ‘‘কিন্তু আকস্মিক ব্যাধিতে জীবানন্দ আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আতঙ্কপীড়িত পরিবেশটি মুহূর্ত মধ্যেই পরিবর্তিত হইয়া গেল।’’ [৮৯]

জমিদার হঠাৎ লিভারের প্রচণ্ড ব্যথায় শয্যাশায়ী—‘‘মাথার বালিশটা তাড়াতাড়ি পেটের নীচে টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং যাতনায় একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া কহিল, আজকের মত ও ঘরে বন্ধ থাকো, কাল তোমার সতীপনার বোঝাপড়া হবে।’’ (পরিঃ০৩, পৃ.১৭১)

পরমুহূর্তে শিকারি, শিকারের কাছে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আবেদন জানাচ্ছে। সে উঠতেও পারছে না, ঠিকমতো দেখতেও পাচ্ছে না, তার হাতেরও ঠিক নেই—তাই সে যোড়শীকে অনুরোধ করেছে পরিমাণ মত ঔষধ খাইয়ে দেবার জন্য। যোড়শীকে শান্তিকুঞ্জে আটকে রাখার পর যখন তার সম্ভ্রমহানির কথা বলা হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে জীবানন্দের অসুস্থ হয়ে পড়াটার মধ্যে যে আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা বিদ্যমান তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যখন যোড়শীরই হাতে জীবানন্দ ঔষধ নামের বিষ খেতে দ্বিধাবোধ করেনি—‘‘যখন সে নির্দেশমত ঔষধ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নির্বিচারে সেই বিষ হাত বাড়াইয়া লইয়া জীবানন্দ মুখে ফেলিয়া দিল। পk করিল না, পরীক্ষা করিল না, একবার চোখ মেলিয়া দেখিল না।’’ (পরিঃ৩, পৃ.১৭১)

যে জমিদার, তার লোকের অভাব হবার কথা নয়ঃ তারপরও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে অত্যাচারিতই আর্ত জমিদারের সেবায় এগিয়ে এসেছে। এই আকস্মিকতার প্রভাবে উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্রের মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে জমিদারের নিষ্ঠুরতা যেমন মুহূর্তে অসহায় করুণাভিক্ষা করেছে, যোড়শীর ঘৃণাও তেমনি আকস্মিক মমতায় পর্যবসিত হয়েছে।

---

[৪৯] | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›‘i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.226

জমিদারের কলিক ব্যথা এখানে টনিকের মত কাজ করেছে। লেখক অত্যন্ত সুকৌশলে এটি উপন্যাসে বেশ কিছু জায়গায় ব্যবহার করেছেন এবং সফল হয়েছেন। জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর চরিত্রটিকে ইতিবাচকতা দানে এবং ষোড়শীর সাথে তার সম্পর্ককে প্রেমময় ও প্রতিষ্ঠিত করতে তার কলিকের ব্যথা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে—"ভিতরের একটা উচ্ছ্বসিত দুঃসহ বেদনায় জীবানন্দের মুখখানা চক্ষের পলকে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ইহাকেই দমন করিতে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া কেবল অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, উঃ—আর আমি পারিনে!
ষোড়শীকে কিসে জানি কঠিন আঘাত করিল।" (পরিঃ৫, পৃ.১৭৮)

ফলে ষোড়শী তার সেবায় নিযুক্ত হয়েছে এবং একপর্যায়ে জমিদারের মাথাটি কোলে করে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেছে।

অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> "যাহার প্রতি সুতীব্র ঘৃণা লইয়া সে আসিয়াছিল তাহার নিরুপায় রোগাক্রান্ত দেহের অসহায় করুণাভিক্ষায় তাহার স্বাভাবিক করুণার উৎসপথে নির্বাসিত নারীসËার আকস্মিক আবির্ভাব ঘটিল।" [৯০]

পঁচিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদেও এই কলিকের ব্যথাটার উল্লেখে আবারও ষোড়শীর মমত্ব ও মনোযোগ অর্জনের চেষ্টা—"তুমি খেতে দিলে মুখের জন্য ভাবিনে অলকা, কিন্তু পেটে সহ্য হলে হয়; আমার আবার সেই কলিকের ব্যথাটায়—" (পরিঃ২৫, পৃ.২৭০)

চক্ষের পলকে ষোড়শীর ব্যাকুল ম্লানমুখ, পোড়া- কপালে করাঘাত, ভাত, মাছের- ঝোল না খাওয়াতে পারলে কেঁদেই মরে যাবে ইত্যাদি শব্দযোগে অনুযোগ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নৈকট্য এবং ইতিবাচক পরিণতি ইঙ্গিত করে।

উপন্যাসে প্রধান দুই চরিত্র ষোড়শী- জীবানন্দ যখন একটি অঘটনের মধ্যে দিয়ে আকস্মিক স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক উদঘাটনের দ্বারপ্রান্তে অপরদিকে ঠিক সেই সময়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ট্যুরে বেরিয়ে ক্রোশখানেক

---

[90] | H, c.224

দূরে তাবু ফেলেছেন। এই ম্যাজিস্ট্রেট আর কেউ নন স্বয়ং কে- সাহেব, যিনি জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর পূর্ব পরিচিত এবং শত্রু হিসেবেই পরিচিত। বাদুড়বাগানের মেসে থাকতে এরই কাছে তার একবার দিন- কুড়ি হাজতবাসও হয়েছিল। এছাড়াও জীবানন্দকে দু'বার ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, সফল হতে পারেনি।

পূর্ব পরিচিত এমন ম্যাজিস্ট্রেটই এখানে প্রয়োজন ছিল হাতে নাতে ধরে ফেলার জন্য। তাদের এই শত্রু মনোভাবাপb পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরেই ষোড়শীর সামনে রহস্যের জট খুলেছে। ষোড়শীর পিতা তারাদাস চক্রবর্তীর অভিযোগ পেয়ে পরদিন শান্তিকুঞ্জে ঘটনা তদন্তের জন্য এসেছেন ম্যাজিট্রেট কে- সাহেব। ফলে ধারণা করা হচ্ছিল জীবানন্দের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই জীবানন্দ দেবোË‌র সম্পË ছেড়ে দেওয়া, হাজার টাকা নগদ এবং নজর ছেড়ে দেবার বিনিময়ে ষোড়শীকে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবার অনুরোধ করেছে। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি, ধরে নিয়ে আসার ব্যপারে ষোড়শীর অচিন্ত্যনীয় অস্বীকৃতি এবারও সাহেবকে সফল হতে দেয়নি।

শরৎচন্দ্র কাহিনি নয় চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। জীবানন্দ এবং ষোড়শী উভয় চরিত্রকেই তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই অঙ্কন দৃশ্যে কোথাও কোথাও অস্বাভাবিকতা পরিদৃষ্ট হয়। উপন্যাসে নায়ক জীবানন্দ সম্পর্কে উপন্যাসটির প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি হচ্ছে—"জনশ্রুতি এইরূপ যে ভূতপূর্ব ভূস্বামী কালীমোহনবাবু পর্যন্ত এই লোকটির উচ্ছৃঙ্খলতা আর সহিতে না পারিয়া ইহাকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু তাহার সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে দেয় নাই।" (পরি:১, পৃ.১৬২)

বাস্তব ঘটনা হয়ত তাই ছিল কিন্তু ঔপন্যাসিকের হাতে দ্বন্দ্ব- বিরোধপূর্ণ আভাস থাকা সত্ত্বেও কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে মিলনের মধ্য দিয়ে। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য লেখক আকস্মিক, অস্বাভাবিক ও নাটকীয় ঘটনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। নায়ক জীবানন্দ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ— অত্যাচারী, অনাচারী, লম্পট, নারী- মাংসলোলুপ, মদ্যপ এবং একই সাথে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। উপন্যাসের শুরুতে প্রতাপশালী, দুর্বৃË, ভয় না মানা,

উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতি আসক্ত জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী যেভাবে আবির্ভূত হয়েছে তার তীব্রতা রক্ষায় শরৎচন্দ্র খুব বেশি সচেষ্ট ছিলেন না। বরঞ্চ তার পরিবর্তে এই পরাক্রমশালী জমিদারের চরিত্রে ধীরে ধীরে কোমলতা আরোপ করে কামুক জমিদার থেকে প্রেমিক জমিদারে রূপান্তরিত করেছেন। জীবানন্দের চরিত্রের পরিবর্তন কষ্টকল্পিত না হলেও আকস্মিক রূপান্তর এতে সন্দেহ নেই। তার মধ্যে একটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে তার রূপান্তরের সম্ভাবনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র পাঠককে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। ক্ষেত্র গুপ্ত জীবানন্দ চরিত্রের এই পরিবর্তনকে 'অনিবার্য আকস্মিক' বলে অভিহিত করেছেন।

ড. অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> ''চণ্ডীগড় হইতে ষোড়শী চলিয়া যাইবার পর দুর্দান্ত অত্যাচারী জমিদারটি যেভাবে হঠাৎ প্রজাদরদী জনসেবক হইয়া উঠিলেন তাহা মানিয়া লইতে কষ্ট হয়।'' [৯১]

এর বিপরীতে অঙ্কিত হয়েছে চণ্ডী মন্দিরের ভৈরবী ষোড়শী চরিত্রটি। যার রূপের মত চরিত্রটিও ধারালো ছুরির মতই। শরৎচন্দ্র নারী চরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত একথা সর্বজনবিদিত। তার পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি অধিকতর উজ্জ্বল। আবার নারী চরিত্রগুলির মধ্যে ষোড়শী চরিত্রটি ব্যতিক্রমধর্মী। শরৎসাহিত্যের অন্যান্য নারী চরিত্রগুলি পরিবারকেন্দ্রিক আবর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু ষোড়শী সমাজের নেতৃস্থানীয় অনন্য একটি চরিত্র। সে দরিদ্র প্রজাসাধারণের সাথে যুক্ত থেকে সমাজপতিদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। সে দেবীর মত শক্তিশালী মূর্তিতে আবির্ভূত। তার মধ্যে কোমলতার চেয়ে কঠোরতা, িস্ধতার চেয়ে দৃঢ়তা, নারীত্বের চেয়ে পুরুষোচিত ভাব প্রবল। তার চরিত্রে সূর্যের তেজ বিদ্যমান। জমিদার ও সমাজপতিদের ভয়ে সে ভীত নয়। তাইতো জমিদারের প্রমোদভবনে ঢুকতে তার বাঁধে না; রায়মশায়ের জামাতাকে প্রবল ঝড়ের হাত থেকে রাতের অন্ধকারে নদী পার করে বাড়ি পৌঁছে দিতে সংকুচিত হয় না; তার হুকুম অমান্য করে জমিদার ও সমাজপতিরা মন্দিরে ঢুকতে সাহস পায় না; জমিদার ডেকে পাঠালে সেখানে যেতে সে স্বীকৃত হয় না। তার চরিত্রের গঠন তার শারীরিক গঠনেরই প্রতিচ্ছবি। যেমন দৃঢ় তেমনি

---

[91]| H, c.222

শক্ত—“এককড়ি কহিল, বয়স তেইশ- চব্বিশ হতে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর, তো সে যেন এক কাটখোট্টা সেপাই। না আছে মেয়েলি ছিরি, না আছে মেয়েলি ছাঁদ। যেন চুয়াড়, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেছে।” (পরিঃ১, পৃ.১৬৪)

লেখক অন্য এক জায়গায় তার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> “নারীর একজাতীয় রূপ আছে যাহাকে যৌবনের অপর প্রান্তে না পৌঁছিয়া পুরুষে কোনদিন দেখিতে পায় না। সেই অদৃষ্টপূর্ব অ™ত নারী- রূপই আজ ষোড়শীর তৈলহীন বিপর্যস্ত চুলে, তাহার উপবাস- কঠিন দেহে, তাহার নিপীড়িত যৌবনের রুক্ষতায়, তাহার উৎসাদিত প্রবৃËির শুষ্কতায়, শূন্যতায়, তাহার সকল অঙ্গে অঙ্গে এই প্রথম জীবানন্দের চক্ষের সম্মুখে উদঘাটিত হইয়া দেখা দিয়াছে।” (পরিঃ৩, পৃ.১৬৮)

তার এই যৌবন কঠিন দেহের মতই তার চরিত্র কঠোর ও মজবুত। দেহ ও মনের কঠিন সংযমের ভিতর দিয়েই সে এই আZ¥িক শুদ্ধতা লাভ করেছে। তার এই শুদ্ধতা, পবিত্রতা তাকে এমন এক উচ্চে নিয়ে গেছে যেখান থেকে তার চরিত্রের মাধুর্য দর্শনে এবং সংস্পর্শে এসে জীবানন্দের মত নরাধমেরও দুর্বৃËসুলভ মনোভাব পরিবর্তন করতে হয়েছে। ষোড়শী যথার্থই চণ্ডীর ভৈরবী। নারীত্বের স্বাভাবিক বিকাশ তার চরিত্রে প্রস্ফুটিত হয়নি। কামজ প্রলোভন থেকে কখন সে উর্দ্ধে উঠে গেছে সেটা সে নিজেও জানেনা। তার দৃপ্ত উচ্চারণ—“নির্মল বাবু, আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু সংসারে সেটাই আমার বড় অপরাধ যাঁরা স্থির করে রেখেছেন, তাঁরা ভুল করেছেন। এ ভ্রম তাঁদের সংশোধন করতে হবে।” (পরিঃ১১, পৃ.২০৮)

জীবানন্দের শত আহ্বানেও সে তার জায়গা থেকে একচুল নড়েনি। জমিদারের রোগ মুক্তির পর গাঁয়ে ফিরে এসে গোমস্তাকে পাঠিয়েছিল ষোড়শীকে আনবার জন্য, জবাবে ষোড়শী ধনুক ভাঙ্গা পণের মত করে বলেছে—“বল গে এককড়ি, আমার পাল্কি চড়ার ফুরসত নেই—আমার ঢের কাজ।” (পরিঃ১২, পৃ.২১৪)

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এমন আধিপত্যবিস্তারী ও দৃঢ়চেতা ‘কাটখোট্টা সেপাই’ চরিত্রের উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে এমন আকস্মিক রমণীয় পরিবর্তন আমাদের বিস্মিত করে। যে দৃঢ়তার সাথে ভৈরবীর সম্পদ,

সম্মান, প্রেম সমস্ত কিছু সে প্রত্যাখ্যান করে শৈবাল-দীঘিতে যাত্রা করেছে ফিরে এসে জমিদারের বাহুতে আত্মসমপর্ণের মধ্যে তাকে আর আমরা খুঁজে পাই না। এ সম্পর্কে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলছেন,

> 'শেষ পরিচ্ছেদে ষোড়শী ও জীবানন্দের সাক্ষাৎকার দৃশ্যে ষোড়শী চরিত্রের যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করিলাম তাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। এ যেন ষোড়শী নামধারী আর একটি চরিত্র জীবানন্দের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" [৯২]

ক্ষেত্র গুপ্তের মতে,

> 'দেনা-পাওনায় ষোড়শীর কুষ্ঠাশ্রম থেকে জীবানন্দের কাছে আসাও ঘটনা হিসেবে আকস্মিক।" [৯৩]

শরৎচন্দ্র যে দৃঢ়তা দিয়ে ষোড়শী চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন তাতে মনে হয় ষোড়শী থাকতে চাইলে ভৈরবী পদ থেকে তাকে বিতাড়িত করা সহজ হত না। কিন্তু বাইরের কোন শক্তির কারণে নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সে বীজগাঁ ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিয়েছে। কাজের প্রতি একনিষ্ঠতা সে আর খুঁজে পাচ্ছে না। জীবানন্দের করুণামিশ্রিত মিনতিও তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ষোড়শী ভৈরবীত্ব জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করেছে। ষোড়শী যখন এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে মুক্তি লাভের জন্য উদগ্রীব ঠিক সেই সময়ে লেখক কুষ্ঠাশ্রমে তার যাবার সংবাদ দিয়েও পাঠককে চমকে দিয়েছিলেন।

ড. অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> ''ফকির সাহেবের কুষ্ঠাশ্রমে ষোড়শীর যোগ দেওয়াও একটা আকস্মিক ঘটনা।" [৯৪]

জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী ভোগী পুরুষ। একই সাথে উদাসীনও বটে। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারে তার বাধা নেই। মোটা বাঁধানো বইকে

---

[92] | H, c.225

[93] | †¶Î ¸ß, Jcb¨vwmK kirP›' P‡Ævcva¨vq, c‡ev³, c.২০০

[94] | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›'i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.229

বাতিদান করেছে, বিছানায় চাদরের অভাবে বহুমূল্যের শাল পাতা, দামী সোনার ঘড়ির উপরে আধপোড়া চুরুট, রূপার পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট হাড়গোড়, রুমালের অভাবে জরি- পাড়ের ঢাকাই চাদর—এ সবই জমিদারের উদাসীনতাকেই ইঙ্গিত করে। তার জীবনের কোন শৃঙ্খলা নেই। তার না আছে লজ্জা, না আছে কারো জীবনের প্রতি মমত্ববোধ। প্রশান্তি ও পবিত্রতার অবস্থান তার জীবনের বিপরীত মেরুতে। জীবানন্দ বলেছে—"মেয়েমানুষের ওপর আমার এতটুকুও লোভ নেই—ভাল না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জcb¥ছে।" (পরিঃ৩, পৃ.১৭০)

সুদীর্ঘ বিশ/ বাইশ বছর সম্ভোগক্লিষ্ট বহু নারীর কান্না, হাহাকার, আর্তচিৎকার যার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি এহেন জমিদার জীবানন্দের মত নিষ্ঠুর, চরিত্রহীনের পক্ষে ষোড়শীকে দেখেই মোহ জcb¥ যাওয়া অস্বাভাবিক মনে হয়। মোহ জb¥নোর জন্যে যে মনের প্রয়োজন সেই স² অনুভূতিপ্রবণ মনের পরিচয় আমরা তখনও পাইনি। সে মোহহীন তাই স্বেচ্ছাচারী। মায়া মমতা কাকে বলে সে জানে না। তার স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, সংসার নেই—cmহকরস্পর্শ লাভ যার ভাগ্যে কখনও ঘটেনি। যার চরিত্রে দুর্গন্ধ ছাড়া সুবাস নেই। এমন চরিত্রের পক্ষে এবং এমন একটি পরিবেশে ষোড়শীকে দেখেই ভোগের পরিবর্তে মোহ জb¥নো আচরণগত পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নই। আচরণগত এই পার্থক্য আকস্মিকতারই নামান্তর। এখন প্রk হচ্ছে উপন্যাসের শুরুতেই এটা কেন ঘটেছে? সে- কি ষোড়শীর প্রতি শুধুই মোহ জb¥ানোর কারণে? নাকি উপন্যাসের প্লটকে টেনে নেবার জন্য লেখকের সচেতন প্রয়াস?

উপন্যাসটির আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে আকস্মিকভাবে মুসলমান ফকিরের প্রবেশ দারুণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে যখন আমরা জানতে পারি এই মুসলমান ফকির এক সময় আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। বর্তমানে তিনি কুষ্ঠাশ্রমের মালিক এবং এই কুষ্ঠাশ্রমই ষোড়শীর শেষ আশ্রয়স্থল রূপে পরিগণিত হলে ব্যাপারটি আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। ষোড়শীকে ভৈরবী পদে রাখা না রাখার বিষয়ে যখন তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে তখনই শরৎচন্দ্র একজন আইন ব্যবসায়ী মুসলমান ফকিরকে

হাজির করেছেন ব্যারিস্টার নির্মল বসুর মুখোমুখি দাঁড় করাবার জন্যে। তর্ক বিতর্ক উপস্থাপন এবং চমৎকার কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে মুসলমান ফকির উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ষোড়শীকে ভৈরবী পদে রাখা না রাখার বিচার সভায় সে যেতে অসম্মত হলে ফকির সাহেব তাকে সম্মত করিয়ে সেখানে নিয়ে যান, ফকিরের আশ্রয়স্থলে গিয়েই নির্মল ষোড়শীর নৈকট্য লাভ করে, ফকির সাহেব ভ্রমে ষোড়শী জীবানন্দকে প্রণাম করে, ফকিরের কুষ্ঠাশ্রমই ষোড়শীর শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে এবং জীবানন্দের দেওয়া শৈবাল- দীঘি গ্রামখানি ষোড়শীর নামে রেজিস্ট্রি করতে ও নির্মলকে জীবানন্দ- ষোড়শী স্বামী- স্ত্রী এই সংবাদ জানিয়ে কাহিনিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে ফকির সাহেব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু তিনি প্লটের প্রয়োজনে যেমন হঠাৎ হঠাৎ এসেছেন আবার তেমনি হঠাৎ করে চলেও গেছেন—"তাহার একমাত্র শুভাকা• ¶ী আজ নিঃশব্দে চলিয়া গেছেন, এবং এই নীরব প্রস্থানের হেতু জগতে সে (ষোড়শী) ছাড়া আর কেহ জানে না।" (পরিঃ৯, পৃ.১৯৭)

উপন্যাসে ফকিরের উপস্থিতি সম্পর্কে কোন কোন সমালোচক নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন।

ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন,

> "ফকির সাহেবকে উপন্যাসের মধ্যে এতখানি প্রাধান্য কেন দেওয়া হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না।" [৯৫]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন,

> "ফকির সাহেবের উপন্যাসে বিশেষ কোন সার্থকতা নাই।" [৯৬]

পূর্বের আলোচনা থেকে আমাদের মনে হয় তাদের এই মত পুনর্বিচারযোগ্য।

---

[95] | H, c.229

[96] | kxKgvi e‡›'¨vcva¨vq, e½ mwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv,cbg'Y:2010-2011, c.135

শরৎ-সৃষ্ট অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেও বৃষ্টি লেখকের খুব কাজে লেগেছে। বৃষ্টি একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার, সে তার নিজস্ব নিয়মে চলে, মানুষের সৃষ্ট নিয়মে নয়। হয়ত বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু যখনই যেখানে প্রয়োজন তখনই সেখানে বৃষ্টি, তথা প্রবল ঝড় বৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক। এই উপন্যাসে ষোড়শীকে নির্মলের কাছাকাছি আনতে, হৈমর চোখের-জল ধুয়ে ফেলতে এবং উপন্যাসের সমাপ্তিতে কে-সাহেবকে বীজগাঁয়ে আসতে বাঁধা সৃষ্টির ফলে ষোড়শী-জীবানন্দের পালিয়ে যেতে বৃষ্টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে—"অকস্মাৎ দিনকয়েকের অবিশ্রান্ত বারিপাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম এমন অচল হইয়া গেল যে, অপ্রতিহত-গতি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁহার তদন্তের চাকাটাকে ঠেলিয়া আনিতে পারিলেন না।" (পরিঃ২৮, পৃ.২৮৩)

বৃষ্টি এখানে সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে যাতে তারা নিরাপদে চলে যেতে পারে এবং লেখক এক ধরনের মিলনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি টানতে পারেন।

ষোড়শী মুসলমান ফকিরের আশ্রমে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে নির্মল বসুকে দেখে বিস্মিত হয়—"প্রথমেই যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তিনি ফকিরসাহেব নহেন, রায়মহাশয়ের জামাতা ব্যারিস্টার-সাহেব।" (পরিঃ৯, পৃ.১৯৭)

ফকিরকে না পেয়ে ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মুখে পড়ে তারা। কোন পূর্বাভাস ছাড়াই এমন ভয়ঙ্কর ঝড়-জল কোথা থেকে এল তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়—"ইতিমধ্যে যে আকাশ এমন মেঘা"Qb, অন্ধকার এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিতে পারে এবং বাতাস প্রবল হইয়া ঝড় ও জলের সম্ভাবনা আসb হইয়া উঠিতে পারে, ইহা তাহার মনেও আসে নাই।" (পরিঃ৯, পৃ.১৯৮)

ঝড় ও প্রবল বর্ষণের কারণে নির্মলবাবুর চশমা উড়ে চলে যায়। বৃষ্টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ফলে ষোড়শীকে নির্মলের হাত ধরতে হয়। প্রায় অন্ধ নির্মল বসুর হাত ধরে পরিণাম ভয়হীন ষোড়শী নদী পার করে বাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এই একটি ঘটনা ষোড়শীর প্রতি নির্মলের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সাহায্য করেছে। যে হৈমর সুখের সংসার দেখে ষোড়শীর নারীত্ব

জেগেছে, সংসারের প্রতি কামনা জেগেছে, ভৈরবীত্ব বির্সজন দেবার বাসনা জেগেছে—সেই ষোড়শীকে দেখে নির্মলের ভালোবাসা জেগেছে, মনের স² কোন কোণে কামনা জেগেছে। ঝড়- বৃষ্টির রাতে বিপদসঙ্কুল পরিবেশে নদী পার করে এনে ষোড়শী তার মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। নির্মল বলছে—"আজকের এই অভিযানের স্মৃতিটা আমার চিরদিন বড় শ্রদ্ধার সঙ্গেই মনে থাকবে।" (পরিঃ৯, পৃ.২০০)

এই শ্রদ্ধাই অল্পসময়ের মধ্যে মোহের জb¥ দিয়েছে। ষোড়শীর প্রতি তীব্র আকর্ষণের কারণে একটি মাত্র চিঠি পেয়েই নির্মল স্ত্রী- সন্তান ফেলে সুদূর পশ্চিম থেকে আটশো ক্রোশ পথের ক্লেশ স্বীকার করে ষোড়শীর পক্ষে এবং শশুরের বিপক্ষে আইনি লড়াই লড়তে শ্বশুরেরই বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটার পেছনে বৃষ্টিই একমাত্র ভূমিকা পালন করেছে।

দুর্দান্ত ও পরাক্রমশালী জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে দেনা- পাওনা উপন্যাসের সূত্রপাত। এবং প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদে তার সরব এবং তীব্র উপস্থিতির মধ্য দিয়ে কাহিনির উত্তেজনা উচ্চগ্রামে আসীন। এই সময়ে তার চরিত্রটি ক্লেদাক্ত পঙ্কে নিমজ্জিত। এর পর পরই জমিদার জীবানন্দ নিরুদ্দেশের অভিযাত্রী। আবার যখন বার সংখ্যক পরিচ্ছেদে জীবানন্দ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত তখন তার চরিত্রের কোমলতা দৃষ্টে আমরা বিস্মিত। তার চরিত্রের পরির্বতন সাধনের জন্যই হয়ত লেখক মধ্যবর্তী এই সময়ের আশ্রয় নিয়েছেন। যে ফর্ম জীবানন্দ চরিত্র অঙ্কনের বেলায় গ্রহণ করেছেন সেই একই ফর্ম ষোড়শীর বেলায়ও প্রযোজ্য। অত্যন্ত সংযত ও সংযমী ষোড়শী ভৈরবীত্ব বর্জন করে কুষ্ঠাশ্রমে যাবার পর আরও তিনটি পরিচ্ছেদে কাহিনি এগোলেও তার অনুপস্থিতি এবং একেবারে উপন্যাসের শেষে আর্বিভূত হয়ে নিজেকে জীবানন্দের কাছে সমর্পণ—এ যেন ষোড়শীর পরিবর্তে অলকা সত্তার আবির্ভাব। ষোড়শী এবং জীবানন্দ উভয়ের ক্ষেত্রেই দ্বৈত সত্তা কাজ করেছে। ষোড়শীর ভিতরে অলকা সত্তা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেছে পাশাপাশি জীবানন্দের ও মনের পরিবর্তন হয়েছে বারবার। তার এক সত্তা ষোড়শীকে ভৈরবী পদ থেকে তাড়াতে চাইছে অন্য সত্তা ষোড়শীকে একান্ত আপনার করে পেতে চাইছে। এই দ্বৈত সত্তার টানাপোড়নের এক পর্যায়ে জীবানন্দ নিভৃতে ষোড়শীর

দেখা পেতে অকস্মাৎ তার কুটিরে গিয়ে হাজির হয়েছে এবং কথায় কথায় কখন রাত্রি শেষ হয়ে গেছে সে টেরও পায়নি। কিন্তু জীবানন্দ চরিত্রের সাথে এটি এতই বেমানান যে ষোড়শীর সাথে সাথে পাঠকেরও এই ঘটনার জন্য কোনরূপ প্রস্তুতি ছিল না। ষোড়শী এতই হতভম্ব হয়েছে যে সে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে মুহূর্তে পাষাণ প্রতিমায় পরিণত হয়েছে—

> ‘ষোড়শীর বিক্ষিপ্ত উ‘ভ্রান্ত চিË চক্ষের পলকে সচেতন হইয়া পরক্ষণেই আবার যেন আচ্ছb হইয়া গেল। এতবড় অলৌকিক বিস্ময় সহসা যেন সে সহিতে পারিল না। ...মুদিতচক্ষে সর্বাঙ্গ দিয়া আগন্তুকের পদতলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কম্পিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রদীপের আলোকে চাহিয়া দেখিল—ফকিরসাহেব নহেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী।” (পরিঃ১৭, পৃ.২৩২)

ষোড়শী ফকির সাহেব ভ্রমে জীবানন্দকেই প্রণাম করেছে। এই অ™ত ও অকারণ উচ্ছ্বসিত ভক্তির উপলক্ষ যে সে নয় আর কেউ এটি বুঝতে জীবানন্দের সময় লাগেনি। কিন্তু তবু সে তার হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। তার হৃদয়ের একান্ত আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তার কথায়—

> ‘‘আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে মদের কথাটাই ধরি। মরতে বসেচি—সে তো নিজের চোখেই দেখে এসেচ, কিন্তু এমন একটি শক্ত লোক কেউ নেই যে আমাকে মুক্ত করে দেয়। হয়ত আজও সময় আছে, হয়ত এখনো বাঁচতে পারি—নেবে আমার ভার অলকা?
> ষোড়শী অন্তরে কাঁপিয়া উঠিয়া চোখ বুজিল।...
> জীবানন্দ কহিল, ‘‘আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অলকা—
> আZ¦সমর্পণের এই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ষোড়শীকে চমকাইয়া দিল।” (পরিঃ১৮,পৃ.২৩৫)

পাষণ্ড জমিদারের এহেন করুণ সুর এবং আত্মসমর্পণের এমন করুণ মিনতি খাপছাড়া মনে হয়।

কিন্তু পরমুহূর্তেই জীবানন্দ তার আসল চেহারায় ফিরে আসে। এখানে আকস্মিকভাবে পাওয়া একটি ছিন্ন চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে যা জীবানন্দের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। ষোড়শী চিঠিটি লিখেছিল হৈমবতীকে কিন্তু মনমত না হওয়ায় সেটি ছিড়ে ফেলে আবার

নতুন করে লিখে পাঠিয়েছিল। ছিন্ন চিঠির একটি অংশ ঘরের ভিতর পড়ে থাকায় জীবানন্দ সেটি দেখতে পেয়ে আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে। যে চিঠিটি ষোড়শী লিখে ছিড়ে ফেলেছে তারই ছেঁড়া অংশ জীবানন্দ কুড়িয়ে পেয়ে, অংশ বিশেষ পড়েই বুঝে ফেলেছে চিঠিটি হৈমবতীকে লেখা হলেও আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে নির্মল—

> ‘‘তাহার সেই চিঠির ছেঁড়া টুকরোখানা জীবানন্দের চোখে পড়িল। হাতে তুলিয়া লইয়া সেই মুক্তার মত সাজানো অক্ষরগুলির প্রতি মুগ্ধচক্ষে চাহিয়া সে প্রদীপের আলোকে রাখিয়া সমস্ত লেখাটুকু এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। অনেক কথাই বাদ গিয়াছে, তথাপি এটুকু বুঝা গেল, লেখিকার বিপদের অবধি নাই, এবং সাহায্য না হোক, সহানুভূতি কামনা করিয়া এ পত্র যাহাকে সে লিখিয়াছে, সে নিজে যদিও নারী, কিন্তু অক্ষরের আড়ালে দাঁড়াইয়া আর এক ব্যক্তিকে ঝাপসা দেখা যাইতেছে যাহাকে কোন মতেই স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয় না।’’ (পরিঃ১৯, পৃ.২৩৮)

ফলে নির্মলের প্রতি সে প্রচণ্ড ঈর্ষা অনুভব করে। ষোড়শীর প্রতি তার আচরণ মুহূর্তে অত্যন্ত রূঢ় হয়ে যায় এবং সে তী¶ কথার খোঁচায় ষোড়শীকে বিদ্ধ করে রক্তাক্ত করে। ভালোবাসার অপর পিঠে থাকে ঈর্ষা । জীবানন্দের বেলায়ও একথা সত্যি। কিন্তু যে চিঠির ছিন্ন অংশ কুড়িয়ে পেয়ে ষোড়শী খান খান করে ছিড়ে ফেলেছে—‘‘সেই উতলা আবেগের আক্রমণ হইতে আZ¥রক্ষা করিতে পত্রখণ্ড খান খান করিয়া ফেলিয়া দিয়া শক্ত হইয়া বসিল।’’ (পরিঃ১৭, পৃ.২৩১)

সেই ছিন্ন পত্রের ছিন্ন অংশ কুড়িয়ে পেয়ে জীবানন্দের ঐটুকু পাঠ করে সমস্তকথা বুঝে ফেলা অস্বাভাবিক মনে হয়।

এছাড়া উপন্যাসে দু-একটি স্থানে অসাবধানতাবশত অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, উদাহরণ হিসেবে আমরা মুসলমান ফকিরের উল্লেখ করতে পারি। মুসলমান ফকির দীর্ঘদিন পর পর বীজগাঁয়ে এসে থাকেন তারই উল্লেখে আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে শিরোমণি মশায় বলছে—‘‘বারুইয়ের ওপর একটা বটগাছের তলায় আড্ডাঃ অনেককাল আছে—তবে মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আবার আসে। বছর-দুই ছিল না, আবার শুনচি নাকি দিন পাঁচ-ছয় হলো ফিরেচে।’’ (পরিঃ৮, পৃ.১৯১)

ঠিক তার পর পরই নয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে এসে হৈমবতীর স্বামী নির্মল বসুর প্রCkর উËরে ষোড়শী বলছে—"এবার তো প্রায় বছর- তিনেক পরে ফিরে এসেছিলেন।" (পরিঃ৯, পৃ.১৯৮)

জমিদার দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা বাবদ টাকা আদায় করেছিল। এই টাকার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক দুই জায়গায় দুই রকম বক্তব্য পেশ করেছেন। আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে ষোড়শীর বিচার সভায় উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে ফকির সাহেব—"গরীবের সবর্স্ব শোষণ করে পাঁচ হাজার টাকা (জমিদার) আদায় করে নিয়ে গেল।" (পরিঃ৮, পৃ.১৯৪)

সাতাশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে জীবানন্দ যখন প্রজাদের জন্য জল- নিকাশের সাঁকো তৈরীতে ব্যস্ত এমন সময় নির্মল তার শ্বশুরকে রক্ষায় জমিদারের সাথে কথা বলতে গেলে তাদের কথোপকথনের এক পর্যায়ে জমিদার বলে—

> "এইখানে আমি জোর করে তাদের কাছে ছ হাজার টাকা আদায় করেচি—আর সে টাকা যুগিয়েছেন জনার্দন রায়—সে শোধ করতেই হবে।...
> এই ছ হাজার টাকার ইঙ্গিত নির্মল বুঝিল না, কিন্তু এটা বুঝিল যে তাহার শ্বশুরমহাশয় অনেক পাকে আপনাকে জড়াইয়াছেন যাহা মুক্ত করা সহজ নয়।" (পরিঃ২৭, পৃ.২৮১)

এছাড়াও ষোড়শীর বয়সের হিসাবেও কোথাও কোথাও এমন অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, দেনা- পাওনা উপন্যাসটিতে বিশাল পটভূমি, বিষয় বৈচিত্র্য, চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব থাকলেও শেষ পযর্ন্ত ষোড়শী চরিত্রের পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নেতিবাচক। তার অভিযোগ— "ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েছ এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুY করেছ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারেনা,—...সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কতর্ব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেণ্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়।" [৯৭] কিন্তু লেখকের কাছে উপস্থিত কালটাও একখণ্ড ব্যাপার মনে হয়েছিল বলেই হয়ত উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বা কালোËর্ণ ব্যাপারটি তিনি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন।

---

[97] | ‡MvcvjP›‘ ivq, kirP›‘ (3q LÊÑc Îve jx), c_g cKvk: AvIvp 1376, RjvB 1969, c.263

Dhaka University Institutional Repository

পথের দাবী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ আলোড়ন সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক উপন্যাস। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে এটি ১৩৩০ থেকে ১৩৩৩ সাল পর্যন্ত ‘বঙ্গবাণী’তে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে (৩১ অগাস্ট ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) পথের দাবী গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। উপন্যাসটি ছাপানো নিয়ে অনেক জটিলতার পর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তার দুই পুত্র রমাপ্রসাদ ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার মাধ্যমে এটি আলোর মুখ দেখে—একথা শরৎচন্দ্র নিজে অনেকবার স্বীকার করেছেন। উËাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পথের দাবী প্রকাশের পর পাঠকের মধ্যে চরম উেËজনার সৃষ্টি হয়। উপন্যাসটি কেনার জন্য পাঠক হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মুদ্রিত পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হতে সাতদিনও লাগেনি। পথের দাবী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার কয়েকদিনের মধ্যেই বাজেয়াপ্ত হয়, কারণ রাজদ্রোহ ঘটাবার বিষয়বস্তু এর মধ্যে আছে বলে ইংরেজ সরকার মনে করে। এই বাজেয়াপ্তি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি এর প্রতিবাদ আশা করে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু জবাবে রবীন্দ্রনাথ যে মতামত দিয়ে শরৎচন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা সরকারের অনুক‡লই গিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন,

> ‘তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উেËজক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসb করে তোলে। ...একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।...শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না।” [৯৮]

এই চিঠির আঘাত শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন ভুলতে পারেন নি। তিনি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ১৩৩৪ সালের ১০ ভাদ্র তারিখে পত্রে লেখেন, “রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি। কোনদিন পারব বলেও ভরসা হয় না।” [৯৯]

---

[98] | ‡MvcvjP›‘ ivq, kirP›‘ (3q LÊÑc Îvejx), c_g cKvk: Avlvp 1376, RjvB 1969, c.385 -386

[99] | H, c.416

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসে পথের দাবী নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়ে আবার প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হঠাৎ করে রাজনীতি- নির্ভর উপন্যাস লেখার জন্য হয়ত সেই ২৩/ ২৪ এর উËাল সময়টা দায়ী। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন বলতে ১৯২০ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়েছিলেন। চিËরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।[১০০] তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য এবং কয়েক বছরের জন্য হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।[১০১] রাজনীতির আলোচনায় যোগ দেওয়া প্রত্যেক দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। সেই সময়ে স্বাধীনতার আন্দোলনই ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা ছিল পরাধীন দেশের স্বাধীনতার আকা•¶ায়, দুর্গত শোষিত দেশবাসীর মুক্তির কামনায়।

রাজনৈতিক উপন্যাস পথের দাবী শরৎচন্দ্রের হঠাৎ করে লেখা মনে হলেও এর প্রস্তুতি দীর্ঘকালের। 'পথের দাবীর মাল- মসলা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করে।'[১০২] অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, বিভিb বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সব রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে প্রকাশিত পথের দাবী জনমানসে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তৎকালে রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আরও যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এর উল্লেখ না করলেই নয়। এটিকে বাদ দিলে এবং জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের পথের দাবী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক উপন্যাস এতে সন্দেহ নেই।

100| ï×mË em, kir mgx¶v, wØZxq g'Y: Avlvp 1384, c.147
101| m'xc em, D™vwmZ kirP›'':c‡Î I mvgwqK c‡Î, c_g cKvk: RjvB 2000, kveY 1407, c.181
102| H, c.296

পথের দাবী উপন্যাসে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক মর্যাদার বিষয়গুলি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করা হয়েছে। পথের দাবী উপন্যাসের রাজনৈতিক অংশের নায়ক সব্যসাচীর বিপ্লবের বর্জ্রনির্ঘোষ যেমন চিত্রিত হয়েছে পাশাপাশি এর সামাজিক অংশের নায়ক অপূর্বকে তেমনি ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ করে অঙ্কন করা হয়েছে। উভয় অংশের সেতুবন্ধক ভারতী অহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতী। প্রবল ব্যক্তিত্বশালী- চরিত্র সব্যসাচীর সাথে তুলনার জন্যই হয়ত ভীরু, দুর্বল অপূর্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বঙ্গদেশ, ভারত ও সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নেতা সব্যসাচী চীনের বিপ্লবী নেতা সান ইয়াৎ সেন থেকে শুরু করে দেশের বিপ্লবী নায়কদের নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করছেন, অথচ অপূর্ব সেই সব্যসাচীকে সামান্য স্বার্থের কারণে পুলিশের কাছে তার গোপন আস্তানার ও কর্মকাণ্ডের সন্ধান দিয়েছে।

উপন্যাসের প্রারম্ভে আমরা দেখি শরৎচন্দ্রের মত অপূর্বও জীবনের শুরুতে চাকুরির উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করে। বর্মাতে বসবাসকালে যত বিপর্যË তার সূত্রপাত প্রথম দিন থেকেই। অপূর্ব বোথা কোম্পানির ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে চাকর তেওয়ারীকে সাথে করে যেদিন বর্মা আসে সেদিন খৃস্টানদের কোন পর্ব- দিন ছিল। অফিস থেকে তাদের জন্য যে বাসাটি ভাড়া করা হয় তার তৃতীয় তলার বাসিন্দা জোসেফ নামের এক খৃস্টানের সঙ্গে প্রথমদিনই তেওয়ারীর বাদানুবাদ হয়। মদ্যপ জোসেফ তেতলার কাঠের মেঝেতে পানি ঢালায় সেই পানি অপূর্বদের ছাদ বেয়ে এসে সমস্ত জিনিস নষ্ট করে দেয়। তেওয়ারী গোরা সাহেব বিবেচনা না করে লাঠি হাতে এর প্রতিবাদ জানায়। অপূর্ব তখন বাসায় ছিল না। নির্বিেN বর্মা পৌঁছানোর সংবাদ মাকে জানাতে টেলিগ্রাম অফিসে গিয়েছিল। ফিরে এসে তেওয়ারীর কাছে সমস্ত ঘটনার অনুপু•L বর্ণনা শুনে সেও লাঠি হাতে প্রতিবাদ জানাতে তেতলায় যায়। পরদিন জোসেফ তার মেয়েকে সাথে নিয়ে থানায় অভিযোগ জানায়। ফলে অপূর্বকে আদালতে বিশ টাকা জরিমানা দিতে হয়।

অন্য একদিন তেওয়ারী দেশি লোকের সাথে ‘ফয়ায়’ বর্মা নাচ দেখতে গেলে তাদের বাসায় চুরি হয় এবং সেই সুবাদে খৃস্টান জোসেফের মেয়ে

ভারতীর সাথে অপূর্বর পরিচয় হয়। কিন্তু ভারতীর শঠতা ও ছলনা ইতোপূর্বে তাকে এতটা ক্ষিপ্ত করেছিল যে চোরের সহায়তাকারী সন্দেহে অপূর্ব থানায় নালিশ করতে যায়। সেই সময়ে পথে তার বাবার বন্ধু পুলিশের বড়কর্তা নিমাইবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা জানাতে নিমাইবাবুকে দেশ ছেড়ে ব্রহ্মদেশে আসতে হয়েছে তাকে কাছ থেকে দেখার লোভে অপূর্ব তার সঙ্গী হয়। থানায় গিরীশ মহাপাত্ররূপী ছদ্মবেশধারী পলিটিক্যাল সাসপেক্ট, পিনাল কোডের কোহিনুর সব্যসাচীর সঙ্গে অপূর্বর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। চিনতে না পেরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়—

> ‘‘অত্যন্ত ফরসা রং রৌদ্রে পুড়িয়া যেন তামাটে হইয়াছে। বয়স ত্রিশ- বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু ভারী রোগা দেখাইল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। সহসা আশঙ্কা হয়, সংসারের মিয়াদ বোধ করি বেশী দিন নাই; ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অ™ত দুটি চোখের দৃষ্টি। জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন।’’ (পরি:৬, পৃ.৩১)

অপূর্বর অফিসের বড় সাহেব তাদের ভামো কার্যালয়ের বিশ•Lলা ঠেকাতে এবং ম্যানডাল, শোএবো, মিKথিলা এবং প্রোম অফিসের শ•Lলা ফিরিয়ে আনতে তাকে সেসব স্থান পরিদর্শনে যেতে বলে। বিশ/ পঁচিশ দিন অপূর্ব এ- সব অফিস পরিদর্শন শেষে বর্মায় ফিরে এসে দেখে ভারতীর পিতা- মাতা মৃত এবং তেওয়ারী বসন্তরোগে মৃতপ্রায়। ভারতী দিন- রাত তেওয়ারীর সেবা করে তখনও তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু অপূর্ব ফিরে এসে কৃতজ্ঞতা জানানোর পরিবর্তে যেসব কথা বলে তাতে ভারতী অপমানের বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। অপূর্ব বলে ভারতীর হাতে জল খাওয়ার কারণে তেওয়ারীর প্রায়শ্চিË করতে হবে— ‘দেখুন আপনি আমাদের জাতও নয়, সমাজেরও নয়, জলটুকু পর্যন্ত নেওয়া যায় না, ছোঁয়াছুঁয়ি হলে কাপড়খানি অবধি ছেড়ে ফেলতে হয় এত তফাত।’’ (পরি:৯, পৃ.৪৮)

দেশে মা তার জন্য বারব্রত জানা, বিচার- আচার জানা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে পছন্দ করে রেখেছে, যখনই চিঠি লিখবে তখনি ফিরে গিয়ে মায়ের আদেশ পালন করবে—এমনই সঙ্কল্প লালনকারী অপূর্বর প্রতি

অভিমানে ভারতী পরদিন ভোরবেলায় উঠেই চলে যায়। আর মাসখানেক তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।
ভারতীর সন্ধান করতে গিয়ে অপূর্ব পথের দাবীর খোঁজ পায় এবং ভারতীর কথায় সে পথের দাবীর সভ্যদের তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করে।

ভারতী জানায় পথের দাবীর মন্ত্র মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী আদায়; যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজb¥ যেন নিরুপদ্রবে হাটতে পারে, তাদের অবাধমুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে।

এখানে বিপ্লবী দলের সদস্য—পথের দাবীর প্রেসিডেন্ট একলা পৃথিবী ঘুরে আসা বিদুষী সুমিত্রা, প্রেমিক ও গায়ক শশীকবি, স্বামী ছেড়ে দেশের কাজ করতে আসা নবতারা, মগ দেশের ব্রজেন্দ্র, সরকারি লোক হীরাসিং, সর্বোপরি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী—সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী ডাক্তার সব্যসাচীর সঙ্গে অপূর্বর পরিচয় হয়। ঘটনাক্রমে সেদিন অপূর্ব আর বাসায় ফিরে যেতে সক্ষম হয় নি ভারতীর কাছেই তাকে থাকতে হয়। পরদিন তাদের সমাজ সংস্কারের অংশ হিসেবে কারিগর ও মজুরদের বস্তি পরিদর্শনে যেতে হয়।

ফয়ার মাঠে আহুত পথের দাবীর সভায় লোকজন বেশি না হলেও অপূর্ব বক্তৃতা দেবার একটা সুযোগ পায়। পরের শনিবারে আবার সভা আহুত হয়। একটা রোজ কামাই করে শ্রমিকরা ফয়ার মাঠে আবার হাজির হবে সুমিত্রার কথা শোনার জন্যে। তাদের বিশ্বাস তাঁর উপদেশের মধ্যে এমন কিছু থাকবে যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় দিনমজুরের দুঃখের কপাল রাতারাতি একেবারে ভোজবাজির মত সৌভাগ্যের দীপ্তিতে রাঙা হয়ে উঠবে।
সভা আহুত হলে অপূর্ব তার অফিসের অধস্তন কর্মচারী রামদাস তলওয়ারকরকে নিয়ে হাজির হয়। সভা চলাকলে বিশ- পঁচিশ জন গোরা পুলিশ কর্মচারী এসে মিটিং বন্ধ করতে বলে। সুমিত্রা জানায় ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মত এদের দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়াই এই মিটিং এর উদ্দেশ্য।

গোরা ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী তাদের দশ মিনিট সময় দিয়ে দু'চার কথায় মিটিং শেষ করে শান্তভাবে শ্রমিকদের বিদায় করতে বলে। সুমিত্রা অসুস্থ থাকায় অপূর্বকে বলে চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিতে যে স•Nবদ্ধ না হলে এদের বাঁচবার উপায় নেই। কিন্তু অপূর্ব ভীত হয়ে পড়ে। ফলে রামদাস তলওয়ারকর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে বলে—তারাও যে মানুষ! তাদের মনুষ্যত্বের অধিকার কেউ আটকে রাখতে পারবে না, তাদের পরিশ্রমে যা কিছু উৎপb হয় তারাও তার সমভাগী—এসব জানানোর ফলে সে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার হয়। এই সংবাদ দেওয়ার জন্য অপূর্ব ভারতীকে সাথে নিয়ে তলওয়ারকরের বাসায় যেতে চাইলে সব্যসাচী নিষেধ করে, ফলে অপূর্ব তাকে ভুল বোঝে।

সব্যসাচীকে ভীরু, ছদ্মবেশী, তলওয়ারকরের পদধূলির যোগ্য নয় ইত্যাদি বলে অপমান করার চেষ্টা করলে ভারতী তাকে বেরিয়ে যেতে বলে। ডাক্তার তাতে বাধা দেয়। কিছুক্ষণ পর বিপ্লবী ব্যারিস্টার কৃষ্ণ আইয়ারের সঙ্গে রামদাস ভিতরে ঢুকে সব্যসাচীর পদধূলি গ্রহণ করে। অপূর্বর কাছে এই সমস্ত বিষয় অচিন্ত্যনীয়, অত্য™ত, দুঃস্বcের মত বোধ হয়। সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং পরদিন পুলিশের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে দেয়।

বোথা কোম্পানি রামদাসকে ডিসমিস করে। ফলে পথের দাবীর গোপন সভায় অপূর্বকে কৌশলে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই সংবাদে ভারতী মুর্ছিত হয়ে পড়ে। দলের ভিতর বিদ্রোহ হবে জানা সেËও ডাক্তার ভারতীর ভালোবাসার মানুষটিকে মুক্তি দেয়। যে ভারতী প্রাণ ফিরিয়ে দিল তার প্রতি অপূর্বর কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। তার যাবতীয় কষ্ট পাঁচশো টাকা দামের মূল্যবান চাকুরিটা হারানো এবং দড়ি দিয়ে বাঁধার ফলে হাতের কালশিটে দাগ!

প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অপূর্ব একদিন পরেই কলকাতাগামী জাহাজে চড়ে বসে। বাড়িতে পা দিয়েই আবার ফিরতি জাহাজে সে রেঙ্গুন আসতে বাধ্য হয়। কারণ ইতোমধ্যে তার মা 'ব্যাটা'দের সঙ্গে কলহ করে বর্মার

জাহাজে চড়েছে। সরাইখানায় নিউমোনিয়া জ্বরে আকস্মিকভাবে তার মায়ের মৃত্যু হয়। মা- ভক্ত অপূর্ব বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। অপূর্বর মায়ের মৃত্যুর সংবাদ ভারতী জানত না বিধায় অভিমানে দূরে সরে থাকে। যে ব্যক্তি হৃদয়ের সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না, যার কাছে মনুষ্যত্বের কোন মূল্য নেই, সংস্কারবোধই যার কাছে জীবনের চেয়ে বড় এমন লোকের সাথে সে হয়ত সম্পর্ক রাখতে চাই নি। তারপরও মায়ের মৃত্যু- সংবাদ পাবার পর সমস্ত মান- অভিমান বিসর্জন দিয়ে ভারতী অপূর্বকে তার কাছে আশ্রয় দেয়। অপূর্ব চরিত্রের পরিবর্তন আসে। সে দেশের কাজে, দীন দরিদ্রের কাজেই আZ¦নিয়োগ করবে বলে মনস্থির করে।

এদিকে পথের দাবীর সভ্য শশী ও নবতারার বিয়ের কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে নবতারা শশীর সঙ্গে প্রতারণা করে। তার দেওয়া টাকা নিয়ে কুট সাহেবের মিলের টাইম- কিপার আহমদ নামক এক যুবককে বিয়ে করে চলে যায়। ডাক্তারের আফসোস শশী যদি নবতারাকে ভালো না বেসে তার ল্গেহের ভারতীকে ভালোবাসত!

বিরহ বেদনায় কাতর কবি শশীকে ডাক্তার সামাজিক বিপ্লবের গান করতে বলে। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রুঃ তাকে ভেঙ্গে ফেলার মহাসত্য মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করতে বলে। এদিকে সুমিত্রা তার মায়ের খুড়োর অগাধ সম্পËির উËরাধিকারী হয়ে জাভায় ফিরে যেতে চায়। অপূর্বর মৃত্যুদণ্ড নিয়ে গুপ্ত সমিতির সদস্যদের ভিতরে যে চাপা ক্রোধ দানা বাঁধে তারই ফলে ব্রজেন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করে বলে ডাক্তার জানায়—

> “সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লব এবং ক্রুগার তার পাঠিয়েছে, ...জ্যামেকা ক্লব ভোর রাত্রে পুলিশ ঘেরাও করে,—তিনজন পুলিশ আর আমাদের বিনোদ মারা গেছে। দুই ভাই মহতপ ও সূর্যসিংহ একসঙ্গে ধরা পড়েছে। অযোধ্যা হংকঙে,—দুর্গা, সুরেশ পেনাঙে,— সিঙ্গাপুরের জ্যামেকা ক্লবের জন্যে পুলিশ সমস্ত শহর তোলপাড় করে বেড়াচ্চে।” (পরিঃ৩০, পৃ.১৭৬)

শশী জানায় এতবড় পৃথিবী জোড়া শক্তিমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের চেষ্টা করা শুধু নিষ্ফল নয়, পাগলামি। কিন্তু ডাক্তার তার স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় অটল। তার পথের দাবী চাষা হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। চাষার কুটিরে তাকে পাওয়া যাবে না—তার সন্ধান মিলবে কুলি মজুর কারিগরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারাকে। ডাক্তারের উপলব্ধি শিক্ষিত ভদ্র জাতির চেয়ে লাঞ্ছিত, অবমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ বাঙলা দেশে আর নেই। আইডিয়ার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে শিক্ষিত ভদ্র- সন্তান, অশিক্ষিত কৃষকে পারে না। ডাক্তারের তপস্যায় আ Z ¦বঞ্চনার অবসর নেই। তার তপস্যা সাঙ্গ হবার মাত্র দুটি পথ খোলা আছেঃ এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।

সেই স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে ভাঙ্গাদল পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এবং আপাতত জ্যামেকা ক্লাবের যে অংশটা সিঙ্গাপুরে আছে তাকে বাঁচাতে এবং বিদ্রোহী ব্রজেন্দ্রকে শাস্তি দিতেই পৃথিবী ওলট- পালট করা ঝড়- বৃষ্টির ভিতরে ডাক্তারের বিদায় নেওয়ার দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি।

দুই

'পথের দাবী' উপন্যাসের পটভূমি সুবিস্তৃত। চায়না, পেনাঙ, বর্মা, সিঙ্গাপুর, জাভা, জাপান—এই সমস্ত স্থানে পরিচালিত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড এবং সশস্ত্র সংগ্রামের নায়ক সব্যসাচী—যার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা। শরৎচন্দ্র ভারতের ইংরেজ রাজশক্তিকে তীব্র ঘৃণা করতেন এবং সেই ঘৃণা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করবার রাজনৈতিক প্রেরণা তার ছিল।[১০৩] পরাধীন দেশের প্রতিটি মানুষেরই কাম্য ছিল মুক্তি। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় শরৎচন্দ্র যে নায়ক নির্মাণ করেছেন তা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অবিশ্বাস্য। এটি শুধু বাস্তবে নয় কল্পনায়ও প্রায় অসম্ভব।

সব্যসাচী সর্বভাষা- ভাষী সর্বজাতি- উর্ধ্ব অনন্য ব্যক্তিত্ব। ভারতীর ভাষায়, পৃথিবীতে যা কিছু জানা যায় তিনি জানেন, যা কিছু পারা যায় তিনি পারেন। তার অসাধ্য ও অজ্ঞাত সংসারে কিছুই নেই। ভারতীর শ্রদ্ধা, তিনি চলে গেলে মনে হয় পথের ধূলোয় পড়ে থাকি, তিনি বুকের উপর দিয়ে হেটে যান। তিনি মূল- শিকড়। মাটির তলায় থাকেন, তার কাজ চোখে দেখা যায় না। পুলিশের বড়কর্তা নিমাইবাবুর ভাষায়—

> 'ছেলেটি দশ- বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারী পাস করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারি পাস করেচে, বিলেতে আইন পাস করেচে, আমেরিকায় কি পাস করেচে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,—...বাপ রে বাপ! আমরাও ত এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জbালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!" (পরিঃ৬, পৃ.২৮)

উËাল রাজনৈতিক সময়ের জনমানসের বাধভাঙ্গা কল্পনার নায়ক সব্যসাচী। তিনি একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজ্ঞ হওয়া সেËও দুই হাতে সমানভাবে পিস্তল চালনায় দক্ষ—লক্ষ্য অব্যর্থ। ক্ষীণকায় হলেও গায়ে শক্তি অসুরের মত। তার দৃষ্টি ঈগলের মত তীক্ষ্ণ, অন্ধকারে দর্শন ক্ষমতা প্যাঁচার মত শক্তিশালী। তার ধৈর্য অসীম, সাহস অবর্ণনীয়।

---

[103] | k¨vgm›'i e‡›'¨vcva¨vq, kir-‡PZbv, c_g cKvk: Awkb 1374, c.296

ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি পারেন না সংসারে এমন কাজ বিরল। অলৌকিক এই চরিত্রটি সবার শ্রদ্ধায় মহিমান্বিত হয়েছে—"শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ভারতীর দুই চক্ষু যেন সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তাঁর কথা থাক অপূর্ববাবু। পরিচয় দিতে গেলেই হয়ত তাঁকে ছোট করে ফেলবো।" (পরিঃ১১, পৃ.৫৭)

শুদ্ধসË বসুর মতে,

> "সব্যসাচীকে আমরা তার কর্মের মধ্যে ততটা ব্যপৃত দেখিনা, যতটা দেখি অন্যের শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে।" [১০৪]

ভারতবর্ষের ও উপন্যাসের প্রতিটি মানুষের সুখের দায়িত্ব তিনি নিলেও নিজের সুখের দিকে কখনও ফিরে তাকান নি। সবার হৃদয়ের তË্ব তার জানা। ভারতীর মন বুঝতে পেরে তিনি অপূর্বকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সুমিত্রার প্রতি ব্রজেন্দ্রের কামনার দৃষ্টি ছিল বলে তিনি বুঝতে পেরেছেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে তাকে শাস্তি দিতে সিঙ্গাপুর যাত্রা করেছেন। দুর্বল অপূর্ব একমাত্র ডাক্তারেরই সহানুভূতি লাভ করেছে বারবার। সে যে আবার ভারতীর কাছেই ফিরে আসবে এ তËও তার জানা। শশীকে শশী বলে চিনিয়েছেন ডাক্তার। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ এদের বিকাশের জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন, এই সত্যও তিনি শশীকে জানিয়েছেন। সবার অবহেলা সত্ত্বেও ডাক্তার শশীকে বলেছেন—"তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী। রাজনীতির চেয়ে তুমি বড় একথা ভুলো না। তোমার পরিচয়ই তো জাতির সত্যিকার পরিচয়।" (পরিঃ২৮, পৃ.১৬৩)

হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু জানা সত্ত্বেও সব্যসাচী নিজের চৈতন্যকে কখনও আচ্ছb হতে দেননি। তাইতো সুমিত্রা ভয়ানক রূপের অধিকারী ও বিদুষী হওয়া সত্ত্বেও এবং ডাক্তারকে সমস্ত চিË দিয়ে ভালোবাসলেও তার ভালোবাসার যথাযথ মর্যাদা তিনি দিতে পারেন নি।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে,

> "সব্যসাচী অতিমানব বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন।" [১০৫]

---

[104] | ï×mË em, kir mgx¶v, c‡ev³, পৃ.১৫২

[105] | m‡evaP›‘ †mb¸ß, kirP›‘, mß‘k ms¯‹iY: AMnvqY 1407, c.89

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> ‘‘সব্যসাচীর মত এমন একজন অ™তকর্মা, নির্বিকার লৌহমানব কোb বিশ্বকর্মার শিল্পশালায় নির্মিত হইয়াছিল, কী তাহার মানবিক পরিচয় তাহা আমরা জানি না।’’ [১০৬]

লেখক কঠিন করে সব্যসাচীকে অঙ্কন করতে চাইলেও তার কোমল হৃদয়ের aŸনি সমগ্র উপন্যাস জুড়ে ব্যক্ত। বজ্রকঠিন বহিরাবরণের ভিতরে কোমল শাঁস বিদ্যমান। অপূর্বর প্রতি সহানুভূতি, ভারতীর প্রতি cmহানুভূতি, শশীর প্রতি ভালোবাসায় তা পরিস্ফুট।

গুপ্তসমিতির সদস্যদের মধ্যে খাঁটি দেশপ্রেমিক সব্যসাচী। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ও ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে সব্যসাচী তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করে। দেশের মানুষের মুক্তি ভিb তার আর কোন চাওয়া নেই। অথচ দলের ভিতরে কারো মত প্রকাশের স্বাধীনতাও নেই। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তার একার। তিনি যাকে অভয় দেন তাকে স্পর্শ করা যায় না। উËর চীনের সেক্রেটারী আহমেদ দুরানীর মৃত্যুর পর ক্যানটনের গুপ্তসভায় কঠিন দুটো আইন পাশ হয়েছিল— সব্যসাচীর আড়ালে তার কাজের সমালোচনা চলবে না এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা মারাZ¥ক অপরাধ। ব্রজেন্দ্র তাই করেছে। সুরাভায়ায় ব্রজেন্দ্র একবার তাকে হত্যার চেষ্টা করে—অপূর্বর বিচারের দিন আর একবার; অথচ তা সËও সে দলে থাকে কি করে? দলপতিকে হত্যা-চেষ্টার পরও প্রতিটা গুপ্তসমিতির সভায় সে উপস্থিত।

সব্যসাচী চরিত্রের অসঙ্গতির ব্যাপারে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলছেন,

> ‘‘ডাক্তার পথের দাবীর স্রষ্টা, তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষের পায়ে চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার সমিতিতে দেখিতে পাই, এই আদর্শ কোথাও চলে না। যাহারা সমিতির শত্রু তাহাদিগকে হত্যা করিবার অধিকারের পk না তুলিয়াও দেখিতে পাই যে সমিতির অভ্যন্তরেও কাহারও স্বাধীনতা নাই।’’ [১০৭]

---

[106] | kxKgvi e‡›‘¨vcva¨vq, e½ mwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, cbg‘Y:2010-2011, c.150

[107] | m‡evaP›‘ †mb¸ß, kirP›‘, c‡ev³, c.94

সব্যসাচী বিস্ময়কর চরিত্র হলেও তার জীবনের পুরো রহস্য উচ্চাচিত হয়নি। এমনকি তার কর্মপদ্ধতিও পুরোপুরি জানা যায়নি। কেনই- বা তিনি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেনই- বা স্বাধীনতা অর্জন মুলমন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও নানা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুপ্ত সমিতি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে, একা একজন মানুষের পক্ষে তা কি করে সম্ভব? পাহাড় ডিঙিয়ে, সাগর পেরিয়ে তিনি যে বিশেষ উদ্দেশ্য গঠনের ব্রত নিয়ে বর্মা এলেন সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের কোন সক্রিয় কর্মকাণ্ড উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় নি।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে,

> ‘‘আর একটি অসঙ্গতিও লক্ষ্য করিতে হইবে। সব্যসাচী ১৯১১ সালে টোকিওতে বোমা নিক্ষেপে লিপ্ত ছিলেন; তাহার ষড়যন্ত্রের জাল পিনাং, চায়না, সিঙ্গাপুরে বিস্তৃত হইয়াছে; কর্মসূত্রে তিনি সেলিবিস, প্যাসিফিকের দ্বীপগুলি পরিদর্শন করেন এবং আমেরিকাতেও যাইতে পারেন। এই সকল জায়গায় গুপ্তসমিতির সঙ্গে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অর্জনের সম্পর্ক কোথায় তাহা কোথাও উল্লেখিত হয় নাই। ...সিঙ্গাপুর বা সাংহাই জ্যামেকো ক্লাবের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংযোগ কোথায় তাহা কোথাও বর্ণিত হয় নাই। কেনই বা সব্যসাচী বিদেশে গুপ্তসমিতির জাল বুনিতেছেন তাহাও বুঝা যায় না। একবার মাত্র তিনি নিজে এই অসঙ্গতির রহস্য উ˜Nাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।’’ [১০৮]

আর যে পথের দাবীর কথা বলা হচ্ছে, তার প্রতিষ্ঠাতা তো তিনি নন, সুমিত্রা। এই দলের বিশেষ কিছু জানেন না বলে তিনি দাবী করেছেন। অপূর্বর মতামত না নিয়ে তাকে সদস্য করে নেওয়া হল কেন তার জবাবে ডাক্তার—

> ‘‘একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, মেয়েরা একটা ব্যাপার করেছেন, তাঁরাই জানেন কাকে মেম্বর করবেন এবং কাকে করবেন না। আমি হঠাৎ জুটে গেছি মাত্র। বাস্ত বিকই আমি এঁদের সভার বিশেষ কিছু জানিনে অপূর্ববাবু! ...পথের- দাবী নাম দিয়ে সুমিত্রা এই ছোট্ট দলটির প্রতিষ্ঠা করেচেন। জীবন- যাত্রায় মানুষের পথ চলবার অধিকার যে কত বড় এবং কত পবিত্র এই মস্ত সত্যটাই মানুষে যেন ভুলে গেছে। ...সুমিত্রা অনুরোধ করলেন আমি যে কয়দিন এখানে আছি তাঁর দলটিকে যেন গড়ে দিয়ে যাই।’’ (পরিঃ১২, পৃ.৬৭)

---

[108] | H, c.95

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তার আরও এক জায়গায় বলেছিলেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনারা হলেন সমাজ সংস্কারক, কিন্তু আমার সমাজ সংস্কার করে বেড়াবার সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই।' অথচ সুমিত্রার অনুরোধ রক্ষার্থে এই সমাজ সংস্কারক দলটিকে গড়ে দেবার পরিবর্তে ডাক্তারের কল্যাণে পথের-দাবী কয়েক দিনের ভিতরে গুপ্ত সমিতি হয়ে ওঠে। সমাজ সংস্কারক কোন সমিতি কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে না। তার পরও অপূর্বর বিশ্বাসঘাতকতায় গুপ্ত সমিতি হয়ে-ওঠা পথের-দাবী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, আবার ডাক্তার একক সিদ্ধান্তে তাকে মুক্তি দিয়েছে। এর কিছুদিন পরে ডাক্তার বলছে—"পথের-দাবী চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র।" (পরিঃ৩১, পৃ.১৮১) জন-কতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্যে পথের-দাবী তিনি সৃষ্টি করেননি। আসলে পথের-দাবী কী লেখক সেটা পরিষ্কার করে বলেন নি।

শুদ্ধসË বসুর মতে,

> "পথের দাবীতে লেখকের মূল বক্তব্য যে কি—তার স্পষ্ট পরিচয় কোথাও নেই, সারা ভারতবর্ষ এবং সুদূর প্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া—সব দেশেই সব্যসাচীর কাজ ও কৃতিত্ব ব্যপ্ত, বিভিb দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে। সেই বিপ্লবের চেহারা কি রকম—তার স্বরূপ কি—সে বিষয়ে পাঠককে অজ্ঞ রাখা হয়েছে, এমন কি বিভিb দেশের সঙ্গে যে বৈপ্লবিক যোগসূত্রের কথা বলা হয়েছে, তার কার্যকারণ সূত্রের যোগবিন্দুটি কি—তা ব্যক্ত করা হয় নি। বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপের মধ্যে যে অতি নাটকীয়তা আছে—তা বহু সময়ই মনে হয়েছে কাল্পনিক, বাস্তবভিË‍িক নয়।" [১০৯]

এই উপন্যাসের প্রধান বিষয় অত্যাচারিত, শাসিত, শোষিত, নিষ্পেষিত দেশবাসীর মুক্তি স্বরূপ দেশের স্বাধীনতা। ইংরেজ অত্যাচারের যে-রূপ চিত্রিত হয়েছে তা কেউ মেনে না নিতে পেরে যদি স্বাধীনতা চায় তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। খৃস্টান গোরা সাহেবের অত্যাচারের পরও শাস্তি হয়েছে অপূর্বর। রেল স্টেশনের বেঞ্চে বসবার ফলে অপূর্বকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে এবং স্টেশন মাস্টার স্টেশন থেকে বের করে দিয়েছে। রামদাস তলওয়ারকর বিনা দোষে দুই বছর জেল খেটেছে,

---

[109] | ï×mË em, kir mgx¶v, c‡ev³, c.150

মারের দাগ এখনও তার পিঠে জ্বাজল্যমান। তাইতো তাদের বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়াটা সহজ হয়েছে। অপূর্ব বলেছে—

> “আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, ফরাসী নই, আমেরিকান নই,—কোথায় পাবো আমরা অপ্রতিহত গতি? স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসবার আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ করবার পথ নেই, ...—ফিরিঙ্গি ছোঁড়াদের বুটের আঘাত হইতে স্টেশন মাস্টারের বাহির করিয়া দেওয়া অবধি সকল অপমান স্পষ্ট অনুভব করিয়া তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বসলে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়,—আমরা যেন মানুষ নই! আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্ত- মাংস গায়ে নেই! এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আমি আছি আপনাদের দলে।” (পরিঃ১১, পৃ.৫৬)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> “পথের দাবী সম্পর্কে অভিযোগ দুটি—সব্যসাচী- চরিত্রের অস্বাভাবিকতা আর উপন্যাসের মূলধন রূপে ইংরেজ- বিদ্বেষের ব্যবহার। এই দুটি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে পথের দাবীর শিল্পমূল্য কমে যায়, তাতে সন্দেহ নেই।” [১১০]

সুমিত্রা পথের দাবীর প্রেসিডেন্ট। তার আসল নাম রোজ দাউদ। সুমিত্রার পিতা বাঙালি, মা ইহুদী। সে চোরাকারবারীর সঙ্গে জড়িত ছিল। সমস্ত পৃথিবী একাই ঘুরে এসেছে, তার মত বিদুষী ও বুদ্ধিমতী আর কেউ নেই। সে ভয়ানক রূপের অধিকারী। অপূর্বর মতে—

> “নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালনা করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজরানী! বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরনে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা, হাতে গাছকয়েক করিয়া সোনার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোনার হারের কিয়দংশ চিকচিক করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরী দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন আর খুঁত নাই,—একি ভয়ানক আশ্চর্য রূপ!” (পরিঃ১১, পৃ.৫৮)

---

[110] | Ai“YKgvi g‡Lvcva¨vq, kirP›' cbwePvi, c_g †'ÖR ms¯‹iY:KwjKvZv c¯K ‡gjv, Rvbqvix 2001, gvN 1407, c.92

সব্যসাচীর সঙ্গে হঠাৎ একদিন 'তেগ' স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে তার পরিচয়। এর বছরখানেক পরে 'বেঙকুলান' শহরের জেটিতে এক তোরঙ্গ আফিংসহ সে ধরা পড়লে নিজ স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে ডাক্তার তাকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করে। এরপর থেকে সে তার সঙ্গেই আছে। ডাক্তারের কাজে ভর্তি করে নেবার জন্য সে তাকে অনুরোধ করে। কিন্তু ডাক্তার সবসময় নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখেছে। চোরাকারবারী এক ভিনদেশি নারী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রে চলে এসেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সুমিত্রার যোগাযোগ অস্বাভাবিক ও আরোপিত মনে হয়। তাই যদি না হবে তবে ডাক্তারকে না পেয়ে সে উËরাধিকাররূপে প্রাপ্ত সম্পাËি ভোগ করার জন্যে জাভা ফিরে যাবে কেন? তখনও তো ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি!

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের জিজ্ঞাসা ভারতবর্ষের সঙ্গে সুমিত্রার সংযোগ কোথায়?

> 'তাহার (সুমিত্রার) চরিত্রের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা গ্রন্থকারের সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, কিন্তু মনে হয় পথের দাবীর ইতিহাসে তাহার অভ্যাগম একেবারে আকস্মিক এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাহার কোন আন্তরিক যোগ নাই।'' [১১১]

সুমিত্রা চরিত্রের অসঙ্গতি এখানে যে, কাহিনির শুরুতে তাকে যত বড় করে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, শেষে আর সেই সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। তার কোন কর্মকাণ্ড সমগ্র উপন্যাসে পাওয়া যায় না। একমাত্র ডাক্তারকে ভালোবাসা ছাড়া গ্রন্থমধ্যে তার যেন আর কোন কাজ নেই। নির্মম মৌনতা, কঠোর ঔদাসীন্য, প্রখর ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তাকে কেমন যেন নিষ্প্রভ মনে হয়েছে, তার চেয়ে বরঞ্চ ভারতীকে অনেক বেশি উজ্জ্বল করে অঙ্কন করা হয়েছে।

এই উপন্যাসে অন্য অনেক চরিত্রের চাইতে ভারতী চরিত্রটি অধিকতর স্বাভাবিক ও সুগঠিত। কিন্তু দু'একটি জায়গায় কিছু পkবোধক চিহ্ন রয়েই যায়। ভারতী কোন এক রাজকুমার ভট্টাচার্যের কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর

---

[111] | m‡evaP›‘ †mb¸ß, kirP›‘, c‡ev³, c.96

তার মা 'জোসেফ' নামে এক খৃস্টানকে বিয়ে করলে ভারতী তার নাম পরিবর্তন করে রাখে মেরি ভারতী জোসেফ। কিন্তু কোন ধর্ম- পালনেই অপূর্বর মত তার বাড়াবাড়ি ছিল না। ধর্ম- পালনের ক্ষেত্রে সে নির্বিকার। হয়ত লেখক তাকে এক্ষেত্রে নিরাসক্ত করেই এঁকেছেন যাতে অপূর্ব- ভারতী মিলনের ক্ষেত্রে ধর্ম কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

কিন্তু অপূর্বকে লেখক আচার- বিচারে খুঁতখুঁতে ও নিষ্ঠাবান করেই এঁকেছেন। তা হলেও পরিবার, সমাজ থেকে সে বহুদূরে—বর্মায়। পরিবারে তার যে অবস্থান তা শুধু তার মায়ের জন্য। সেই মাকেও লেখক আর জীবিত রাখেন নি। ভারতীর পিতা- মাতাও মৃত। দুজনেরই পরিবার বলতে আর কিছু বাকী নেই। তাই পারিবারিক বাধার সম্মুখীন তাদের হতে হয় নি এবং তারা দুজনেই সমাজ থেকে দূরে—একজন কলকাতা থেকে বর্মায় চলে এসেছে, আর একজন বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত। এই দল নারী পুরুষের একসাথে থাকা নিয়েই মাথা ঘামায় না, ধর্মতো তাদের কাছে গৌণ।

ক্ষেত্র গুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "তিনি সমস্যাটির মধ্যে কোন ফাঁক রাখবেন না ভেবেই অপূর্বকে শুধু হিন্দু নয়, অত্যন্ত গোঁড়া এবং আচার- বিচার, ছোঁয়াছুঁয়িতে অবিশ্বাস্য রকমের রক্ষণশীল করে তৈরি করেছেন। কিন্তু সমস্যাটিতে ফাঁক থেকে গেছে। ...ফাঁকটা এখানে যে, শরৎচন্দ্র ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে খৃস্টান ভারতীকে বেশ নির্বিকার রেখেছেন। প্রথমত তার গির্জায় যাবার বা গৃহকোণে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির সামনে নৈশ প্রার্থনা জানাবার কোন উল্লেখ নেই। ...অন্যদিকে অপূর্বও নিজ সমাজ স্বজন থেকে বহুদূরে রেঙ্গুনে। শরৎচন্দ্র ওদের মিলনের সামাজিক সমস্যাকে বেশ তরল করেই রেখেছেন।" [১১২]

আবার ভারতী চরিত্রটি যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাতে বোঝা যায় তার পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ় নয়। সে একটি ভাঙ্গা পরিবারের সদস্য। অসুস্থ মাতা এবং মদ্যপ ও উচ্ছৃ•Lল সৎ পিতার আচরণের ভিতর দিয়ে ভারতী প্রতিপালিত; তাতে ¯েœহ, প্রেম, সেবা, ভালোবাসার ফল্গুধারা ছিল এমনটা

---

[112] | †¶Î ¸ß, Jcb¨wmK kirP›' P‡Ævcva¨vq, c_g evsjv‡'k ms¯‹iY:2011, c.224

মনে হয় না। রূঢ় বাস্তবতার কারণে তার চরিত্রটি কঠিন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভারতী ঠিক এর বিপরীত। এটি পরিস্ফুট অপূর্ব ও ডাক্তারের প্রতি তার আচরণে।

অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> ‘‘ভারতী যে পরিবারে ও প্রতিবেশে মানুষ হইয়াছে তাহাতে খাঁটি বাঙালী মেয়ের মতই অতখানি সেবাযZ, †mহ ও করুণায় নিজের সমগ্র সËাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত মনে হয়।’’ [১১৩]

বোথা কোম্পানির ভামো অফিস থেকে অপূর্ব বিশ/ পঁচিশ দিন পর ফিরে এসে দ্যাখে ভারতীর পরিবার বলতে কেউ জীবিত নেই। উপন্যাসে আকস্মিকভাবে প্রায় একই সাথে তার পিতা ও মাতার মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে। ভারতী অভিভাবক- শূন্য, বাবা- মায়ের অবর্তমানে কোন আZীয়- স্বজন বা তার সমাজের কোন উল্লেখ উপন্যাসে নেই। ব্যাপারটি অস্বাভাবিক হলেও অপূর্বর সাথে মিলনের দিক থেকে তার আর কোন সমস্যা থাকলো না—

> ‘‘ভারতী কহিল, বাবা বেঁচে নেই, তিনি হাসপাতালেই মারা গেছেন।
> মারা গেছেন? অপূর্ব অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার কালো কাপড় দেখে এমনি কোন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা আমার পূর্বেই অনুমান করা উচিত ছিল।
> ভারতী কহিল, তার চেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটলো হঠাৎ মা যখন মারা গেলেন—
> মা মারা গেছেন? অপূর্ব স্তব্ধ অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল।’’ (পরিঃ৮, পৃ.৪১)

আকস্মিকভাবে তার বাবা- মায়ের মৃত্যুর সাথে সাথে তেওয়ারীও বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায়। ভারতী তেওয়ারীর কাছে থাকছে এবং তার সেবা করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অপূর্ব- ভারতীকে কাছাকাছি আনার জন্য অন্য কোন উপায় কি ভাবা যেত না! ক্ষেত্র গুপ্তের মতে, গল্প- গ্রন্থনে এক্ষেত্রে লেখক খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছেন।

---

[113] | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›‘i Rxebx I mvwnZ¨wePvi, ZZxq ms¯‹iY: AMnvqY 1414, wW‡m¤i 2007, c.249

আবার এরই মধ্যে ভারতী পথের দাবীর সভ্যও হয়ে গেছে। এত অল্প সময়ে ভারতী কি করে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হল? ভারতী একটি সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে হয়ে—যার শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতা, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা—না থাকার পরও সে হঠাৎ পথের দাবীর সেক্রেটারি হয়ে গেল কিভাবে তার কোন ব্যাখ্যা নেই। এত অল্প সময়ে এত ঘটনা ঘটেছে যে পাঠক বিস্মিত না হয়ে পারে না।

অপূর্ব ভারতীর খোঁজে মাসখানেক পর তার বাসায় গিয়ে ভারতীর সাথে সাথে পথের-দাবী সমিতির সন্ধান পায়। খুব সহজেই মোটা বাঁধানো খাতায় নাম অন্তর্ভুক্ত করে সে পথের দাবীর সভ্য হয়ে যায়। একজন অচেনা লোক হঠাৎ করে সাংঘাতিক গোপন সভায় গিয়ে হাজির এবং কোন মতামত ছাড়াই সে ওই দলের সভ্য হয়ে যায় কি করে? বিশেষ করে প্রকাশ্যে ছদ্মবেশ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ডাক্তার যেখানে উপস্থিত—যে কিনা ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু?

ডাক্তারের অবস্থান সম্পর্কে চরম গোপনীয়তা পালন করা সত্ত্বেও ভারতী অপূর্বকে তাদের সভায় নিয়ে গেছে এবং অপূর্বকে সভ্য করে নেওয়া হলে তার মন অস্বস্তিতে ভরে গেছে। অপূর্ব-ভারতী দুজনেই অহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতি। সহিংস আন্দোলনে তাদের ঘোরতর আপত্তি। সব্যসাচীর পথ এবং তাদের পথ আলাদা।

শুদ্ধসত্ত্ব বসুর মতে,

> "সব্যসাচীর মনের সম্পূর্ণ বিরোধী মত পোষণ করা সত্ত্বেও ভারতী কি করে পথের দাবীর সভ্য পদ রাখতে পারলো তা ভাববার বিষয়, এমনকি ভীরু অপূর্বকে যাচাই-বাছাই না করে সাংঘাতিক গোপন সভায় হাজির করা এবং পথের দাবীর সভ্য করা বিপ্লবী সংস্থার পক্ষে কি করে এত সহজে সম্ভব হলো—তার সদুত্তর মেলা কঠিন।" [১১৪]

---

114 | ï×mË em, kir mgx¶v, c‡ev³, c.153

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

> ‘‘অপূর্ব ও ভারতীকে পথের দাবীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত করার কোন কারণ দেখা যায় না—অপূর্বর মনোবৃŸি তো উহার সম্পূর্ণ বিপরীত, ভারতীর জীবনেও বৈপ্লবিকতার কোন প্রভাব পড়ে নাই। স্বাধীনতা- অর্জনের দুর্জয় সংকল্প ও অকুণ্ঠ ত্যাগ- স্বীকার হয়তো আমাদের বর্তমান জীবনে শিথিল হইয়াছে—শরৎচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগপূর্ণ দেশাZ¥বোধ স্বাধীনতা- উËর বঙ্গদেশে অনেকটা বেমানান ও অশোভনরূপে উচ্চকণ্ঠ অতিভাষণ বলিয়াই মনে হয়।’’ [১১৫]

একটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য যে ধরনের মানসিক প্রস্তুতি দরকার তা অপূর্বর ছিলনা। সে ছিল দুর্বলচিË। তাকে লেখক বাঙালি মধ্যবিËর যথার্থ প্রতিনিধি করেই এঁকেছেন। আর দশজন বাঙালি মধ্যবিËর মতই তারও দেশপ্রেম ছিল কিন্তু সেটি সব্যসাচীর মত সর্বস্ব ত্যাগ করে জীবন বাজী রেখে নয়।
তাইতো অপূর্ব অপমানিত হয়ে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা ও কর্মকাণ্ডের সংবাদ পুলিশকে জানাতে দ্বিধাবোধ করেনি।

উপন্যাসে যে ঘটনাটি কাহিনির মোড় পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল অপূর্বর পূর্ব পরিচিত হিসেবে পুলিশের বড়কর্তা বাঙালি নিমাইবাবুর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। অপূর্ব ঘরে চুরি হওয়ায় চোরের সহায়তাকারী সন্দেহে ভারতীর নামে থানায় নালিশ করতে বের হয়। সেখানে পৌছলে সমস্ত ঘটনা পুলিশের কাছে বিবৃত করতে পারত কিনা সন্দেহ; পারলে কাহিনি কোন দিকে গড়াতো বলা মুশকিল। কিন্তু থানায় যাবার পথে আকস্মিকভাবে নিমাইবাবুর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়—

> ‘‘পিছন হইতে ডাক শুনিল, এ কি অপূর্ব নাকি? এখানে যে!
> অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোশাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন বড় পুলিশ- কর্মচারী।... পথের মধ্যেই অপূর্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?’’ (পরিঃ০৬, পৃ.২৭)

---

[115] | kxKgvi e‡›‘¨vcva¨vq, e½ mwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, c‡ev³, c.150

পুলিশের বড়কর্তা নিমাইবাবুর সঙ্গে অপূর্বর সাক্ষাৎ আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক। তারই মাধ্যমে সব্যসাচীর সমস্ত খবরাখবর অপূর্ব জানতে পেরেছে এবং এখান থেকেই কাহিনির মোড় পরিবর্তিত হয়েছে। মহাপুরুষ সব্যসাচী বাঙালি রাজদ্রোহী, ছদ্মবেশ নিয়ে বর্মায় প্রবেশ করেছে, বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে, তার দশটি ইন্দ্রিয়ই সমান বেগে চলে, গভর্ণমেন্টের নির্দেশ একে চোখে চোখে রাখার—উপন্যাসের পরবর্তি অংশের নায়কের সম্বন্ধে অপূর্ব এসবই জানতে পেরেছে নিমাইবাবুর মাধ্যমেই। ফলে সব্যসাচীর সঙ্গে শুরুতেই তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্কই একসময় তাকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

অপূর্বর বর্মা থেকে এক প্রকার বিতাড়িত হবার পর কলকাতায় ফিরে গেলে আবার তার বর্মায় ফিরে আসার সংবাদ যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তা একই সঙ্গে বিস্ময়কর ও আকস্মিক—"শশী আস্তে আস্তে বলিল, আর একটা খবর আছে ডাক্তার, অপূর্ববাবু ফিরে এসেছেন। ডাক্তার বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সে কি শশী, কে বললে তোমাকে? শশী কহিল, কাল বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একেবারে মুখোমুখি দেখা। তাঁর মা নাকি বড় পীড়িত।" (পরিঃ২৬, পৃ.১৫৫)

বিস্ময়কর হলেও সত্য, অপূর্ব যখন বর্মা থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে ঠিক সেই সময়েই ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করে অপূর্বর মাও তার কাছে আসার উদ্দেশ্যে কলকাতা ছেড়ে বর্মার জাহাজে চড়েছেন। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সরাইখানায় নিউমোনিয়া জ্বরে আকস্মিক মৃত্যু হয়—

> "(ভারতী) ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, অপূর্ববাবুর মা মারা গেলেন বুঝি?
> ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ দিদিমণি, তাঁর বর্মায় যেন মাটি কেনা ছিল। সেই যে কথায় কি বলে, লা ভাড়া করে যায় সেখানে—এ ঠিক তাই। অপূর্ববাবুও এখান থেকে বেরিয়েছেন, তিনিও ব্যাটার সঙ্গে ঝগড়া করে সেখানে জাহাজে উঠেছেন, সঙ্গে কেবল একজন চাকর। জাহাজেই জ্বর, ধর্মশালায় নেমে একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। বাড়িতে পা দিয়েই বাবু ফিরতি জাহাজে ফিরে এসে দেখেন মা যায়-যায়। গেলেনও তাই,—" (পরিঃ২৯, পৃ.১৭০)

অপূর্বকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে আনার জন্য বা কলকাতা থেকে তাকে আবার বর্মায় আনার জন্য তার মায়ের মৃত্যু ভিb আর ভাল উপায় ছিল না। লেখক তা- ই করেছেন। তার চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তনে এই মৃত্যুটি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

শরৎচন্দ্রের লেখায় এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য—যখন কোন বিষয় মেলানোর প্রয়োজন হয় তিনি সেখানে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কোন কোন উপন্যাসে একাধিক মৃত্যুও লক্ষ্য করা যায়। যেমন এই উপন্যাসেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। ভারতীর পিতা- মাতার এবং অপূর্বও মাতার।

এছাড়া বিভিb উপন্যাসে লেখককে বৃষ্টির আশ্রয় নিতে দেখা গেছে। এটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কাহিনির শুরুটা ফাল্গুন মাস দিয়ে হয়েছে এবং পুরো উপন্যাসে মাত্র মাস- তিনেক সময় অতিবাহিত হবার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছেঃ অথচ উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই অMশিখার মত প্রদীপ্ত নায়ক সব্যসাচী সূচীভেদ্য আঁধারে, প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বোঁচকা কাঁধে চায়নার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। লেখক বৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> ‘‘এদিকে যে রুদ্রের সত্যকার তাণ্ডব ঘরের বাহিরে তখন কি উbাদ- মূর্তিই ধারণ করিয়াছিল, ভিতর হইতে তাহা কেহই উপলব্ধি করে নাই। বিদ্যুতে, ঝঞ্ঝায়, প্লাবনে ও বজ্রাঘাতে সে যেন একেবারে প্রলয় শুরু হইয়া গিয়াছিল। এবং, ডাক্তার অর্গল মুক্ত করিতেই এক ঝলক সুতী² বৃষ্টির ছাট ভিতরে ঢুকিয়া সকলকে ভিজাইয়া, আলো নিবাইয়া সমস্ত ওলটপালট করিয়া ঘর ও বাহির চক্ষের পলকে অন্ধকারে একাকার করিয়া দিল।’’ (পরিঃ৩১, পৃ.১৮৬)

পরিশেষে বলা যায় রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উজ্জীবিত শরৎচন্দ্র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজের অত্যাচার, শাসন- শোষণঃ পাশাপাশি বিপ্লবের চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছেন এ কথা তার পথের দাবীর জনপ্রিয়তাতেই বোঝা যায়। তবে এ- কথাও স্বীকার্য রচনাটিতে কোথাও কোথাও আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা এর বিকাশ ও পরিণতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ প্রk

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার সৃষ্ট উপন্যাসসমূহের মধ্যে যেগুলিকে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম মনে করতেন 'শেষ প্রk' তাদের অন্যতম। এটি মূলত কাহিনিমূলক নয়, তর্কপ্রধান উপন্যাস। শেষ প্রk ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-কার্তিক থেকে শুরু করে ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা পর্যন্ত প্রায় চার বছর ধরে 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে থেমে থেমে মুদ্রিত হয়। ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে (০২ মে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের পর বিদগ্ধ সাহিত্য সমাজে বিতর্ক ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেষ প্রk সম্পর্কে সমালোচকদের মত বিরূপই বলা যায়। তাদের মতে, লেখক এখানে জীবন-রসের চেয়ে তËটাই প্রধান বলে বিবেচনা করেছেন। অন্যান্য সমালোচকের মত নীরেন্দ্রনাথ রায়ও(১৮৯৬-১৯৬৬) শেষ প্রক 'গোরা'র প্রভাব দেখেছেন।

সমসময়ে ঘনীভূত 'সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে নানা প্রk, বিতর্ক ও সংশয়' নিয়ে লেখকের আলোড়িত চৈতন্যের মিলিতরূপ 'শেষ প্রk'। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসটিকে অতি আধুনিক সাহিত্যকর্ম বিবেচনা করতেন। দিলীপকুমার রায়কে(১৮৯৭-১৯৮০) ১৩৩৮ সালে লিখিত পত্রে বলেছেন,

> 'শেষপ্রক অতিআধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। খুব কোরবো, গর্জন ক'রে নোঙরা কথাই লিখবো, এই মনোভাবটাই অতি-আধুনিক সাহিত্যের Central pivot নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।" [১১৬]

তার মতে, নোংরা না করেও অতি আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল পেলব রসানুভূতিই নয়, 'Intellect-এর বলকারক আহার্য' পরিবেশন করাও আধুনিককালের রস সাহিত্যের একটা বড় কাজ। কিন্তু তার এই অতি-আধুনিক শিল্পকর্মটি নিয়ে কলাকৈবল্যবাদী (Art for arts sake) সমর্থক সমালোচকগণ শিল্পের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে উগ্রবাদী মত প্রচার

---

[116] | ‡MvcvjP›' ivq, kirP›' (3q LÊÑc Îvejx), c_g cKvk: Avlvp 1376, RjvB 1969, c.335

করছেন বলে যে সমালোচনা করেছিলেন, তাতে তিনি ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতে,

> ‘‘কমলের theory আর কমল…এক বস্তু নয়। ‘শেষ প্রk’ প্রকাশিত হবার আগে শরৎচন্দ্র তাঁকে জানিয়েছিলেন, এই বইটি লিখে মেয়েদের কাছে তাঁর ‘পসার মাটি হল’। এঁর অভিমতঃ ‘শুধু মেয়েদের কাছেই নয়, অনেক লেখাপড়া- জানা মডার্ন পুরুষের কাছেও তাঁর পসার মাটি হচ্ছে।’’ [১১৭]

তারপরও যেটুকু প্রশংসা পেয়েছিলেন তাতে তিনি শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে(১৯০৩- ১৯৮৯) ১৩৩৮ সালের ৩০ শে বৈশাখ একটি পত্রে লেখেন,

> ‘‘শেষ প্রk তোমার ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ- বই ভালো লাগবার মানুষ বাOলা দেশে হয়ত পাবো না; শুধু গালি- গালাজই অদৃষ্টে জুটবে, কিন্তু, দেখছি ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলছে।’’ [১১৮]

চরিত্রমুখ্য উপন্যাস শেষ প্রckর কেন্দ্রিয় চরিত্র কমল- ই সর্বেসর্বা। তার মাধ্যমেই লেখক ‘যুধ্যমান সেনাপতি’র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জীর্ণ অচল সমাজের গোঁড়ামি অন্যায় অবিচারের যূপমূলে আঘাত করে তাকে সচল করতে চেয়েছেন। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বা হৃদয় রহস্য উCb¥াচনের দিকে না গিয়ে তিনি তর্কের মাধ্যমে মতবাদ ব্যক্ত করতে তৎপর ছিলেন। এজন্য শেষ প্রckর কাহিনির গতি শ্লথ, প্লট শিথিল। তর্কের প্রয়োজনেই চরিত্রসমূহের গতিপথ পাল্টেছে।

‘শেষ প্রk’ উপন্যাসের কাহিনি আরম্ভ হয়েছে যথার্থ বড়লোক আশুতোষ গুপ্ত ও তার একমাত্র কন্যা মনোরমার আগ্রা এসে বাঙালি পরিবারের

---

117 | H, (cwiwkó:19-20)
118 | H, c.398
*Bs‡iR mv‡n‡ei m‡½ Kg‡ji gv‡qi we‡q n‡qwQj wKbv †mUv †Kv_vI ejv nqwb| Ze Kgj Zv‡K evev e‡j D‡jL K‡i‡Q Ges Rxe‡bi GKUv eo mgq †m Zvi Kv‡Q jwjZ cwjZ n‡q‡Q|

সাbিধ্যে বসবাসের মধ্যে দিয়ে। তাদের বিনয় ও আতিথেয়তা- মুগ্ধ আশেপাশের বিশিষ্ট বাঙালি প্রতিবেশি পরিবারগুলো খুব সহজেই ধনাঢ্য এই পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছে। তাদের মধ্যে আছে কলেজের প্রফেসর অবিনাশ মুখুয্যে ও তার মৃতপZ¥র বিধবা ভMি নীলিমা, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হরেন্দ্র, বন্ধুমহলে কঠিন সাঁচ্চা লোক বলে খ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক অক্ষয়, এবং প্রিয়দর্শন গুণী শিল্পী শিবনাথ। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র কমলকে পাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে। কমলের মায়ের বিয়ের পর কি একটা দুর্নাম রটায় তার স্বামী তাকে নিয়ে আসামের চা বাগানে পালিয়ে যান। কিন্তু সামান্য জ্বরে তিনি মারা গেলে বছর তিনেক পরে কমলের জb¥ হয় বাগানের বড় সাহেবের ঘরে। তার দুশ্চরিত্র মায়ের রূপ ছিল, রুচি ছিল না; কিন্তু তার ইংরেজ বাবা চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততায় সাধু লোক ছিলেন।* জীবনের উনিশটা বছর কমল তার কাছেই কাটিয়েছিল। ইউরোপীয় ভাবধারা- পুষ্ট কমলের চিন্তা- চেতনা, মনন নির্ভর যুক্তি- তর্কগুলি শরৎ- সৃষ্ট অন্যান্য নারী চরিত্রের মানসলোক থেকে ব্যতিক্রম।

‘হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়।’—ক্ষণবাদে বিশ্বাসী কমলের জীবনের মূলমন্ত্র চৈতন্যের বিকাশের মাধ্যমে পথচলা। নিজেকে বঞ্চিত করে, যে নেই তার স্মৃতি লালনে কোন মহË¡ থাকতে পারে না বলে তার অভিমত। থেমে থাকা তার অভিধানে নেই। তাই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরতিহীনভাবে একের পর এক সঙ্গী বদলাতে সে কুণ্ঠিত হয়নি। তাইতো তাজমহলের শ্বেতমর্মরের আড়ালে আর সবার মত সে শাজাহান- মমতাজের ভিতরকার একনিষ্ঠ প্রেম দেখতে পায়নি।

কমলের প্রথম বিয়ে হয় এক অসমীয়া ক্রিশ্চানের সাথে। স্বামীর মৃত্যুর পর শিবনাথের সাথে তার শৈবমতে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। অনেকের মতে এটা কোন বিয়েই নয়, সমস্তটাই ফাঁকি। কিন্তু কমল তা মানতে নারাজ। তার মতে হৃদয়বৃË মুখ্য, অনুষ্ঠানটা গৌণ। মনের ভাঙ্গন ধরলে অনুষ্ঠানের জোরে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেয়ে আZ¥হত্যা ভালো—“উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাব তাই ঘাড়ে ধরে ওঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে, আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখবো

বেঁধে? আমি? আমি করব এই কাজ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল। (পরি:৬, পৃ.৪২৫)

কিন্তু শিবনাথের সাথে কমলের এই শৈব বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। অকৃতজ্ঞ, বন্ধুদ্রোহী, অর্থলোলুপ, ভণ্ড কিন্তু গুণী শিল্পী শিবনাথ কমলের রূপজমোহ কাটিয়ে হাত বাড়িয়েছে আশুতোষ কন্যা ধনাঢ্য মনোরমার দিকে। মনোরমা তিন বছর ধরে ইঞ্জিনিয়ার অজিতের জন্য অপেক্ষা করে থাকলেও হঠাৎ তার পরিবর্তে শিবনাথের ছলনায় ভুলে তাকেই জীবনসঙ্গীরূপে বেছে নিয়েছে। শিবনাথ অসুস্থতার ভান করে আশুতোষবাবুর বাড়িতে তাদের স্নেহ ও ভালোবাসা পাবার লোভে আশ্রয় নিলে শিবনাথ-মনোরমার গোপন প্রণয়—আশুতোষবাবু, অজিত ও কমলের কাছে ধরা পড়ে। শিবনাথকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে এক পর্যায়ে মনোরমাও বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। উপন্যাসের শেষ দিকে তাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়—"মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে,—পিতা ও ভাবী শ্বশুরের অনুজ্ঞা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে দুজনেই পত্র দিয়েছেন। শুনিয়া কমলের মুখ পাংশু হইয়া গেল।" (পরি:২৪, পৃ.৫৩৮)

তারা আশীর্বাদ চেয়ে পত্র পাঠালে আশুতোষবাবু একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যতের দুর্গতির চিন্তায় বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে কমলের মুখোমুখি হলে কমল তাদের ক্ষমা করে দিতে বলে। তার মতে, নিজের পূর্ণতা আপনিই আসে। মনোরমার মুক্তি তার নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। কমলের এমন সব মন্তব্যই তাকে আর সকলের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

এদিকে অন্য সবার মত মনোরমার প্রণয়ী অজিতও কমলের রূপ ও কথায় বিস্ময়বোধ করেছে। তাজের সামনে কমলের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু সঙ্কোচবোধে কথা বলতে পারেনি। এর দিন-পনের পরে অজিত একা ঘুরতে বের হলে পথে কমলের সাথে দেখা হয়। কমল একরকম জোর করেই তাকে বেড়ানোর সঙ্গী করে। লোকনিন্দার ভয়ে নিজের আনন্দ মাটি করতে সে রাজী নয়; কমল যখন যেটুকু পায় তাকেই সত্য বলে মেনে নিতে পারে—"এ জীবনে সুখ-দুঃখের কোনটাই সত্যি

নয় অজিত বাবু, সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই তো সত্যিকার পাওয়া।" (পরিঃ৮, পৃ.৪৩৩)

পরদিন কমল অজিতকে নিমন্ত্রণ করে। অজিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে কমলের সাথে মধুর একটা সম্পর্ক তৈরী হয় কিন্তু কমলের বিগত জীবনের অসংবৃত ইতিহাস তার সম্মুখে উ˜Nাটিত হলে বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার অন্ত থাকে না। কমলের অতীতটাই বড় অংশ হয়ে আপসের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এর কিছুদিন পরেই অজিত তার ভুল বুঝতে পেরে কমলকে নিয়ে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব করে—"পিছনের ছায়াটাকেই সামনে বাড়িয়ে দিয়ে তোমার মুখ ফেলেছিলাম ঢেকে, সূর্যি যে ঘোরে এই কথাটাই গিয়েছিলাম ভুলে।" (পরিঃ১৫, পৃ.৪৭১)

অজিত জানে নারীর ভালোবাসায় যেমন হৃদয়কে আচ্ছb করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে অচেতন করে। তা জানা সেËও কমলকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলে কমল বলে পরের জিনিষ আZ¥সাৎ করার মত সাহস অজিতের নেই। অজিতের ভালোবাসা যদি ক্ষণিকের মোহই হয় তবে কমল কেন তাকে প্রশ্রয় দিল ? তার জবাবে কমল বলেছে—"সূর্য ধ্রুব কিনা জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়ত, ও দুটোই নিত্যকালের। তেমনি, হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়! ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে।" (পরিঃ১৫, পৃ.৪৭৪)

তার এই দর্শন চিন্তার কারণেই হয়ত উপন্যাসের শেষে বিবাহ বন্ধন ছাড়াই কমল অজিতের সাথে আগ্রা ছেড়ে অমৃতসর চলে যাচ্ছে একসাথে থাকার নিমিেË। বারবার তার অনুরোধ সেËও তাকে বিয়ে করে বন্ধনে আটকাতে চায়নি। মুক্তির জায়গাটুকুতে ভয়ানক মজবুত করে নিরেট নিkQদ্র ঘর বানাতে চায় না সে। ওটুকু খোলাই রাখতে চায়—স্বাভাবিক আলো বাতাসে যেন সম্পর্কটা বেড়ে উঠতে পারে, বেঁচে থাকতে পারে।

এদিকে কলেজের প্রফেসর অবিনাশ মুখুয্যে স্বাস্থ্যান্বেষণে আZ¥ীয় বাড়িতে যাওয়া মনস্থির করলে তার সংসার ও সন্তান সামলানো শ্যালিকা নীলিমাকে নিয়ে বিপদে পড়ে। মৃত পZ¥ীর বিধবা ভগিকে নিয়ে তো আর আZ¥ীয় বাড়িতে যাওয়া যায় না! হরেন্দ্রর আশ্রমে নীলিমাকে না রাখতে

চাইলে আশুবাবুর পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে অবিনাশ সে বাড়িতে তাকে রেখে যায়। মনোরমার অনুপস্থিতিতে নীলিমা আশুবাবুর সেবার ভার নিলে এক সময়ে আশুবাবু বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করে যে নীলিমা তাকে ভালোবেসে ফেলেছে—

> "কে জানত কমল, এই মাংস-পিণ্ডটাকে অবলম্বন করেও প্রk জটিল হয়ে উঠতে পারে। মনে হয় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। ...এই রোগাতুর জীর্ণদেহ, এই অক্ষম অবসb চিË, এই জীবনের অপরাহ্ণবেলায় জীবনের দাম যার কানাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতীর মন আকৃষ্ট হতে পারে, এতবড় বিস্ময় জগতে কি আছে!" (পরিঃ২৬, পৃ.৫৫৪)

ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি বিব্রত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। বিশাল দেহ, বিপুল ঐশ্বর্য, বিরাট হৃদয়, অসীম ধৈর্য নিয়ে থাকা সদাপ্রসb এই মানুষটির কাছে মৃত পZxর স্মৃতি অম্লান, তাই তিনি নীলিমাকে গ্রহণ করতে পারেন না। আবার নীলিমা ভবিষ্যতে অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি কাতর হয়ে পড়েন। এদিকে অবিনাশের চিঠির মাধ্যমে জানতে পারেন আZ্মীয় পরিজনের অনুরোধে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেছেন। আশুবাবুও আগ্রা ছেড়ে বিলেতে বন্ধুদের কাছে চলে যাচ্ছেন। অবশেষে নীলিমার আশ্রয় হয় হরেন্দ্রর আশ্রমে।

হরেন্দ্রের আশ্রমে আর যারা থাকে তাদের মধ্যে রাজেন্দ্র অন্যতম। সমগ্র উপন্যাসে একমাত্র রাজেন্দ্রই কমল চরিত্রটিকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে। হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সে কিছুদিন বাস করেছিল। অ™Z তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল তার অসীম, ধৈর্য তার অসাধারণ। মানুষের কল্যাণেই সে তার জীবন উৎসর্গ করেছে। কমল তাকে প্রথম দেখাতেই ভালোবেসেছে, কিন্তু রাজেন্দ্রর কাছ থেকে পেয়েছে উপেক্ষা। অবহেলা করে নয়; তার অকলঙ্ক পুরুষ চিËতলে আজও নারীমূর্তি ছায়া ফেলেনি—এজন্য। গ্রামের এক ঠাকুর বাড়িতে আগুন লাগলে বহুলোক পূজিত বিগ্রহ মূর্তি উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেবতাকে রক্ষা করে নিজে বৈকুণ্ঠ লাভ করেছে, এর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে।

দুই

'শেষ প্রkͦ উপন্যাসেও আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতার অভাব নেই। সবচেয়ে বড় অস্বাভাবিকতা কমলের অজেয় তার্কিকতায়। ভারতবর্ষে জb¥গ্রহণ ও প্রতিপালিত হওয়া সËেও ইংরেজ বাবার কল্যাণে কমল ইউরোপীয় আধুনিক চিন্তা-চেতনা লালন করেছে। সে অসবর্ণ, শাস্ত্র বহির্ভূত অসংযমের ফল হলেও উনিশ বছর বাবার কাছে প্রতিপালিত হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক সাহস থেকে মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নেওয়ার শিক্ষা পেয়েছে। ভারতবর্ষের প্রচলিত মতবাদের সাথে তার মতপার্থক্য সুস্পষ্ট।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> "কমলের জb¥ যেন সোভিয়েট রুশদেশে... ইহার যেন কোথাও কোন নাড়ীর সম্পর্ক নাই, ছোটবড় কোন টানই ইহাকে বেদনায় ব্যথিত করে না...। ...কমল একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের সুস্পষ্ট ও জোরাল অভিব্যক্তি মাত্র, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ নহে; একটা ইঞ্জিনের বাঁশি, হৃদয় স্পন্দন নহে।" [১১৯]

কমল চরিত্রের প্রকাশ তার তর্কের মাধ্যমে। মানুষের জীবনের নিগূঢ় রহm¨ উCb¥াচন বা মনস্তাË্বিক জটিলতা বা তার বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের কোথাও স্থান পায়নি। কমলের জীবনের দুঃখ, বেদনা বা আনন্দ-অনুভূতির নাটকীয় রসঘন মুহূর্ত বিশ্লেষিত হয়নি। শুধু যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কয়েকটি মতবাদ কমলের মাধ্যমে লেখক প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যতবড় অধ্যাপক বা পণ্ডিত ব্যক্তি-ই হোক না কেন কমলের যুক্তি তর্কের কাছে তারা যেন কিছুই নয়। হার তাদের বাধ্যতামূলক। সব যুক্তির উËর কমলের কাছে অতি সহজেই পাওয়া যায়। তার রূপের মতই তার কথাও ধারালো এবং ঝাঁঝালো। সবাইকে সম্মোহিত করার যাদুকরী শক্তি দিয়ে লেখক তাকে সৃষ্টি করেছেন। তার চরিত্র স্বাভাবিক ছন্দের পরিবর্তে কিছুটা আরোপিত মনে হয়। কিরণময়ী চরিত্রের সাথে তার মিল লক্ষ্য করা যায়। অMিশিখার মত ঝলসানো

---

[119] | D×Z, m‡evaP›' †mb¸ß, kirP‡›'i Rxeb I mwnZ¨, WØZxq ms¯‹iY: gvN 1404, c.174

রূপের দীপ্তিতে উভয়েই উজ্জ্বল কিন্তু চরিত্রগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। কিরণময়ীর বিদ্যা বুদ্ধির একটা পরিচয় গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু কমলের মত মেয়ের এমন তার্কিক ক্ষমতার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না।
অজিতকুমার ঘোষের জিজ্ঞাসা "এত বিদ্যাবুদ্ধি কমলের মত মেয়ে পাইল কোথায় ?"

> "কমলকে লেখক বুদ্ধি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু হৃদয় দিয়া জীবন্ত করিতে পারেন নাই। ...কমলের শিক্ষাদীক্ষা কোথায় কীভাবে হইয়াছে জানি না কিন্তু আগ্রার বাঘা বাঘা অধ্যাপককে সে যুক্তিতর্কের মুখে হারাইয়া একেবারে টীট করিয়া দিয়াছে। অক্ষয় তো শেষ পর্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া তাহার করুণা ভিক্ষা করিয়াছে। বিলাতফেরত আশুবাবু, ইঞ্জিনিয়ার অজিত প্রভৃতি সকলেই যেন সম্মোহিত হইয়া তাহার কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে। কমলের প্রতি লেখকের এই যে অনুচিত ও অতিশয় পক্ষপাতিত্ব, তাহার মতবাদের এই যে উগ্র, অসহিষ্ণু জবরদস্তি—এখানেই শিল্পের ভারসাম্য এবং শিল্পীর উদার, অপক্ষপাতী ভূমিকা নষ্ট হইয়াছে।" [১২০]

কমলের সাথে তর্কে কেউ জয়ী হতে পারেনি। সকল যুক্তিকেই সে খণ্ডন করে পাল্টা যুক্তি দিয়েছে। কমলের রূপ এবং যুক্তির প্রাবল্যে বড় বড় সব অধ্যাপকদের কথা ও যুক্তি ভেসে গেছে। এমনকি ইতিহাসের অধ্যাপক সংকীর্ণমনা ও ছিদ্রান্বেষী অক্ষয়, যার শুধু নিজের নয় পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি, যার কথার তীক্ষ্ণ খোঁচায় সবাই পর্যুদস্ত—সে- ও শেষ পর্যন্ত কমলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছে। তার মতের সাথে কমলের মত কখনও মেলেনি। অক্ষয়ের মতে, যে আদর্শ বহু সহস্র যুগ ধরে প্রচলিত দানের মধ্যে, পুণ্যের মধ্যে, তপস্যার মধ্যে, নারী জাতির অক্ষয় সতীত্বের মধ্যে তার জোরেই হিন্দু বেঁচে থাকবে। কিন্তু কমল তা মানতে নারাজ। তার মতে, কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্তনেও লজ্জা নেই।

কমলকে আক্রমণ করে রচিত প্রবন্ধ নারী কল্যাণ সমিতির প্রথম অধিবেশনে সকলের মাঝে পাঠ করে অক্ষয় তাকে বিদ্ধ করতে চেয়েছে।

---

[120] | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›`i Rxebx I mvwnZ¨wePvi, ZZxq ms¯‹iY: AMnvqY 1414, wW‡m¤i 2007, c.382, 270

সমস্ত উপন্যাস জুড়ে কমলকে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপ শ্লেষ দিয়ে আঘাত করেছে। সেই অক্ষয়ই উপন্যাসের শেষে একেবারে পাল্টে গেছে—

> "আহারান্তে অক্ষয় কমলকে একমুহূর্ত নিরালায় পাইয়া চুপি চুপি বলিল, শুনতে পেলাম আপনারা চলে যাচ্চেন। পরিচিত সকলের বাড়িতেই আপনি এক- আধবার গেছেন, শুধু আমারই ওখানে—
> আপনি! কমল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। ...এই স্ত্রীলোকটিকে 'আপনি' বলাটা সে বাড়াবাড়ি, এমন কি ভদ্র- আচরণের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করিত।" (পরিঃ২৮, পৃ.৫৬৩)

নতজানু হয়ে কমলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা, আপনি বলে সম্বোধন, মতের পরিবর্তন, তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ, চিঠির জন্য কাকুতি মিনতি—তার চরিত্রের এই পরিবর্তন অস্বাভাবিক ও আরোপিত মনে হয় যা পাঠককে পীড়া দেয়। কারণ উপন্যাসের কোথাও তার চরিত্রের এই পরিবর্তনের সম্ভাবনার কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত দেওয়া হয় নি—

> "ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এবং গ্রামের দুরবস্থা দেখিয়া এই রুচিবাগীশের মন নরম হইয়া গিয়াছিল। সে কমলের কাছে cmেহ ও চিঠি ভিক্ষা করিল এবং বলিল যে কমলের কথা সে প্রায়ই ভাবিবে। এই সেই অক্ষয়। তাহার পরিবর্তন (অধোগতি?) শুধু যে আকস্মিক তাহা নহে, ইহা সম্ভাব্যতার সীমাও অতিক্রম করিয়াছে।"[১২১] (শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন,

> "অক্ষয় চিররুMv স্ত্রী নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। সম্ভবত তার স্বভাবগত হিংস্রতার উৎস খুঁজেছেন লেখক। ভালই করেছেন। কিন্তু কমলের কাছে তার এই আTZ¦- উ˜Nাটন লেখকের জোর করে তৈরি। কমলকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণও খুবই হঠাৎ- কোনই মনস্তাত্ত্বিক পূর্বপ্রস্তুতি নেই। অক্ষয়ের মনের দ্বিধার কিঞ্চিত ইঙ্গিতও আগে দেওয়া হয়নি।"[১২২]

121| m‡evaP›' †mb¸ß, kirP›', mß'k ms¯‹iY: AMnvqY 1407, c.104
122| †¶Î ¸ß, Jcb¨vwmK kirP›' P‡Ævcva¨vq, c_g evsjv‡'k ms¯‹iY:2011, c.230

অক্ষয়ের চরিত্রের পরিবর্তন উপন্যাসে বড় আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা। এর ফলে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টানতে ঔপন্যাসিককে বেগ পেতে হয়নি। আকস্মিক বা আরোপিত হলেও একটি সুন্দর সমাধান দেখানো গেছে।

কমলের মা প্রথাগত অর্থে চরিত্রহীনা বাঙালি বিধবা, বাগানের বড় সাহেবের ঘরে কমলের জb¥| কমলের প্রথম বিয়ে হয় একজন অসমীয়া ক্রিশ্চানের সাথে। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর অর্থলোলুপ শিবনাথের সাথে শৈবমতে বিয়ে হয়। কিন্তু বিশিষ্ট বাঙালি সমাজের মতামত এটা কোন বিয়েই নয়; সমস্তটাই ফাঁকি। কিন্তু কমল তা মানতে রাজি নয়। তার কাছে অনুষ্ঠানের চেয়ে হৃদয় সত্যটা বড়। ভালোবাসার সম্পর্কে চিড় ধরলে অনুষ্ঠানের মিথ্যা বন্ধন দিয়ে বেঁধে রাখার পক্ষপাতি সে নয়। তার কাছে অতীতের যে কোন আদর্শের চেয়ে বর্তমানটাই বড়। হোক সে ক্ষণিকের মোহ তবুও ক্ষণ তার কাছে মিথ্যা নয়। সূর্য যদি ধ্রুব হয়, নশ্বর হয়, তাহলে কুহেলিকাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়নি। বিবাহের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হলেই আনন্দও স্থায়ী হবে এমন কোন কথা নেই। এজন্য শিবনাথ যদি কমলকে কখনও অস্বীকার করে তাহলেও সে ঘাড়ে ধরে তাকে তা স্বীকার করিয়ে নিতে যাবে না। তাজমহলের সামনে আবেগভরে কমল যে দিন এই উক্তি করে তার মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই কমল জানতে পারে ভালোবেসে যার সঙ্গে সে ঘর বেধেছে সে ঘরের স্থায়িত্ব আর বেশিক্ষণ নয়।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন গুপ্তের মতে,

> ‘‘তাজমহলের কাছে যেদিন কমল তাহার শৈববিবাহের কাহিনী সcm‡হ, সকৌতুকে ও একান্ত নির্ভয়ে বর্ণনা করিয়াছিল, এবং যেদিন অজিতের নিকট হইতে সে জানিতে পারিল যে শিবনাথ জয়পুর যাইবার কথা বলিয়া আগ্রায়ই আছে, ইহার মধ্যে ব্যবধান মাত্র পনের দিনের। কাজেই যে নীড় সে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল নিতান্ত অতর্কিতভাবে; ইহা যেমন আকস্মিক তেমনি অসহনীয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।’’ [১২৩]

[123] | m‡evaP›‘ †mb¸ß, kirP›‘, c‡ev³, c.99

এখন প্রk হচ্ছে যাকে ভালোবেসে কমল ঘর বেঁধেছে তা যে এক মুহূর্তে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল এই নিয়ে কমলের কোন দুঃখ বা বেদনাবোধ, কোন কষ্ট বা অভিযোগ বা কোন মর্মপীড়া নেই। তার অন্ত জীবনের কোন নিগূঢ় বেদনার বা দীর্ঘশ্বাসের একটা ক্ষণও উল্লেখিত হয়নি—তার দুর্ভাগ্যের বা সঙ্কটের কোন চিত্রই লেখক আঁকেননি। কোন সম্পর্কই যেন তার হৃদয়প্রোথিত নয়। অ্যারিস্টোটলের নায়কোচিত আধারে যে অন্তর্জালা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব বা চিËসঙ্কট থাকা উচিত তা তার চরিত্রে নেই। তাই তার চরিত্রের অস্বাভাবিকতা নিয়ে প্রk উঠতেই পারে।

উপন্যাসটির শুরুতে মনোরমা ছিল অজিতের বাগদËা এবং কমল ছিল শিবনাথের স্ত্রী। উপন্যাস যখন সমাপ্তির দিকে তখন মনোরমা চলে গেছে শিবনাথের কাছে তাকে ভালোবেসে বিয়ে করতেঃ আর কমল যাচ্ছে অজিতের সাথে ভালোবেসে ঘর বাঁধতে। একে অপরের সাথে সম্পূর্ণ পাল্টে যাওয়ার মত বিরাট ঘটনাটির পেছনে কয়েকটি কারণ আছেঃ থাকাই স্বাভাবিক। তবে লেখক প্রতিটি দৃশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে আকস্মিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। দুটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

> ক. ‘‘নীচের বারান্দার উËর-প্রান্তে কয়েকটা বিলাতী ঝাউ ও পাম গাছ বহু অযZ মাথায় করিয়াও কোনমতে টিকিয়াছিল, তাহারই উপরে মনোরমার শয়নকক্ষ। তখনও আলো জ্বলিতেছে কি না জানিবার জন্য অজিত সেই দিক দিয়া ঘুরিয়া আশুবাবুর কাছে যাইতেছিল, ঝোপের মধ্যে হইতে মানুষের গলা কানে গেল। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ। কথা হইতেছিল কি একটা গানের সুর লইয়া। দোষের কিছুই নয়,—তাহার জন্য ছায়াচ্ছb বৃক্ষতলের প্রয়োজন ছিল না। ক্ষণকালের জন্য অজিতের দুই পা অসাড় হইয়া রহিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যই। আলোচনা চলিতেই লাগিলঃ সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।’’ (পরিঃ৯, পৃ.৪৩৬)
>
> খ. ‘‘রোগীর গৃহ পাছে গোলমালে বিশ্রামের বিN ঘটে এই আশঙ্কায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সকলে প্রবেশ করিলেন। শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে, রোগীর বুকের পরে অবসb মাথাটা রাখিয়া বোধ করি এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার পরে পরস্পর সbদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। স্বcাতীত এই দৃশ্যের সম্মুখে অকস্মাৎ পিতার দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন ঘনান্ধকারের জাল নামিয়া আসিল, কিন্তু মুহূর্তকাল মাত্র। মুহূর্ত পরেই তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। অজিত ও কমল চোখ তুলিয়া উভয়ে উভয়ের

মুখের প্রতি চাহিল, তাহার পরে যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।” (পরি:১৫, পৃ.৪৭৬)

এই দুটি আকস্মিক ঘটনাই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে পাল্টে দিয়েছে এবং উপসংহার অনিবার্য করে ফেলেছে। প্রথম ঘটনার মাধ্যমে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ঘটনার মাধ্যমে তা জোরদার হয়েছে। প্রথম ঘটনার প্রভাবে অজিতের সাথে মনোরমার বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় ঘটনার প্রভাবে শিবনাথের সাথে কমলের; অজিত এবং আশুবাবুর সাথে মনোরমার বিচ্ছেদ রচিত হয়েছে।

শিবনাথকে যত সহজে কমল গ্রহণ করেছিল ঠিক সেভাবেই তাকে ত্যাগ করেছে। শিবনাথের বুকের উপর ক্লান্ত মনোরমার মাথা রাখা দেখে বা তাদের বিবাহ পূর্ব আশীর্বাদ আশুবাবুর কাছে চেয়ে পাঠালে আশুবাবুর প্রCkর উËরে তাদের ক্ষমা করে দিতে বলার মাধ্যমে কমল যে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছে তাতে না আছে যাতনা না আছে স্বাভাবিকতা। তার এই সময়কার আচরণ রক্ত- মাংসের মানুষের নয়; যন্ত্রিকতার সাথে তুলনা করা যায়। এমন একটি দৃশ্য হঠাৎ দেখার পর যে ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া বা আঘাত লাগার কথা তার কিছুই উল্লেখিত হয়নি। কমল এমন ভাব করেছে যেন এটি নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা। আকস্মিক এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে মনোরমা- শিবনাথের একান্ত প্রেমের দৃশ্যটি কমল- অজিতের সামনে না আসলে কাহিনিটি হয়ত অন্য রকম হতে পারত।
অজিতকুমার ঘোষের মতে,

“এই দৃশ্য দেখিবার পর অজিত, আশুবাবু প্রভৃতি চরিত্রের তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত; কিন্তু লেখক সেই মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ না করিয়া সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে শুষ্ক তর্কবিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। চরিত্রগুলির তৎকালীন মানসিক অবস্থায় ঐ ধরনের তর্কবিতর্ক স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত নহে। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে শুনিয়া কমলের কোন তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়া তো দূরের কথা, সে নারী মুক্তির দোহাই দিয়া মনোরমার পক্ষে সজোর ওকালতি করিয়াছে। এ- সব দেখিয়া মনে হয়, কমল শুধু কেবল বুদ্ধির শাণিত বিদ্যুৎ ঝলক, হৃদয়ের সামান্যতম বাষ্পও তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই।” [১২৪]

---

[124] | AwR Z Kgvi †Nvl, k i rP‡›‘ i Rxebx I mwn Z¨wePvi, c‡ev³, c.382

উপন্যাসে কমল- শিবনাথের যে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে তার স্পষ্ট কোন চিত্র অঙ্কিত হয়নি। আবার বিচ্ছেদের স্পষ্ট কোন কারণও ব্যাখ্যা করা হয়নি। কমলের কোন দোষের কারণে শিবনাথের মন বিমুখ হয়ে অন্য নারীতে আসক্ত হল বা কখন তাকে ত্যাগ করে অন্য বাসায় থাকা শুরু করল, কেন করল তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা নেই। আবার শিবনাথের প্রতি কমলের আকষর্ণই- বা কখন নিঃশেষ হয়ে ভালোবাসা তলানীতে গিয়ে ঠেকল তারও কোন উËর পাওয়া যায় না। ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে তাজমহলের সামনে কমল যেদিন গর্ব করে বলেছে শিবনাথ অস্বীকার করলে বিচার চাইতে যাবার আগে গলায় দেবার দড়ি তার জুটে যাবে—"হা অদৃষ্ট! উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবে না নাকি?" (পরিঃ৬, পৃ.৪২৫) এর ঠিক পনের দিন পর আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে কমল বলছে—"অজিতবাবু, আপনাদের ভয় নেই, তিনি এখানে আর আসেন না। শৈব- বিবাহের শিবানীর মোহ বোধ হয় তাঁর কেটেছে।" (পরিঃ৮, পৃ.৪৩৫)

গ্রন্থমধ্যে তার এই মোহভঙ্গের কারণ অনুক্ত। শিবনাথ অর্থলোলুপ ভণ্ড তাই সে পেরেছে কিন্তু কমল কি করে এত সহজে তাকে ভুলে অজিতের সাথে প্রণয়ে মেতে উঠল? আসলে কমল নিজেই নিজের সম্পর্কË, সে আর কারো নয়—কমল নিজেকে ছাড়া আর কখনও কাউকে ভালোবাসতে পেরেছে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

> "শিবনাথের কমলের কাছ থেকে অন্য বাড়িতে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অথবা অন্য নারীতে আসক্ত হবার মুহূর্ত থেকে কমল তাকে এত সহজে ভুলতে পারে কি করে? শিবনাথ অন্যতে আসক্ত হয়েছে তাই কমলের থেকে সে দূরে সরে যেতে পেরেছে; কিন্তু কমল কি করে মন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিল? তা' হলে কমল তাকে ভালোবেসেছিল সেটাই বা সত্য হয় কি করে? ...তËর প্রচার করতে গিয়ে যেন লেখক সম্ভাব্যতা এবং বাস্তব সত্যতার গণ্ডি অতিক্রম করে গেছেন।" [১২৫](নীলিমা ইব্রাহীম)

[125] | bxwjgv Bevnxg, kir cwZfv, evsjv GKv‡Wgx ms¯‹iY, †cŠl 1407, Rvbqvix 2001, c.256

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> ‘‘আমরা উপন্যাসে কমলের যে পরিচয় পাই, তাহা তাহার তিনজন পুরুষের সহিত হৃদয়- সম্পর্কের ইতিহাসমূলক। শিবনাথের সহিত তাহার শৈব বিবাহের ও তাহার প্রণয়ীদË শিবানী নাম-গ্রহণের পিছনের প্রেরণাটি অনুক্ত রহিয়া গিয়াছে, এই সম্পর্কচ্ছেদের কাহিনীও হেতুবাদ- সাহায্যে স্পষ্টীকৃত হয় নাই। ...কমলের স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্য- জীবনে শিবনাথের মোহভঙ্গের কোনো বর্ণনাই পাই না।’’ [১২৬]

অজিতকুমার ঘোষ মনে করেন,

> ‘‘শিবনাথ ও কমলের সম্বন্ধ দেখান হয় নাই এবং কিভাবে শিবনাথ কমলের মত অসামান্য রূপবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া মনোরমার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং কিভাবে মনোরমা অজিতকে ছাড়িয়া শিবনাথের প্রতি আসক্ত হইল তাহাও বিশ্লেষিত হয় নাই। লেখক আকস্মিক- ভাবে পরিণতিগুলি দেখাইয়াছেন কিন্তু মধ্যভাগের স্তরগুলি পরপর দেখান নাই।’’ [১২৭]

উপন্যাসের প্রারম্ভে মনোরমাকে যতখানি প্রাধান্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে উপন্যাসের শেষে সেখান থেকে সে ছিটকে পড়েছে। সুশিক্ষিত, সুশীল, অভিজাত্যবোধে পূর্ণ মনোরমার বিয়ে ভেঙ্গে গেলেও চার বছর সাধনা করেছিল অজিতকে পাবার জন্য। নিষেধ নয়, কেবল অজিতের অনিচ্ছার কারণেই সে মাছ, মাংস, রসুন, পিয়াজ পর্যন্ত স্পর্শ করে নাই। ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করেছিল। গায়ে হলুদ হবার পর তার বিয়ে ভেঙ্গে গেলেও সে মানত যে তার সম্প্রদান হয়ে গেছে। কিন্তু সেই অজিত বিয়ের জন্য ফিরে এলে সে হঠাৎ করে তার প্রতি বিমুখ হল কি কারণে? দীর্ঘ অপেক্ষার পর মিলনোন্মুখ দুই নর- নারীর হৃদয়- রহস্যের যে জীবন্ত চিত্র স্বাভাবিক ছিল তা এখানে অনুপস্থিত। তাদের মেলামেশায় হৃদয়ের গভীরতার স্পর্শ নেই। আলাপ ব্যবহারে শুষ্ক রুক্ষ অনুভূতি সবর্ত্র ব্যপ্ত। এর কোন কার্যকারণ ব্যক্ত করা হয়নি—

---

126 | kxKgvi e‡›‘¨vcva¨vq, e½ mwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, cbg‘Y 2010-2011, c‡ev³, c.146

127 | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›‘i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.382-83

> ‘‘মণি আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহার প্রতি চাহিয়া অবিনাশ যেন চমকিয়া গেলেন। ...মনে করিয়াছিলেন মনোরমার মুখের উপর আজ হয়ত এমন কিছু একটা দেখিতে পাইবেন যাহা অনির্বচনীয়, যাহা জীবনে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু কিছুই তো নয়। গোপন আনন্দের প্রচ্ছb আড়ম্বর কোথাও আZ¥প্রকাশ করে নাই, সুগভীর প্রসbতার শান্ত দীপ্তি মুখের কোনখানে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ, কেমন যেন একটা ক্লান্তির ছায়া চোখের দৃষ্টিকে ম্লান করিয়াছে।’’ (পরিঃ০৫, পৃ.৪১৯)

ঠিক তেমনি যে শিবনাথকে মনোরমা দুশ্চরিত্র, লম্পট, পাষণ্ড বলে ঘৃণা করেছে তার প্রতি হঠাৎ আকৃষ্ট হল কিভাবে তারও কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা উপন্যাসে নেই। এ ধরনের ঘটনা ঘটাবার জন্য মনোরমার চরিত্রে আেMয়গিরির অM¨ৎপাতের তেজ থাকা জরুরি ছিল যা তার চরিত্রে নেই। ঔপন্যাসিক শুরু থেকে মনোরমাকে যে ছাঁচে গড়ে তুলেছেন তাতে ভালোবাসার মানুষকে পায়ে মাড়িয়ে পিশাচ শিবনাথকে ভালোবেসে cmহময় পিতা আশুবাবুকে ত্যাগ করে চলে যাওয়া তার চরিত্রের সাথে খাপ খায়না। কারণ তার চরিত্রে শান্ত fmগ্ধতা ছিল পাষণ্ড শিবনাথের সাথে পালিয়ে যাবার মত উগ্রতা লেখক কোথাও দেখাননি। মনোরমা শিবনাথের গানে মুগ্ধ হয়েছিল একথা মানা যায় কিন্তু শুধু একেই ভিÍ করে শিবনাথের জন্য সে বাড়ি ছেড়েছে এটি মানলে তার ব্রহ্মচারিণী সËাকে অস্বীকার করতে হয়। এই সব নানা অসঙ্গতির কারণে শিবনাথ মনোরমা কাহিনিটি পূর্ণতা পায়নি,

> ‘যে মনোরমা শিবনাথ সম্পর্কে ঘৃণা পোষণ করে সেই মনোরমাই যে কি করে শিবনাথের প্রতি আকৃষ্ট হলো, এবং শেষ পর্যন্ত শিবনাথকেই সে বিয়ে করবে ঠিক করল তারও কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তেমনি অজিতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিb হলো কী কারণে, তারও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই।’’ [১২৮](উজ্জ্বলকুমার মজুমদার)

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন,

> ‘‘শিবনাথের প্রতি তার আসক্তি আকস্মিক ও অভাবনীয়। অজিতকে সে অবহেলায় পরিত্যাগ করেছে, যে পিতাকে সে অনুক্ষণ cmহ ও শ্রদ্ধা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল তাকেও সে ছেড়ে গেছে প্রবৃËির অদম্য আকর্ষণে, আশুবাবুর সমগ্র জীবনের

---

128 | D¾jKgvi gRg‘vi m¤úvw‘Z, kirP›‘:†‘k Kvj mvwnZ¨, c_g cKvk: Gwcj 2000, c.126

সঞ্চিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সে দু'পায়ে গুড়িয়ে দিয়েছে; যে মেয়েটিকে সে অপমান করেছে অশিষ্ট ভাষায়, জীবনদেবতার পরিহাসে তারই ক্ষণবাদী দর্শনের দৃষ্টান্ত হয়ে সে বিয়ে করেছে দুর্বৃË দুশ্চরিত্র মাতাল শিবনাথকে।" ১২৯

ক্ষেত্র গুপ্ত বলছেন,

"গল্পের শেষপ্রান্তে খবর পাওয়া গেল মনোরমা- শিবনাথের বিয়ে, তারা আশুবাবুর আশীর্বাদ চেয়েছে। এই ঘটনাবলী কতগুলি ভাবনা নিয়ে আসে। মনোরমা কেন এ কাজ করল? আবেগের তাড়নায় নিশ্চয়ই। কিন্তু আবেগের তাড়নারও একটা সাইকোলজি থাকে। সংগীতপ্রিয় যুবতী কি শিবনাথের গানে মজেছিল? শিবনাথের রূপে? পাপপুণ্যের প্রচলিত বোধ ও রীতিনীতির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন তার বেপরোয়া স্বভাবে? হতেই পারে। কিন্তু এই মার্জিত ভদ্র অ্যারিস্টোক্রাট যুবতীর জীবনে ও চিË দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় স্ফুলিঙ্গটির খোঁজ মেলে না। তার ইঙ্গিতটুকুও লেখক দিলে পাঠকের আফশোস থাকতো না, আর বিশ্বাস হত, অজিতের মত ব্যক্তিত্বহীন, শিল্পবোধহীন যুবক থেকে কেন মনোরমার মন পুরো বিমুখ হল।" ১৩০

অজিতের সাথে কমলের পরিচয় তাজের সামনে। সে বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, মস্ত বড়লোকের ছেলে, তার এক বিধবা খুড়ি ছাড়া সংসারে আর কেউ ছিল না। মনোরমার সাথে বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পরও বিলাতে চার বছর সে তার স্মৃতি সযZ লালন করেছে। এবং ফিরে এসেছে মনোরমাকে বিয়ে করার মানসে। কিন্তু স্বল্পপরিচিত শিবনাথের সাথে নিশীথে মনোরমা বিশ্রম্ভালাপে মË দেখে অজিত তার ভালোবাসাকে বিসর্জন দিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করেনি। কোন প্রk করেনি, কোন কৈফিয়ত চায়নি, কোন চিËসঙ্কটে ভোগেনি, অন্তর্জ্বালার সুতীব্র দহনে দগ্ধ হওয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়নি; খুব স্বাভাবিকভাবে পরদিন কমলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে।

---

129 | fe‡Zvl P‡Ævcva¨vq, kir mvwn‡Z¨i mi/c, c_g cKvk: ‰ekvL 1387, Gwcj 1980, c.122

130 | †¶Î ¸ß, Jcb¨vwmK kirP›' P‡Ævcva¨vq, c‡ev³, c.233-34

কমলের সাথে দ্বিতীয়বার আকস্মিক সাক্ষাতেই সে তাকে নিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে বেড়িয়ে এসেছে। কমলের রূপের মোহে যখন সে মুগ্ধ বিস্মিত সেই সময় কমলের জb¥ পরিচয় পেয়ে তার অন্তর ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। পনের সংখ্যক পরিচ্ছেদে আবার যখন তার কমলের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তখন অজিত তার সাথে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছে। অজিত চরিত্রের এই দোদুল্যমানতা কমল বুঝতে পেরেছিল বলেই হয়ত তার মন স্থির করতে শেষ পর্যন্ত সময় লেগেছে। এবং তাদের পালিয়ে যাবার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন দেখতে পাঠককে আটাশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে—

> ‘‘বিবাহের কথা বারবার বলেচি, বার বার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেছে। নিজের যাবতীয় সম্পদ, যা- কিছু আমার আছে, সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সম্মত হয়নি। আজ এঁদের সুমুখে তোমাকে আবার মিনতি করি কমল, তুমি রাজী হও। আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাঁচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই। ...অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্বসমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।’’ (পরিঃ২৮, পৃ.৫৬৫)

মনোরমা- অজিতের ভালোবাসা, মনোরমা- শিবনাথের ভালোবাসা, কমল- শিবনাথের ভালোবাসার মতই কমল- অজিতের ভালোবাসাও অনাবশ্যক বাকচাতুর্যের ফলে রঙে রসে বিকশিত হতে পারেনি। বর্ণনার চমৎকারিত্বে উপন্যাসটি যতটা শিল্পবোধসম্পb হতে পারত শুষ্ক যুক্তিতর্কের বেড়াজালে তা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি—

> ‘‘অজিত ও কমলের প্রণয় কাহিনী উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। ...এই প্রণয়ের আদানপ্রদানের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন বিশেষ শিল্পচাতুর্য নাই।’’ [১৩১] (সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> ‘‘অজিতের চরিত্রও অত্যন্ত অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাহার কমলের প্রতি মনোভাব গ্রহণ- বর্জনের, উন্মুখতা- বিমুখতার বিপরীত বিন্দুর মধ্যে অসহায়ভাবে আবর্তিত হইয়াছে। ...অজিতের দ্বিধাদোদুল চরিত্রে না আছে

[131] | m‡evaP›‘ †mb¸ß, kirP›‘, c‡ev³, c.101

> নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আশ্রয়, না আছে কমলের ক্ষুধা মিটাইবার উপযোগী মানস বৈচিত্র্য। উপন্যাসের এক জায়গাতে শেষ হইবেই কিন্তু এই উপসংহার চরিত্র-পরিণতির কোন সুস্পষ্ট পর্যায়ের চিহ্নাঙ্কিত নহে।" ১৩২

শুদ্ধসত্ত্ব বসু বলেছেন,

> "প্লটের গাঁথুনি খুবই আল্গা, শুধু মেলানোর কথা বা পরিণতির বর্ণনা দিয়েই গল্পকে বোঝানো হয়েছে, চরিত্র বিশ্লেষণ বা ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণের উপস্থাপনা নেই। কমল আর শিবনাথের প্রেমের পূর্ব ইতিহাস কি, তার বিচ্ছেদই বা কেন—আমরা তা জানতে পারি নাঃ তেমনই মনোরমা- শিবনাথের প্রেমের ব্যাপারটাও কেমন যেন অ™ত ধরনের। যে মনোরমা অজিতের বিলেতে থাকাকালে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতীক্ষারত, সে গভীর রাতেও অজিত ফিরে না আসায় উদ্বিM নয়, এবং ফিরে এলেও সে স্বল্প পরিচিত শিবনাথের সঙ্গে প্রেমালাপে মË। অজিতের সঙ্গে কমলের গভীর রাত অবধি মোটরে করে বেড়ানো—আদৌ বিশ্লেষিত হয়নি।" ১৩৩

এই উপন্যাসে আরও একটি বড় ধরনের অস্বাভাবিক ও আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে নীলিমা আশুবাবুকে কেন্দ্র করে। বিধবা নীলিমা ভMপতি অবিনাশ মুখুয্যের বাড়িতে থেকে তার সংসার এবং সন্তান প্রতিপালনেই নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিয়েছিল। আশুবাবুর পরিবারের সাথে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতার সুবাদে অবিনাশ তার সন্তান 'জগৎ'কে নিয়ে জাVতুতো ভায়ের বাড়ি স্বাস্থ্যউদ্ধারে গেলে নীলিমাকে আশুবাবুর বাড়িতে রেখে যায়। হরেন্দ্রর কাছে এই আশ্চর্য সংবাদটি পেয়ে কমলের সাথে সাথে পাঠকও বিস্মিত হয়—"এই খবরটা এমনি খাপছাড়া যে কমল আর প্রk করিল না ...বিদেশে নিজের বাসায় যা ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু তাই বলে বয়স্থা বিধবা শালী নিয়ে তো জাটতুতো ভায়ের বাড়ি ওঠা যায় না।" (পরিঃ১৮, পৃ.৪৯৮)

ঘটনা এখানেই শেষ নয়, বড় বিস্ময় তখনও বাকি। সেখানে ঘটে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। নীলিমা আশুবাবুকে হঠাৎ ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু এই ঘটনাটি কিভাবে সংঘটিত হল, আশুবাবুর কোন আচরণের জন্য নীলিমা তার অনুরক্ত হয়ে গেল তার কোন কার্যকারণ বা ঘটনা পরম্পরা ব্যাখ্যা করা হয়নি। এমনকি নীলিমার মনের মধ্যে যে এমন একটি

132| kxKgvi e‡›`¨vcva¨vq, e½ mvwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, c‡ev³, c.147
133| ï×mË em, kir mgx¶v, wØZxq g`Y: AvIvp 1384, c.158-159

পরিবর্তন আসছে তার কোন পূর্বাভাসও দেওয়া হয়নি। আশুবাবুর রুগ্ন, প্রায় অচল দেহটির সেবাকে ঘিরে নীলিমার যৌবন উদ্বেল হৃদয়- উৎসারিত ভালোবাসার স্ফুরণ কিভাবে সম্ভব হল সেই বিস্ময়কর কাহিনিটি অব্যক্তই রয়ে গেছে।

কোন ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাব্যতা থাকলেও তা হয়ে ওঠার জন্য যে সুযোগের প্রয়োজন তা নীলিমাকে দেওয়া হয়নি। প্রৌঢ়, বিপত্নীক, শুভ্র, পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রাধিকারী আশুবাবু—চারিত্রিক যে নির্মাল্য দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রতি নীলিমার এমন আকর্ষণ ও আচরণ কাহিনির গাম্ভীর্য বিনষ্ট করেছে। শিবনাথের সাথে মনোরমার পলায়নের মতই নীলিমার ভালোবাসার চিত্রটিও তাকে বিব্রত ও বিচলিত করেছে। কাহিনিটিকে অনিবার্য করে তোলার জন্য যে উপাদান প্রয়োজন তার ঘাটতি থাকায় এটি বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি—

> ''ক' দিন থেকে সে সদাই যেন অন্যমনস্ক, বড় একটা দেখাও পাইনে। চিঠিটা ছিল আমার কলকাতার কর্মচারীর ওপর, আমার বিলেত যাবার সকল আয়োজন শীঘ্র সম্পূর্ণ করে ফেলবার তাগিদ। ...নীলিমা কি- একটা সেলাই করছিল, ভাল- মন্দ কোন সাড়া পাইনে দেখে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার হাতের সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে, মাথাটা চৌকির বাজুতে লুটিয়ে পড়েচে, চোখ বোজা, মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। কি যে হ'লো হঠাৎ ভেবে পেলাম না। ...বোধ করি মিনিট দুই- তিনের বেশী নয়, সে চোখ চেয়ে শশব্যস্তে উঠে বসলো, একবার সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠল, তারপরে উপুড় হয়ে আমার কোলের উপর মুখ চেপে হুহু করে কেঁদে উঠল। সে কি কান্না! মনে হল বুঝি তার বুক ফেটে যায় বা! অনেকক্ষণ পরে তুলে বসালাম,—কতদিনের কত কথা, কত ঘটনাই মনে পড়ল,—আমার বুঝতে কিছুই বাকী রইল না।'' (পরি:২৬, পৃ.৫৫৪)

এ ঘটনা বর্ণনায় লেখকের মনোভাব যা- ই থাক; উপন্যাসে এর প্রভাব পড়েছে ব্যাপক। বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আশুবাবুর প্রতি নীলিমার এই অনুরাগ পোষণকে সর্বাপেক্ষা বিপর্যয়জনক ব্যাপার বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে,

> "আশুবাবুর সহিত তাহার হৃদয়াবেগঘটিত, অশ্রু- উদ্বেল সম্পর্ক- জটিলতা শুধু আশুবাবুর নয়, পাঠকের মনেও বিস্ময়াপ্লুত অবিশ্বাস জাগায়। লেখক এই অপ্রত্যাশিত প্রণয়োচ্ছ্বাসের উদ্ভবরহস্য উন্মোচন করিতে কোন চেষ্টাই করেন নাই, সম্পূর্ণ আকস্মিক পরিণতিরূপেই আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন।" [১৩৪]

অজিতকুমার ঘোষের মতে,

> "ছাব্বিশ পরিচ্ছেদে আশুবাবুর কথায় জানা গেল, নীলিমা তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছে। কিন্তু এই আশ্চর্য ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য ঘটনা ও চরিত্রের যেরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজন লেখক তাহা করেন নাই, সেজন্য ঘটনাটি অতর্কিত ও অবিশ্বাস্য হইয়া রহিয়াছে।" [১৩৫]

কমলের সাথে পরিচয়ে জীবনের আর একটি দিক নীলিমার সম্মুখে উম্মোচিত হয়েছে। কমলের সাথে তার সম্ভাষণ, ভাবের আদান প্রদান এমন কি এক সময়ে তার শিষ্যে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক মনে হয়। নীলিমার কাহিনি মূল রচনার সাথে তেমন একটা সম্পর্কিত না হলেও এইসব অ™ত ব্যাপার সংঘটনের মাধ্যমে উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া লেখক আর কোন শ্রীবৃদ্ধি করতে পারেন নি। ইউরোপীয় ধ্যান- ধারণা পুষ্ট কমলের মত বিধবা নীলিমাকে লেখক বিয়ে দিতে পারেন নি বা তার ভালোবাসাকেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। আর সেজন্যই তড়িঘড়ি করে অবিনাশ মুখুয্যকে স্বাস্থ্যান্বেষণে পাঠিয়ে আZ¥য়ের পীড়াপীড়িতে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়ে এনেছেন—"আমাদের মুখুয্যে মশায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সকলেরই দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি আরোগ্যলাভ করেছেন, এবং পরে দাদা এবং বৌদি তার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর- জবরদস্তি একটি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। লজ্জার সঙ্গে খবরটি তিনি আশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন,—এইমাত্র।" (পরি:২৪, পৃ.৫৩৮)

লেখক আশুবাবুকেও তাড়াতাড়ি বিলেত পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

---

[134] | kxKgvi e‡›'¨vcva¨vq, e½ mwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, c‡ev³, c.147
[135] | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›'i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.383

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে,

> "এই উপন্যাসের মধ্যে আর্টের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা দুর্বল কাহিনী হইতেছে নীলিমার। কমলের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্যের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই; miহের আদানপ্রদানের বাহ্যাড়ম্বর আছে, কিন্তু অন্তরের সুগভীর তলদেশে ইহার ভিËি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নীলিমার নিজের মনে যে পরিবর্তন আসিয়াছে, আশুবাবুর প্রতি তাহার যে ভাবের উদ্রেক হইয়াছে, তাহাও অতিশয় অপ্রত্যাশিত। ইহা শুধু অতর্কিত ও অশোভন নহে, অবিশ্বাস্যও।" [১৩৬]

এছাড়া উপন্যাসে ছোট ছোট কতকগুলি ঘটনা ও কিছু চরিত্র সবই আকস্মিকতাধর্মী; কোথাও কোথাও অস্বাভাবিক। এসব ঘটনা বা চরিত্রের কার্যকারণ শ•Lলা বর্ণনা করা হয়নি। যেমন তিন সংখ্যক পরিচ্ছেদে শিবনাথ এসেছে আশুবাবুর বাড়িতে। মনোরমা স্পষ্টতই তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নিজ ঘরে চলে গেছে। শিবনাথ বিদায় নিয়েছে বেহারার কাছে এ সংবাদ জানতে পেরে বাবা আশুতোষকে যখন অনুযোগ করে বলছে, দুর্বৃË দুশ্চরিত্র মাতালকে প্রশ্রয় না দিতে—ঠিক সেই সময়ে শিবনাথ তার পিছনে দাঁড়িয়ে।
কোন গূঢ় অভিসন্ধি তার নেই জানিয়ে শিবনাথ চলে গেলে কিছুক্ষণ পর দেখা গেল মনোরমাদের বাগানে গাছতলায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ-কমল আকস্মিক বৃষ্টিতে ভিজছে। এখানে একই সাথে বৃষ্টি ও কমলের উপস্থিতি আকস্মিক ও অস্বাভাবিক—"পুনরায় বৃষ্টি শুরু হইয়াছে...। ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ না? যেতে পারেনি, ভিজচে। ...সঙ্গে কে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। ...অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ জাb¦ল, মেয়েটি শিবনাথের সেই স্ত্রী নহে ত?" (পরিঃ৩, পৃ.৪০৯-১০)

শিবনাথ এই সময়ে আশুবাবুর বাড়িতে কেন এসেছে তার যেমন কোন কারণ নেই তেমনি কমল কেন মনোরমাদের বাগানে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে সে এখানে কি কাজে এসেছে তারও ব্যাখ্যা নেই। উপন্যাসের এ অংশেই আকস্মিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ্যে কমলের আবির্ভাব এবং আশুবাবু মনোরমার সাথে তার পরিচয়। এবং পরবর্তী কাহিনি কমলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

---

[136] | m‡evaP›' †mb¸ß, k¨irP›', c‡ev³, c.103

আরেকটি আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে অন্যান্যদের সাথে তার পরিচয়। পাঁচ সংখ্যক পরিচ্ছেদে আশুবাবু তার পরিবার ও পণ্ডিত সমাজকে সাথে নিয়ে তাজমহলের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে গেছেন ঠিক ঐ সময়েই শিবনাথ ও কমল সেখানে উপস্থিত—"সহসা সকলেরই চোখ পড়িয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি। তাজের পূর্বদিক ঘুরিয়া অকস্মাৎ শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া পড়িল।" (পরি:০৫, পৃ.৪১৯)

এখানেই সকলে কমলের রূপ ও তার তার্কিক সËা দেখে চমৎকৃত বিস্মিত হয়েছে।

এরপর কমলের সঙ্গে কোন অজুহাত ছাড়া-ই এই অধ্যাপকমণ্ডলীর বারবার দেখা হয়েছে এবং নানান বিষয়ে তর্ক হয়েছে। কমল একা একপক্ষে, বাকী সবাই তার বিপক্ষে। তারপরও প্রতিবার জয় কমলেরই। মনে হয় লেখক শুধু তর্ক করানোর উদ্দেশ্যেই বিভিb সময়ে তাকে এদের মাঝে আনছেন। একারণে উপন্যাসের কাহিনি সুসংবদ্ধ হয়নি, একপেশে হয়ে গেছে; চরিত্র সুগঠিত হয়নি এবং শিল্পমান ক্ষুণ্ন হয়েছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে,

> "কমল আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। জb¥সূত্রে যে পরিবেশ পেয়েছে তাতে তার পক্ষে এই হিন্দু ভদ্রলোকদের পাড়ায় ঘুর ঘুর করার কোন কারণ দেখি না। কমল তো গোঁড়া নয়, সে তো খুঁজছে না কোন ভারতবর্ষকে, তবে কেন আসছে সে এই হিন্দু পাড়ায়? তার কারণ জানা যায় না।" [১৩৭]

আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে এর পনের দিন পরে অজিত মোটরে করে একা বেরিয়েছে ঘুরতে; পথে হঠাৎ কমলের সঙ্গে দেখা। শরৎ-সাহিত্যে পথে-ঘাটে হঠাৎ বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হরহামেশাই ঘটতে দেখা যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়—

> "সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই, অজিত আশুবাবু ও মনোরমাকে অবিনাশবাবুর বাটিতে নামাইয়া দিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। ...একটা নিরালা জায়গায় সহসা উচ্চ নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনিয়া অজিত চমকিয়া গাড়ি

---

[137] | wmivRj Bmjvg †Pxaix, kirP›' I mvgšÍev', c_g cKvk: †m‡Þ¤i 1978, c.106-107

> থামাইয়া দেখিল, শিবনাথের স্ত্রী কমল। পথের ধারে ভাঙ্গাচোরা পুরাতন কালের একটা দ্বিতল বাড়ি, সুমুখে একটুখানি তেমনি শ্রীহীন ফুলের বাগান,—তাহারই একধারে দাঁড়াইয়া কমল হাত তুলিয়া ডাকিতেছে।" (পরিঃ০৮, পৃ.৪৩০- ৩১)

কমল তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব করেছে। পাশ্চাত্য ঘরানায় মানুষ কমলের কাছে প্রস্তাবটি স্বাভাবিক হলেও ভারতবর্ষীয় প্রচলিত রীতিনীতি লালিত অজিতের কাছে তা ছিল বিব্রতকর। অজিত- কমলকে কাছাকাছি আনার জন্য তাদের এই আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটানো হয়েছে।

কমলের আnŸানে চায়ের নিমন্ত্রণ শেষে অজিত যখন বাড়িতে ফিরে এসেছে তখন রাত্রি গভীর। আশুবাবু তার পথ চেয়ে আছেন কিন্তু মেয়ে তার জন্য উদ্বিM নয়। মনোরমার শয়নকক্ষে আলো জ্বলছে কিনা দেখতে গিয়ে অজিত এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি। বিলাতী ঝাউ ও পাম গাছের ছায়াচ্ছb বৃক্ষতলে শিবনাথ মনোরমা একটি গানের সুর নিয়ে মM। সেই দিনই অজিত মনোরমার হৃদয় সম্পর্ক wQb হয়ে যায়। অজিত নিজেকে মুক্ত মনে করে। কমলের সাথে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়াতে তার আর কোন বাঁধা থাকে না।

কমলের সাথে তৃতীয় সাক্ষাতে অজিত কমলের জb¥ বৃËান্ত জানতে পেরে বিতৃষ্ণায় দূরে সরে গেছে। মাঝে একবার দেখা হলেও সে তাকে উপেক্ষা করেছে। প্রায় মাসাধিককাল কারও কোন সাক্ষাৎ নেই কিন্তু একুশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে কমল যে মুহূর্তে আশুবাবুর বাড়িতে এসেছে ঠিক সেই সময়েই অজিতও এসে হাজির—

> "এ গৃহে অজিত একদিন বাড়ির ছেলের মতই ছিল, কিন্তু আগ্রায় থাকিয়াও আর সে আসে না। হয়ত ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি এই না আসার লজ্জা ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই এমনিই একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে শুধু আশুবাবুই নয়, উপস্থিত সকলেই একটু চমকিত হইলেন।" (পরিঃ২১, পৃ.৫১০)

প্রত্যেকেই আলাদা এসেছে কিন্তু সময়টা একেবারে মিলে গেছে। অজিত কমলকে কাছাকাছি আনতে এই আকস্মিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই সময়েই অজিত কমলকে নিয়ে হঠাৎ পালিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছে।

অজিত অত্যন্ত বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও সে কেন বিবাহ পূর্ববতী সময়ে হবু শ্বশুরের বাড়িতে উঠেছে? এবং দিনের পর দিন সেখানে অবস্থান করছে তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সম্পর্ক ভাঙ্গার পর আশুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার কোন যাবার জায়গা নেই। সে হরেন্দ্রর আশ্রমে গিয়ে আশ্রমবাসী হয়েছে। সে ধনীর সন্তান বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, নিজেও ধনী; ঐ সময়ে মনোরমা এবং কমল উভয়ের কাছ থেকে সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তারপরও সে কেন আগ্রার মাটি কামড়ে পড়ে থেকে আশ্রমবাসী হতে গেল?

হরেন্দ্রর আশ্রম পরিদর্শনে যাওয়ার পর সেখানে অনাহুত অক্ষয়ের অনুপ্রবেশ যেমন আকস্মিক তেমনি রাত্রি তিনটার সময় রাজেন্দ্রর কমলের বাড়িতে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করাও আকস্মিক। পীড়িত শিবনাথের সাথে মনোরমার শয়নকক্ষে তারই বুকের উপর মাথা রেখে চোখ বুজে থাকার নাটকীয় দৃশ্য কমল, অজিত, আশুবাবুর পক্ষে যেমন হতভম্বকর, পাঠকের জন্যও তেমনি বিস্ময় বিমূঢ়কর। নীলিমাকে আশুবাবুর বাড়িতে রেখে অবিনাশের স্বাস্থান্বেষণে যাওয়া ঘটনা হিসেবে অস্বাভাবিক। পরপর দুটো বিয়ে সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে আকস্মিকভাবে। একটি মনোরমা শিবনাথ অপরটি অবিনাশের বিয়ে।

অজিতকুমারের মতে, কমল- শিবনাথের সম্বন্ধ অস্ফুট, কমল- অজিতের সম্পর্ক অবিশ্লেষিত, মনোরমা- শিবনাথের প্রণয় আকস্মিক, আশুবাবুর প্রতি নীলিমার অনুরাগ অপ্রত্যাশিত ও হাস্যকর।" [১৩৮]

রাজেনের প্রতি কমলের প্রণয়ানুভূতির উপ্যাখ্যান উপন্যাসে অস্বাভাবিকতার আরেকটি উদাহরণ। কমল রাজেন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ হলেও কমলের প্রতি রাজেনের রয়েছে চরম উদাসীনতা। রাজেন্দ্রর যে চরিত্র তাতে কমলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই অস্বাভাবিক। তার জাতই আলাদা, সে বিপ্লবী, ভয়হীন, লোভশূন্য, লড়াই করার জন্য একা প্রস্তুত, কারো সহমর্মিতার জন্য সে অপেক্ষা করে থাকে না। অসাধারণ দক্ষতায় কোন কাজ যখন সফলতার মুখে তখন তাকে ত্যাগ করার অপরিসীম

---

[138] | AwRZKgvi †Nvl, kirP‡›`i Rxebx I mwnZ¨wePvi, c‡ev³, c.270

ঔদাসীন্য তার আছে। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত অথচ নিজের বলে কিছুই না রেখে পরের কাজে সমস্ত বিলিয়ে দিয়েছে। বিপ্লবপন্থী রাজেন্দ্রর উপেক্ষাঃ সুন্দরী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী কমলের অঙ্গে দীনতার চীরবস্ত্র পরিয়ে দিয়েছে। তবে কমল বুঝেছে, রাজেন্দ্রর অকলঙ্ক পুরুষ চিËতলে আজও নারী মূর্তির ছায়া পড়েনি। এহেন চরিত্রের সাথে কমলের প্রণয়ানুভূতির যে চিত্র উপন্যাসে অঙ্কন করা হয়েছে তার না আছে কোন ভিËি না আছে পরিণতি। হরেন্দ্রর ভাষায়— "এতবড় কর্মী, এতবড় স্বদেশভক্ত, এতবড় ভয়শূন্য সাধু- চিË পুরুষ আমি আর দেখিনি। ...ও যেমন অবলীলায় পায়, তেমনি অবহেলায় ফেলে দেয়। আশ্চর্য মানুষ!" (পরিঃ১৪, পৃ.৪৭০)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> 'তাহার মতবাদের প্রতি রাজেনের সুস্পষ্ট অবজ্ঞা। এক্ষেত্রে কমলের মনে তাহার প্রতি প্রেমানুভূতি কেবল চরিত্রদৃঢ়তার প্রতি শ্রদ্ধারই নামান্তর। ইহার কোন মনস্ত াত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা দ্বন্দ্বমূলক পরিচয় নাই বলিয়াই ইহা উপন্যাসে গৌণ। এমন কি কমলের প্রণয়াকা•¶ার প্রজাপ্রতিধর্মিত্ব ও আকস্মিকতা ছাড়া ইহা তাহারও কোনো নিগূঢ় ব্যক্তিপরিচয় বহন করে না।" [১৩৯]

কাহিনির প্রয়োজনে আগ্রাতে এসে কতগুলো লোক মিলিত হয়েছিল, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শেষে ধীরে ধীরে সবাই যে যার গন্তব্যে চলে গেছে, কাহিনিও শেষ হয়েছে; কিন্তু রাজেন্দ্রর কোন স্বাভাবিক পরিণতি লেখক দেখাতে পারেন নি। তাই মন্দিরে আগুন লাগিয়ে আকস্মিকভাবে তার মৃত্যু সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন—

> 'গ্রামের এক ঠাকুরবাড়িতে আগুন লাগে, বহুদিনের বহুলোক- পূজিত বিগ্রহমূর্তি পুড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। বাঁচাইবার কোন উপায় আর যখন নাই, সেই প্রজ্বলিত গৃহ হইতে রাজেন্দ্র মূর্তিটিকে উদ্ধার করে। দেবতা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু রক্ষা পাইল না তাঁহার রক্ষাকর্তা। দুই দিন নীরবে অব্যক্ত যাতনা সহিয়া আজ সকালে সে গোবিন্দজীর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। দশ হাজার লোকে কীর্তনাদি- সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাহার নশ্বর দেহ যমুনা- তটে ভস্ম করিয়াছে।" (পরিঃ২৮, পৃ.৫৬৬- ৬৭)

---

[139] | kxKgvi e‡›`¨vcva¨vq, e½ mvwn‡Z¨ Dcb¨v‡mi aviv, c‡ev³, c.146

আধুনিক সাহিত্য কেমন হওয়া উচিৎ তার উদাহরণ হিসেবে শরৎচন্দ্র শেষ প্রk'কে দাবী করতেন। তবে তাঁর দাবী সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচক একমত নন। সে বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করার আগ্রহ আমাদের নেই। আমরা দেখাতে চেয়েছি কাহিনি বিন্যাসের অগ্রগতিতে ও প্লট নির্মাণে আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতার কি প্রভাব পড়েছে। আকস্মিকতা অস্বাভাবিকতার যথেষ্ট উদাহরণ আমরা দেখিয়েছি। তবে এর প্রশংসনীয় দিকও রয়েছে। যদি শরৎচন্দ্র অতি আধুনিক সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে লিখতেন তাহলে হয়ত এটি আরও অন্য রকম হত। উপন্যাস রচনায় তার বড় আশ্রয় ছিল আকস্মিকতা। তবে একথা স্বীকার্য যে আশুবাবুর সপ্রাণতা, অজিতের সারল্য, রাজেনের বিপ্লববাদ, শিবনাথের ভণ্ডামী, মনোরমার নাদানী, নীলিমার সেবাপরায়ণতা, অক্ষয়ের পরর্চ্চা, হরেন্দ্রের পরোপকারিতা—সর্বোপরি কমলের তার্কিকতা নিয়ে রচিত শেষ প্রk স্বকীয়তায় অনন্য।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

উপসংহার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবিভক্ত বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন। তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠকেরা উপাধি দিয়েছিল অপরাজেয় কথাশিল্পী। তার জনপ্রিয়তার কারণ অনেক গবেষক সমালোচক অনুসন্ধান করেছেন। বিচিত্র মানুষের বৈচিত্র্যময় সম্ভার নিয়ে আকস্মিকভাবে সাহিত্যজগতে তার বিস্ময়কর আবির্ভাবে চমকিত সাহিত্যপ্রেমী ও সুধীসমাজ। শরৎচন্দ্র ছিলেন জীবনাভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ একজন শিল্পী। তার সাহিত্যের উপাদান অভিজ্ঞতাসঞ্জাত জ্ঞানের ফসল, ধার করা বর্ণের সমষ্টি নয়।

শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস অত্যন্ত বিখ্যাত। সেগুলির মধ্যে ছয়টিকে আমরা আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি—'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব- ১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব- ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব- ১৯২৭ এবং চতুর্থ পর্ব- ১৯৩৩), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনা- পাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'শেষপ্র kÖ(১৯৩১)।

'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এখানে অনেক চরিত্র ও ঘটনা ভিড় করে আছে, তবে সেগুলো স্থানু নয়। চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে, কোথাও কোথাও আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানে প্রকৃতি ও মানুষ দুই- ই স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হয়নি। প্রথম থেকে ষোল পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মাস ছয়েকের কাহিনিতে শীত ঋতুর একচ্ছত্র প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে পশ্চিমের একটি বড় শহরে শীত পড়ার বর্ণনার ভিতর দিয়ে উপন্যাসের শুরু হলেও মাসতিনেক পরে কলকাতার মেসে সতীশের সাথে সাবিত্রীর চিত্র দৃশ্যায়ণের সময়ও শীতের বর্ণনা, আবার এর মাসখানেক পর উপেন্দ্রর সাথে সতীশ যখন হারাণের বাড়িতে কিরণময়ীর মুখোমুখি তখনও শীতের একটানা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কাহিনি এগিয়েছে। ঋতু বৈচিত্র্যের এই বঙ্গদেশে এত দীর্ঘ সময়ের শীতকালের উপস্থিতি বিসদৃশ ঠেকে।

কয়েকটি ঘটনা অমনোযোগী পাঠকের কাছে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মনে হবে। যেমন মোক্ষদার ভূমিকা। মোক্ষদা একটি মুখ্য চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। পশ্চিমের শহরে বসবাসকারী মোক্ষদা এককালে সতীশদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত। সাবিত্রীকে এড়াতে সতীশ যখন কলকাতার পথে পথে ঘুরছে তখনই দর্জিপাড়ার গলির মোড়ে আকস্মিকভাবে মোক্ষদার সঙ্গে দেখা। এখন সে কলকাতায় সাবিত্রীর মাসি হয়ে তার পাশের ঘরের বাসিন্দা। এই সাক্ষাতের ফলেই সাবিত্রীর সাথে সতীশের বিশেষ সম্পর্কের সূত্রটি আবিষ্কৃত হয়। আকস্মিক এই ঘটনাটির উপর ভিÍ করেই পরের অংশের ভুল বোঝাবুঝির রেশ ধরে প্লটের অগ্রগতি সাধিত হয়। এছাড়া সাবিত্রী সম্পর্কে সতীশের মনে অবিশ্বাস তৈরিতে বেহারী যে ভূমিকা রেখেছে তারও অভিনয় এই মোক্ষদাকেন্দ্রিক।

উপন্যাসের সমাপ্তির ক্ষেত্রে গ্রন্থিমোচনে মোক্ষদার ভূমিকা অনস্বীকার্য। উপেন্দ্র স্বাস্থ্য উদ্ধারে পুরী গিয়ে দৈবাৎ যে হোটেলে ওঠে দেখা যায় সেটি সাবিত্রীর দুশ্চরিত্র ভMপতি ভুবন মুখুয্যের, সেখানেই মোক্ষদা কাজ করে। আকস্মিক এই ঘটনাটি দ্বারা সাবিত্রীর চরিত্র সংক্রান্ত জটিলতার অবসান হয়।
প্রথমে পশ্চিমে সতীশের সাথে এরপর কলকাতায় সাবিত্রীর সাথে শেষে পুরীতে উপেন্দ্রর সাথে যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানেই মোক্ষদাকে গ্রন্থিমোচনে সহায়তাকারী চরিত্র হিসেবে এনে খুব সহজেই কাহিনির জট খুলে একটা পরিণতি দানের চেষ্টা করা হয়েছে।

'দুমকা'র এক বাঙলোতে সতীশ অজ্ঞাতবাসে গেলে আকস্মিকভাবে সরোজিনী সেখানেই বিপদে পড়ে। বিপbকে উদ্ধারে সদাব্যস্ত সতীশ আর্তচিৎকার শুনে দৌড়ে গিয়ে যাকে উদ্ধার করে সে– ই সরোজিনী। সে কিভাবে এখানে এলো তার যেমন কোন ব্যাখ্যা নেই তেমনি তার পুরো পরিবার বৈদ্যনাথে এসে কেন বাস করছে তারও পূর্ব ইঙ্গিত মেলে না। এই আকস্মিকতার ফলে দুজনের নৈকট্য লাভের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিণতির একটা সূত্র মেলে।

সতীশ- সাবিত্রী এবং উপেন্দ্র- সতীশের দীর্ঘবিচ্ছেদ রচনা করে কাহিনির জটিলতা সৃষ্টিতে সাবিত্রীকে সতীশের ঘরে এনে গৃহস্থবধূর মত বসে পান সাজার মুহূর্তে হঠাৎ উপেন্দ্রর সস্ত্রীক উপস্থিত হওয়া যেমন আকস্মিক তেমনি কোন ঠিকানা না জেনেই সতীশের বর্মা থেকে কিরণময়ী- দিবাকরকে এবং কাশী থেকে বেহারীর মাধ্যমে সাবিত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসাও কম বিস্ময়কর নয়।

এই উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিতেও লেখককে অস্বাভাবিকতা ও ভাবালুতার আশ্রয় নিতে দেখা যায়। স্বাস্থ্য, শক্তি, রূপ, ঐশ্বর্যশালী জমিদার তনয়ের বসবাস মেসে, পড়ে হোমিওপ্যাথি, ভালোবাসে মেসের ঝিকে যে বিধবা ও কুলত্যাগিনী। তাদের প্রণয়কাহিনি যেমন বাস্তবঘেষা হয়নি তেমনি উপেন্দ্র চরিত্রটিকে আদর্শ বা নমস্য বলা হলেও তার আদর্শগত দিক উপন্যাসে উপেক্ষিত। সে অলস, কাজে দক্ষ নয়, আদালতে পসার নেই, সাহসী বা দূরদর্শী এমন পরিচয়ও পাওয়া যায় না। তবে সে সংযোগকারী চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিরণময়ী, সরোজিনী, জ্যোতিষ, মোক্ষদা, এমনকি সাবিত্রীর ভগ্নিপতি ভুবন মুখুয্যের সাথে তার আকস্মিক সাক্ষাতের সূত্র ধরেই উপন্যাসের প্লট এগিয়েছে। তবে প Zীপ্রেমে মুগ্ধ সুস্থ স্বাভাবিক উপেন্দ্রর আকস্মিকভাবে একই রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে এত দ্রুত মৃত্যুবরণ স্বাভাবিক মনে হয়নি।

এছাড়া কিরণময়ী চরিত্রের অসঙ্গতি এখানে যে, মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে পরপুরুষের সাথে প্রেমলীলায় মেতে ওঠা বা কারো সুখী দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা শুনেই তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে তাকে ভালোবাসার প্রস্তাব দেওয়া, প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার cmহাস্পদকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থকারীর পক্ষে সেই ব্যক্তির অসুস্থতার সংবাদ শ্রবণমাত্রই মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাওয়া এবং আকস্মিকভাবে উন্মাদ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক হয়নি বরং পরিণতিটি সহজ সমাধান বলে মনে হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সর্ববৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীমূলক রচনা। এখানে মূলত শ্রীকান্ত- রাজল²ীর প্রেমের নানা রূপের চিত্র গ্রহণ- বর্জনের উন্মুখতা- বিমুখতার মধ্যে দিয়ে বিচিত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতে ইন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও সপ্তম পরিচ্ছেদে তার বিদায় উভয়ই আকস্মিকভাবে সূচিত হয়েছে। আবার অbদাদিদির বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। হঠাৎ সাপের ছোবলে শাহজীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অbদাদিদির অন্তর্ধানও ইন্দ্রনাথের অন্তর্ধানের মতই আকস্মিকতায় পর্যবসিত। চার খণ্ডের বৃহৎ উপন্যাসে তাদের উপস্থিতি আর পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্র তার বিভিb উপন্যাসে একেকটি অনুষঙ্গকে এনে প্লটকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এই উপন্যাসে শ্রীকান্তের বারবার জ্বরে আক্রান্ত হওয়া তেমনি একটি অনুষঙ্গ। এখানে বার বার জ্বরের প্রভাবে কাহিনির মোড় পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে তিনবার জ্বর হয়েছে। প্রথমবার ইন্দ্রনাথের সাথে নিশীথ এ্যাডভেঞ্চারের পর, দ্বিতীয়বার রামবাবুর বাড়িতে এবং তৃতীয়বার পাটনায় রাজলক্ষ্মীর বাড়িতে। রামবাবুর বাড়িতে জ্বরের কারণে রাজলক্ষ্মীর সাথে তার দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে এবং কাহিনি 'প্রয়াগ' কেন্দ্রিক না হয়ে রাজলক্ষ্মীমুখী হয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্তের দুইবার জ্বর হয়—বর্মায় মনোহর চক্রবর্তীর শুশ্রূষা করতে গিয়ে অসুস্থ হলে অভয়ার কাছে আশ্রয় লাভ করে। এর মাধ্যমে বিদ্রোহিণী অভয়াকে সমাজ সংসারে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং এরপর কাহিনি বর্মা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসে।

কাশী থেকে অভিমানভরে শ্রীকান্ত গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার সাথে সাথে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়; উপরন্তু মানিব্যাগ খোয়া যায়, ফলে অর্থ সাহায্যের জন্য রাজলক্ষ্মীর শরণাপb হতে হয়। রাজলক্ষ্মী দশক- দুই

পর নিজগ্রামে আসতে পারে এবং এখানে শ্রীকান্ত তাকে স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দেয়।

তৃতীয় পর্বে পথ হারিয়ে চক্রবর্তীর বাড়িতে আশ্রয় নিলে আকস্মিক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চার দিন সেখানে অবস্থান করতে হয়, এসময়ে রাজলক্ষ্মীর সাথে তার একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়।

চতুর্থ পর্বে মুরারিপুরে বৈষ্ণবীদের আখড়ায় শ্রীকান্তের শেষ জ্বর, রাজলক্ষ্মীর অতিরিক্ত মনোযোগের ফলে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে কমললতা- বড়গোঁসাইজীর সন্দেহ ঘনীভূত হয়, মালাবদলের অনুরোধ করে, রাজলক্ষ্মীর সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে।

কুমারসাহেবের শিকার পার্টিতে এসে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয় শ্রীকান্ত যে বাইজির রূপে ও গানে—মুগ্ধ, আচরণে বিস্মিত, সেই পিয়ারী বাইজি- ই তার বাল্যসখী রাজলক্ষ্মী! আবার স্টেশনে নেমেই হঠাৎ পাঠশালার বন্ধু গহরের সাথে দেখা, কমললতার সাথে পরিচয়, প্রণয় নিবেদন প্রভৃতি দিয়ে কাহিনি ভিbমুখে প্রবাহিত করার চেষ্টা কোনটাই স্বাভাবিক নয়। গহরের সাথে পথে আকস্মিকভাবে দেখা না হলে কাহিনি কোন দিকে মোড় নিত বলা মুশকিল। কাশীর ফেরত ট্রেনে আসা ঠাকুরদা ও রাঙ্গাদিদির সঙ্গে শ্রীকান্তের অকস্মাৎ প্লাটফর্মে দেখা। পুরো উপন্যাসজুড়েই এমন হঠাৎ হঠাৎ নানান লোকের সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে কাহিনি এগিয়েছে।

আট বছর পূর্বে বর্মায় আসা অভয়ার স্বামীকে খুঁজে বের করার ঘটনাটি এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা। বর্মা রেল কোম্পানী কর্তৃক বহিষ্কৃত এই লোকটিকে শ্রীকান্ত অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও সন্ধান পায়নি। অকস্মাৎ শ্রীকান্তের টেবিলে কোন এক দৈব নির্দেশেই একটি ফাইল এসে হাজির হয়, নাম পড়েই শ্রীকান্ত বুঝে ফেলে ইনিই অভয়ার স্বামী। এই সব আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে কাহিনির সরলীকরণ করে মেলানোর কাজটি আপাত- সহজ হয়ে গেলেও শিল্পের দিক থেকে রচনাটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে শরৎচন্দ্র পু•Lানুপু•L বর্ণনার মাধ্যমে মনো- জটিলতা ও আরোপিত দ্বন্দ্বে ক্ষত- বিক্ষত প্রধান তিনটি চরিত্রের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি এবং তাদের জটিলতা অবসানে ও পরিসমাপ্তিতে উÈীর্ণ হতে কিছু আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন।

বিভিb স্থানে নাটকীয় পরিচর্যার মাধ্যমে মহিমের যত্র তত্র হঠাৎ উপস্থিতি প্লটের জটিলতা সৃষ্টিতে ও নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ব্রাহ্মমেয়ের কবল থেকে বন্ধুকে উদ্ধারের অভিপ্রায়ে অচলার বাড়ি গিয়ে সুরেশ নিজেই যখন মুগ্ধ, ঘনিষ্ঠ, হস্তচুম্বনরত ঠিক সেই সময়ে মহিমের আকস্মিক উপস্থিতিতে পরিস্থিতি জটিল অথবা সুরেশের সম্মুখে দাম্পত্য কলহাশ্রু ঝরে পড়ার মুহূর্তে মহিমের অপ্রত্যাশিত দৈবনিয়ন্ত্রিত আগমনে উভয়েই চমকিত অথবা ডিহরীতে পলায়নরত অচলা- সুরেশের জমকালো সাজে রামবাবুর বাড়িতে পদার্পণ মাত্র আকস্মাৎ মহিমের বিস্ময়কর উপস্থিতিতে ঘনীভূত সমস্যার সমাধান যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে ত্রিভুজ প্রেমের ট্র্যাজেডি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অচলা- মহিমের কলহরত অবস্থায় সুরেশের হঠাৎ আগমন, বিচলিত অচলা, সুরেশের উন্মË প্রেমের প্রকাশে সুপ্ত অনুরাগ আবারও ক্রিয়াশীল। এ সময় অচলার মনের ঘরে ও মহিমের বসতগৃহে আকস্মিকভাবে আক্ষরিকঅর্থে অMিদাহ হয়। কার্যকারণহীন ভাবে সংঘটিত এ অMিকাণ্ডের পেছনের কোন ঘটনা গ্রন্থমধ্যে অনুক্ত। ব্রাহ্মমেয়েকে বিয়ের ফলে ব্রহ্মার অকৃপা হয়েছে বলে জানা যায় তবে অচলার মনের ঘরে অনল সৃষ্টিতে সুরেশের আবেগী প্রেমের প্রকাশ যেমন দায়ী, মহিমের অন্তর্মুখি আচরণও সে দায় এড়াতে পারে না। এছাড়া মৃণালের একটা ভূমিকাও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল। আকস্মিকভাবে গৃহদাহের প্রভাবে অচলা- মহিমের সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে এবং কাহিনি আবার কলকাতামুখি হয়।

এই উপন্যাসে বিভিb স্থানে প্লটের মোড় পরিবর্তনে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টিকে ব্যবহার করা হয়েছে। স্থান- কালভেদে সম্ভাবনাহীন বৃষ্টির আকস্মিক আগমন আরোপিত হয়ে প্লটকে প্রkবিদ্ধ করেছে। শ্রাবণে কলকাতার

পটলডাঙ্গা থেকে অচলার শ্বশুরবাড়ি রাজপুর গ্রামে যাত্রাপথে প্রথম বৃষ্টি শুরু—ফল—কর্দমাক্ত পথ, গৃহ অন্ধকারাচ্ছb, মন কুয়াশাচ্ছb, বিষb।
শীত পড়ি পড়ি করছে এমন সময়ে বৃষ্টির দরুণ অসুস্থ শাশুড়ির সেবা করতে মৃণালের সুরেশের গৃহত্যাগ, অচলার স্বামী– সঙ্গলাভ।
ফাল্গুনে কলকাতার স্টেশনে যে বৃষ্টির শুরু মোগলসরাইতে ট্রেন পরিবর্তনের সময় সেই বৃষ্টির রুদ্ররূপের ফলে অচলার জীবনের নিরতিশয় অন্ধকারের সূচনা। সুরেশ কর্তৃক অচলাকে নিয়ে ট্রেন পরিবর্তন। ডিহরীতে অবতরণের পরও নিস্তার নেই। বৃষ্টির কল্যাণেই অসুস্থ সুরেশের সেবায় স্বামী– স্ত্রীরূপে রামবাবুর বাড়িতে অবস্থান, শীতে বৃষ্টির ভিতর দিয়েই নূতন বাড়িতে ওঠা এবং ততোধিক দুর্যোগের রাত্রিতে সতীধর্মের বির্সজনে জীবনের গভীরতর ট্র্যাজেডি সংঘটিত হওয়া—সবই বৃষ্টির কল্যাণে সম্পb হয়েছে।

রাক্ষুসী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক কলকাতার সাথে ডিহরীর যোগসূত্র স্থাপনে যেভাবে এগিয়েছেন তাতে কিছু আতিশয্য বিদ্যমান। ট্রেনে অচলার সাথে পরিচয়, পালিয়ে ডিহরীতে তারই শ্বশুর– বাড়ি ওঠা, আবার সেই মেয়ের শ্বশুর– বাড়ি কলকাতার পটলডাঙ্গায়– ই হওয়া এবং তারই সূত্র ধরে মহিমের ডিহরীতে উপস্থিতি অতিরঞ্জন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সম্পাদিত হয়েছে। একজন ব্যক্তির সাথে এভাবে বারবার সাক্ষাৎ একমাত্র দৈব নির্দেশেই ঘটতে পারে, বাস্তবে সাধারণত এমনটি ঘটে না।

উপন্যাসের শুরুতে মহিম ও সুরেশের পারিবারিক পরিমণ্ডল লক্ষ্য করলে দেখা যায় উভয়েরই পিতা– মাতা বা অন্য কোন আত্মীয় নেই মহিমের পিতৃবন্ধু কন্যা মৃণাল এবং সুরেশের এক পিসিমা ব্যতীত। অথচ সুরেশ এত ধনী যে অচলা এবং কেদারবাবু তার বাড়িতে গিয়ে বিশাল বিË– বৈভব দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সুরেশের এই পরিমাণ ধনসম্পদের অর্থনৈতিক উৎস সম্পর্কে গ্রন্থমধ্যে কোন উল্লেখ নেই।

মহিম– সুরেশ বাল্যকাল থেকে প্রাণের বন্ধু। একই স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করে, সুরেশ দুইবার নিজের জীবন বিপb করে বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করে। পাশাপাশি কেদারবাবু মহিমকে দুই বছর যাবৎ জানেন, সে তার

একমাত্র কন্যার জামাতা হিসেবে মনোনীত অথচ সুরেশ বা কেদারবাবু কেউ- ই জানেন না মহিমের গ্রামের বাড়ি কোথায়? এটি অস্বাভাবিক মনে হয়।
শুরুতে অচলার বয়স সতেরো- আঠারো বছর বলা হলেও শেষে সামঞ্জস্যহীনভাবে একুশ বছর বয়স উল্লেখের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

'দেনা- পাওনা' উপন্যাসে বীজগাঁয়ের জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী বকেয়া খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে জমিদারীতে এলে দেবোËর সম্পতিË নিয়ে মন্দিরের সেবায়েত তারাদাসের সাথে তার বিরোধের সূত্রপাত হয়। পেয়াদারা তাকে ধরে নিতে এলে বাড়িতে না পেয়ে কটুক্তি করায় তার একমাত্র কন্যা ভৈরবী ষোড়শী হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হয়ে জমিদারের প্রমোদকুঞ্জে গিয়ে হাজির হলে সেখানে ঘটে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। নির্যাতনের শিকার হবার মুহূর্তে অকস্মাৎ জমিদার জীবানন্দের তীব্র কলিকের ব্যথা অনুভূত হলে ষোড়শীকে বন্দী করে রাখার আগমুহূর্তে তার সেবা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ঘটনার একপর্যায়ে জানা যায় জীবানন্দের সাথে ষোড়শী তথা অলকার বাল্যকালে বিয়ে হয়েছিল। আকস্মিকভাবে স্বামী- স্ত্রী সম্পর্কটি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তাদের মনোজগতের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে প্লট প্রভাবিত হয়। দেখা যায় এই আকস্মিক ঘটনাটি পুরো উপন্যাসটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ষোড়শীকে জমিদারকুঞ্জ থেকে উদ্ধারে যিনি তদন্তে এসেছেন কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সেই জেলার ম্যজিস্ট্রেট কে- সাহেবের সাথে জীবানন্দের পূর্ব শত্রুতার জের রয়েছে। আবার উপন্যাসের শেষ অঙ্কে এই ম্যজিস্ট্রেটের দৌরাত্মেই ষোড়শীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবানন্দ পলায়ন করে বাঁচে এবং পাঠক একটা মিলনাত্মক পরিণতিতে তৃপ্তি লাভ করে।

অত্যাচারী, মদ্যপ জমিদারের উপন্যাসের সমাপ্তিতে প্রজাদরদী সেবকে রূপান্তর যেমন অস্বাভাবিক মনে হয়, বিপরীতে ষোড়শীর দৃঢ় কঠিন রূপ হঠাৎ রমণীয় হয়ে স্বামীপ্রীতিতে রূপান্তর তেমন স্বাভাবিক মনে হয় না।

ষোড়শীর একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে ভূস্বামী জনার্দন রায়ের ব্যরিস্টার জামাতা নির্মল বসুর প্রতিপক্ষ রূপে আকস্মিকভাবে উপন্যাসে যার প্রবেশ ঘটে সেই মুসলমান ফকির একজন আইন ব্যবসায়ীও ছিলেন বটে। তারই আশ্রমে ষোড়শী- নির্মলের হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। এবং আকস্মিক ঝড়- জলের মুখোমুখি হলে বিপর্যস্ত নির্মলের হাত ধরে ষোড়শী তাকে বাড়ি পৌছে দেয়। ফলে সে তার প্রতি মুগ্ধ হয় এবং তীব্র আকর্ষণবোধ করে। এই আকষর্ণহেতু একটি পত্র পেয়ে সুদূর পশ্চিম থেকে স্ত্রী- পুত্র ফেলে আটশো ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে শ্বশুর গৃহে এসে শ্বশুরেরই বিপক্ষে ষোড়শীর হয়ে আইনি লড়াই করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। এদিকে নির্মলের সাহায্য চেয়ে লেখা একটি পত্রের ছিb অংশ কুড়িয়ে পেয়েই তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক আছে অনুমান করে জীবানন্দের ঈর্ষান্বিত হওয়া অস্বাভাবিক মনে হয়।

'পথের দাবী' উপন্যাসটি রাজনীতিনির্ভর ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী। তৎকালীন উËাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পথের দাবী জনমানসে চরম উেËজনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। শরৎচন্দ্র তার রাজনৈতিক চেতনার অংশ হিসেবে স্বাধীনতার আকা•¶া এবং দুর্গত শোষিত দেশবাসীর মুক্তির জন্য আন্দোলন—লৌহমানব সব্যসাচী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। বঙ্গদেশ, ভারত ও সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নেতা সব্যসাচী চরিত্রটি অঙ্কনে তিনি যেসব যোগ্যতা আরোপ করেছেন তা একজন ব্যক্তির পক্ষে ধারণ করা আক্ষরিক অর্থে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সে দশ- বারোটি ভাষায় সমান পারদর্শী এবং একাধারে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজ্ঞ। তার ছদ্মবেশ ধারণক্ষমতা অসাধারণ। পিস্তল চালনায় দক্ষ—লক্ষ্য অব্যর্থ। ক্ষীণকায় হলেও অসুর- শক্তি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অন্ধকারে দর্শন ক্ষমতা প্যাঁচার মত, ধৈর্য অসীম, সাহস অবর্ণনীয় এবং বিভিb দেশের গুপ্তসমিতি নিয়ন্ত্রণকারী। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও তার কর্ম পদ্ধতি গ্রন্থমধ্যে অনুক্ত।

ডাক্তারের কাজের সমালোচনা বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা মারাZ¥ক অপরাধ কিন্তু ব্রজেন্দ্র সুরভায়ায় তাকে হত্যাচেষ্টার পরও দলের প্রতিটি গুপ্তসমিতির সভায় উপস্থিত থেকেছে। সব্যসাচী পাহাড় ডিঙিয়ে,

সাগর পেরিয়ে যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বর্মা এসেছিল সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের কোন সক্রিয় কর্মকাণ্ড উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় নি। তাছাড়া সুমিত্রা বিদেশি নারী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রে কিভাবে চলে এলো তা যেমন অনুক্ত তেমনি লক্ষ্য অর্জনের আগেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে তা ভোগ করার জন্য তার দেশে ফিরে যাওয়াও উপেক্ষিত। একমাত্র ডাক্তারকে ভালোবাসা ছাড়া তার আর কোন সক্রিয় কর্মকাণ্ড এখানে পাওয়া যায় না।

অপূর্ব অফিসের কাজে দিন পনেরোর জন্য বাইরে গিয়ে ফিরে এসে দেখে ভারতীর পিতা-মাতা উভয়েই হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছে এবং তেওয়ারী বসন্তরোগে মৃতপ্রায়, ভারতী সেবার মাধ্যমে তখনও তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই আকস্মিক ঘটনাটি দ্বারা অপূর্ব ভারতীর সাথে পরিচয়ের সুযোগ পায় এবং তারই সূত্র ধরে পথের দাবীর সংস্পর্শে এসে কাহিনির মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে ভারতী হঠাৎ বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিভাবে পথের দাবীর সেক্রেটারী হয়ে গেল তা জানা যায় না।
অথবা বাইরের লোক হওয়া সত্ত্বেও সাংঘাতিক গোপন সভায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে কোনরূপ মতামত ছাড়াই অপূর্বর পথের দাবীর সভ্য হয়ে যাওয়া কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয়।

উপন্যাসের সমাপ্তিতেও লেখক আকস্মিকভাবে অপূর্বর মায়ের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। অপূর্ব বিপ্লবী দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরা পড়লে গুপ্তসমিতি থেকে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতীর ভালোবাসাকে মূল্য দিতে ডাক্তার তাকে নতুন জীবন দান করলে অপূর্ব কলকাতায় মায়ের কাছে ফিরে যায়। অথচ ততক্ষণে তার মা বর্মা এসে আকস্মিক নিউমোনিয়ায় মৃত্যুবরণ করে। ফলে বাধাহীন অপূর্ব অনিবার্যভাবে খৃস্টান ভারতীর কাছেই ফিরে আসে।

‘শেষ প্রk’ উপন্যাসটিকে শরৎচন্দ্র অতি আধুনিক সাহিত্যকর্ম বলে বিবেচনা করতেন। প্রাচীন ও জীর্ণ সমাজ-সংস্কারকে বদলে আধুনিক সমাজ গঠন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তিনি যে মতবাদ কমলের তর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তৎকালে সমালোচকদের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য না হলেও কালের বিবর্তনে বর্তমানে সেই সত্যই প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয় ভাবধারা-পুষ্ট কমল দুশ্চরিত্র মায়ের এবং ইংরেজ পিতার অবৈধ সন্তান। কমল তর্কে পারদর্শী। আগ্রার বাঘা বাঘা সব অধ্যাপক তার কাছে তর্কে পরাজিত। তার এই তার্কিক ক্ষমতার উৎস গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। সমালোচকদের জিজ্ঞাসা এত বিদ্যাবুদ্ধি কমলের মত মেয়ে পেল কোথায়। উপন্যাসে তার তার্কিকতা আরোপিত মনে হয়। ইতিহাসের অধ্যাপক অক্ষয়ের তীক্ষ্ণ খোঁচায় সবাই পর্যুদস্ত হলেও সে কমলের যুক্তি-তর্কের কাছে পরাস্ত হয়েছে বারবার। বিলাতফেরত আশুবাবু, ইঞ্জিনিয়ার অজিত প্রত্যেকেই তার সৌন্দর্যে এবং তর্কে সম্মোহিত হয়ে নতি স্বীকার করেছে। সমগ্র উপন্যাসে কমলকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকারী অক্ষয়ের উপন্যাসের শেষে এসে আকস্মিকভাবে কাঁচুমাচু হয়ে করুণা ভিক্ষা অস্বাভাবিক ও আরোপিত মনে হয়।

তাজমহলের সামনে সাক্ষাতের দিন বোঝা গিয়েছিল শিবনাথ-কমলের বন্ধন অটুট অথচ এর দিন পনের পর আকস্মিকভাবে জানা যায় শিবনাথ আর কমলের কাছে আসে না। এত অল্প সময়ে কমলের মোহমুক্ত হয়ে অন্য নারীতে আসক্তি অবিশ্বাস্য মনে হয়। কমল-শিবনাথের ভালোবাসার কোন চিত্র বা আকস্মিক বিচ্ছেদের স্পষ্ট কোন কারণও গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। শিবনাথের বিমুখতা বা পরনারীতে আসক্তি যেমন স্পষ্ট নয়, কমলের নিস্পৃহতাও তেমনি অস্বাভাবিক। আবার অসুস্থতার ভান করা শিবনাথের বুকের উপর মাথা রেখে ক্লান্ত মনোরমার শয়ন কক্ষের আকস্মিক দৃশ্যে হতভম্ব পাঠককুল। তবে কমলের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হয়নি। সে যেভাবে মনোরমাকে ক্ষমা করে আশুবাবুকে তাদের আশীর্বাদ করতে বলেছে তাতে তার চরিত্রে মানবিকতার পরিবর্তে দেবত্ব অর্পিত হয়েছে।

স্বামীজ্ঞানে অজিতের জন্য দীর্ঘ সাধনার পর এবং শিবনাথকে দুশ্চরিত্র, লম্পট, পাষণ্ড বলে জানা সত্ত্বেও কোন মন্ত্রবলে মনোরমা তৃতীয়বারের মত দার পরিগ্রহ করতে আসা শিবনাথের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হল এবং পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে গেল তা বোঝা যায় না। মনোরমা চরিত্রের এই পরিবর্তনটা আকস্মিক মনে হয়। শুরুতে তার ব্রহ্মচারিণী স্নিগ্ধ সত্তার সাথে পরের উগ্র আচরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপন্যাসে আকস্মিকভাবে নীলিমা আশুবাবুকে কেন্দ্র করে লেখক পাঠককে যে গল্প শুনিয়েছেন তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমন বিস্ময়কর। শুভ্র চরিত্রের অধিকারী বিপত্নীক এই প্রৌঢ় পত্নীপ্রেমের স্মৃতিতে বিভোর। বিধবা নীলিমা কিভাবে এই বৃদ্ধকে ভালোবেসে ফেললো সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কোন মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। উপন্যাসে পাঁচটি প্রণয় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কমল–শিবনাথ, অজিত–মনোরমা, কমল–অজিত, মনোরমা–শিবনাথ ও আশুবাবু–নীলিমা—প্রত্যেকটি সম্পর্ক বিশ্লেষণে মধ্যবর্তী স্তরবিভাজন উপন্যাসে অনুপস্থিত। ফলে সম্পর্কগুলি বিশ্বাস্য হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। মনোরমা–শিবনাথের প্রতি, অজিত–কমলের প্রতি কার্যকারণহীন ভাবে অনুরক্ত হয়ে ওঠে। আশুবাবু–নীলিমার সম্পর্কটি কষ্ট–কল্পিত ও হাস্যকর হয়ে উঠেছে তাদের ব্যক্তিত্ব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে। এছাড়া বিপ্লবপন্থী রাজেন্দ্রের প্রতি কমলের প্রণয়ানুভূতির পরিণতিহীন চিত্রটি মুল গল্পের সাথে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি।

উপন্যাসে কয়েকটি দৃশ্যাঙ্কনের ক্ষেত্রে আকস্মিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যার কার্যকারণ শৃংখলা বর্ণনা করা হয়নি। আগেই বলা হয়েছে যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেই ব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতি শরৎ–সাহিত্যের একটি সাধারণ চিত্র। এই উপন্যাসে তার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

শিবনাথের আসা মনোরমার পছন্দ নয় কথাটি পিতাকে বলার মুহূর্তে—ঠিক তার পিছনে শিবনাথ দাঁড়িয়ে।

কমল আকস্মিক বৃষ্টিতে মনোরমাদেরই বাগানে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেন ভিজছে? আবার আশুবাবুরা যে সময়ে তাজমহলে গেছে ঠিক ঐ মুহূর্তেই শিবনাথ ও কমল সেখানে হাজির।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মোটরে করে ঘুরে বেড়ানোর সময় হঠাৎ এক স্ত্রীলোকের আহ্বানে কাছে গিয়ে দেখে সে কমল। মাসাধিককাল পর কমল যে মুহূর্তে আশুবাবুর বাড়িতে ঠিক তখনই অজিতেরও আকস্মিক উপস্থিতি।

এইসব নানা ধরনের অস্বাভাবিক ও আকস্মিক ঘটনা দ্বারা কাহিনি নানামুখি স্রোতে প্রবাহিত হয়ে সমাপ্তির দিকে এগিয়েছে। ফলে অনেক সময় মনে হয়েছে পরিণতিটি অবিশ্বাস্য বা আরোপিত। আকস্মিক ঘটনা দ্বারা কাহিনির মোড় বারবার পরিবর্তিত না হলে হয়ত পরিণতিটি চরিত্রের চাহিদা অনুযায়ী সম্পb হত। এইসব আকস্মিক ঘটনা মূল রচনাটির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে কাহিনির গতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি রচনায় কোন না কোন ভাবে আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কখনো কাহিনির অগ্রগতির প্রয়োজনে, কখনো চরিত্রের বহির্দ্বন্দ্ব বা অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টিতে, কখনো প্লটের জটিলতা সৃষ্টিতে, কখনো গ্রন্থিমোচনে, কখনোবা পরিসমাপ্তি টানতে এই সব অসঙ্গতির আশ্রয় নিতে দেখা যায়। আমাদের আলোচিত ছয়টি উপন্যাসে তো আছেই এমনকি তার প্রথম প্রকাশিত রচনা 'বড়দিদি' তে যেমন অস্বাভাবিক ঘটনা রয়েছে তেমনি জীবিতাবস্থায় প্রকশিত তার শেষ রচনা 'বিপ্রদাস' অথবা জীবনাবসানের পর প্রকাশিত 'শুভদা' প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা রয়েছে এবং তার প্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তবে শরৎ- সাহিত্যে কিছু অস্বাভাবিকতা বা আতিশয্য থাকলেও তার লেখনির গুণেই এইসব অস্বাভাবিক বা আকস্মিক ঘটনাগুলি পাঠকেরা উপন্যাসের অপরিহার্য অংশ বলে গ্রহণ করেছে। শরৎচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৌতুকভরে লিখেছিলেন তার 'সাধারণ মেয়ে' (১৩৩৯) কবিতাটি।

পরিশিষ্ট

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত গল্প ও উপন্যাসের তালিকা

কয়েকটি প্রবন্ধ কিছু অসমাপ্ত এবং টুকরো লেখা ব্যতীত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা নিCg দেওয়া হলঃ—

‘বড়দিদি’ (উপন্যাস), ১৩২০ সাল, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ।
‘বিরাজ বৌ’ (উপন্যাস), বৈশাখ ১৩২১ সাল, ২ মে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ।
‘বিন্দুর ছেলে’ (গল্প সমষ্টি), শ্রাবণ ১৩২১ সাল, ৩ জুলাই ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ।

ক. ‘রামের সুমতি’, ফাল্গুন- চৈত্র ১৩১৯ সাল।
খ. ‘পথনির্দেশ’, বৈশাখ ১৩২০ সাল।
গ. ‘বিন্দুর ছেলে’, শ্রাবণ ১৩২০ সাল।

‘পরিণীতা’ (উপন্যাস), ১৩২১ সাল, ১০ আগস্ট ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ।
‘পণ্ডিত মশাই’ (উপন্যাস), ১৩২১ সাল, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ।
‘মেজদিদি’ (গল্প সমষ্টি), অগ্রহায়ণ ১৩২২ সাল, ১২ ডিসেম্বর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ।

ক. ‘আঁধারে আলো’, ভাদ্র ১৩২১ সাল।
খ. ‘মেজদিদি’, কার্তিক ১৩২১ সাল।
গ. ‘দর্পচূর্ণ’, মাঘ ১৩২১ সাল।
ঘ. ‘দেওঘরের স্মৃতি’, আষাঢ় ১৩৪৪ সাল।

‘পল্লীসমাজ’ (উপন্যাস), মাঘ ১৩২২ সাল, ১৫ জানুয়ারী ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ।
‘চন্দ্রনাথ’ (উপন্যাস), ১২ মার্চ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ।
‘বৈকুণ্ঠের উইল’ (গল্প), ১৩২৩ সাল, ৫ জুন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ।
‘অরক্ষণীয়া’ (গল্প), কার্তিক ১৩২৩ সাল, ২০ নভেম্বর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ।
‘শ্রীকান্ত’ ১ম পর্ব(উপন্যাস), মাঘ ১৩২৩ সাল, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ।
‘দেবদাস’ (উপন্যাস), আষাঢ় ১৩২৪ সাল, ৩০ জুন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ।
‘নিষ্কৃতি’ (গল্প), ১ জুলাই ১৯১৭।

‘কাশীনাথ’ (গল্প সমষ্টি), ভাদ্র ১৩২৪ সাল, ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ।

ক. ‘মন্দির’, আশ্বিন ১৩০৯ সাল।

খ. ‘বোঝা’, কার্তিক- পৌষ ১৩১৯ সাল।

গ. ‘বাল্যস্মৃতি’, মাঘ ১৩১৯ সাল।

ঘ. ‘কাশীনাথ’, ফাল্গুন- চৈত্র ১৩১৯ সাল।

ঙ. ‘আলো ও ছায়া’, আষাঢ়- ভাদ্র ১৩২০ সাল।

চ. ‘অনুপমার প্রেম’, চৈত্র ১৩২০ সাল।

ছ. ‘হরিচরণ’, আষাঢ় ১৩২১ সাল।

‘চরিত্রহীন’ (উপন্যাস), কার্তিক ১৩২৪ সাল, ১১ নভেম্বর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ।

‘স্বামী’ (গল্প সমষ্টি), ফাল্গুন ১৩২৪ সাল, ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ।

ক. ‘স্বামী’, শ্রাবণ- ভাদ্র ১৩২৪ সাল।

খ. ‘একাদশী বৈরাগী’, কার্তিক ১৩২৪ সাল।

‘দËা’ (উপন্যাস), ভাদ্র ১৩২৫ সাল, ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ।

‘শ্রীকান্ত’ ২য় পর্ব(উপন্যাস), ভাদ্র ১৩২৫ সাল, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ।

‘ছবি’ (গল্প সমষ্টি), মাঘ ১৩২৬ সাল, ১৬ জানুয়ারী ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ।

ক. ‘বিলাসী’, বৈশাখ ১৩২৫ সাল।

খ. ‘মামলার ফল’, আশ্বিন ১৩২৫ সাল।

গ. ‘ছবি’, আশ্বিন ১৩২৬ সাল।

‘গৃহদাহ’ (উপন্যাস), ফাল্গুন ১৩২৬ সাল, ২০ মার্চ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ।

‘বামুনের মেয়ে’ (উপন্যাস), আশ্বিন ১৩২৭ সাল, অক্টোবর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ।

‘বারোয়ারী উপন্যাস’, বৈশাখ ১৩২৮ সাল, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ।

(২১ ও ২২ অধ্যায় শরৎচন্দ্র কর্তৃক লিখিত)

‘নারীর মূল্য’ (প্রবন্ধ), চৈত্র ১৩৩০ সাল, ১২ এপ্রিল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ।

‘দেনা- পাওনা’ (উপন্যাস), ভাদ্র ১৩৩০ সাল, ১৪ আগস্ট ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ।

‘নববিধান’ (উপন্যাস), আশ্বিন ১৩৩১ সাল, অক্টোবর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ।

‘হরিলক্ষ্মী’ (গল্প সমষ্টি), চৈত্র ১৩৩২ সাল, ১৩ মার্চ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ।

ক. ‘মহেশ’, আশ্বিন ১৩২৯ সাল।

খ. ‘অভাগীর স্বর্গ’, মাঘ ১৩২৯ সাল।

গ. ‘হরিলক্ষ্মী’, ‘শারদীয়া বসুমতী’, ১৩৩২ সাল।

‘পথের দাবী’ (উপন্যাস), ভাদ্র ১৩৩৩ সাল, ৩১ আগস্ট ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ।
‘শ্রীকান্ত’ ৩য় পর্ব(উপন্যাস), চৈত্র ১৩৩৩ সাল, ১৮ এপ্রিল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ।
শেষ প্রশ্ন’ (উপন্যাস), বৈশাখ ১৩৩৮ সাল, ২ মে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ।
‘শ্রীকান্ত’ ৪র্থ পর্ব(উপন্যাস), ফাল্গুন ১৩৩৯ সাল, ১৩ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
‘অনুরাধা’, ‘সতী’ ও ‘পরেশ’ (গল্প সমষ্টি), ফাল্গুন ১৩৪০ সাল, ১৮ মার্চ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ।

ক. ‘পরেশ’, ভাদ্র ১৩৩২ সাল।
খ. ‘সতী’, আষাঢ় ১৩৩৪ সাল।
গ. ‘অনুরাধা’, চৈত্র ১৩৪০ সাল।

‘বিপ্রদাস’ (উপন্যাস), মাঘ ১৩৪১ সাল, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ।
‘রসচক্র’ (বারোয়ারী উপন্যাস), ১১ বৈশাখ ১৩৪৩ সাল।তোঁর লিখিত অংশ ৩– ১৩ পৃষ্ঠা ১৪ পংক্তি)
‘শুভদা’ (উপন্যাস), জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ সাল, ৫ জুন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
‘শেষের পরিচয়’ (উপন্যাস), আষাঢ় ১৩৪৬ সাল, ৭ জুন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ।
‘নারীর লেখা’ (প্রবন্ধ), ফাল্গুন ১৩১৯ সাল।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর-গ্রন্থ

ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত : শরৎ রচনাবলী (১ম খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ স্বাধীনতা দিবস, ভাদ্র ১৪০২, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং।

” : শরৎ রচনাবলী (২য় খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ মাঘ ১৪০৮, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং।

” : শরৎ রচনাবলী (৩য় খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ স্বাধীনতা দিবস, ভাদ্র ১৪০২, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং।

” : শরৎ রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ মাঘ ১৪০২, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং।

” : শরৎ রচনাবলী (৫ম খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম নাথ পাবলিশিং পুনর্মুদ্রণঃ পৌষ ১৪০১, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং।

সহায়ক-গ্রন্থপঞ্জি

অচ্যুত গোস্বামী : বাংলা উপন্যাসের ধারা, প্রকাশকালঃ ১৩৬৪, কলকাতা, নতুন সাহিত্যভবন।

অজিতকুমার ঘোষ : শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার, তৃতীয় সংস্করণঃ অগ্রহায়ণ ১৪১৪, ডিসেম্বর ২০০৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

: জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, কলকাতা, সাহিত্যলোক।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল : শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা, প্রথম প্রকাশঃ ফাল্গুন ১৩৬৯, কলকাতা, শিল্পী- সংস্থা প্রকাশনী বিভাগ।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের প্রতিমা, প্রকাশকালঃ ১৯৭৪, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

: শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার, প্রথম সংস্করণঃ কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০১, মাঘ ১৪০৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

অলোকরায় : বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০০০, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী।

অশ্রুকুমার শিকদার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, প্রকাশকালঃ ১৯৮৮, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের সঙ্গে, প্রথম সংস্করণঃ ফাল্গুন ১৮৮০, কলকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃË, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণঃ আশ্বিন ১৩৯৫, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

: শরৎ প্রসঙ্গ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, প্রথম মুদ্রণঃ ১৯৭৬, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী।

আকিমুন রহমান : আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ, প্রথম প্রকাশঃ আষাঢ় ১৪০০, জুন ১৯৯৩, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার(সম্পাদিত): শরৎচন্দ্রঃ দেশ কাল সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০০, কলিকাতা, সোনার তরী।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশঃ ভাদ্র ১৩৯০, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ঋষি দাস : শরৎচন্দ্র, প্রথম প্রকাশঃ ভাদ্র ১৩৮৩, কলকাতা, অশোক প্রকাশন।

কাজী আব্দুল ওদুদ : শরৎচন্দ্র ও তাঁরপর, প্রথম সংস্করণঃ ফাল্গুন ১৮৮২, কলকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার : ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, প্রকাশঃ ১৯৩৯, কলকাতা, সতীশ মুখার্জী।

গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র(১ম, ২য় ও ৩য়খণ্ড), প্রথম প্রকাশঃ আষাঢ় ১৩৭৬, জুলাই ১৯৬৯, কলকাতা, সাহিত্য সদন।

: শরৎচন্দ্রের প্রণয়- কাহিনী, প্রথম প্রকাশঃ ভাদ্র ১৩৬৮, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬১, কলকাতা, সাহিত্য সদন।

: শরৎচন্দ্রের বৈঠকি গল্প, প্রথম আনন্দ সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর ২০০২, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

: শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, প্রকাশঃ ১৯৫৪, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, প্রকাশকালঃ ১৩৮০, কলকাতা, অভী প্রকাশনী।

: বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ১৯৭৭, কলকাতা, অbপূর্ণা পুস্তক মন্দির।

জীবেন্দ্র সিংহরায় : শরৎ- সন্দর্শন, প্রথম প্রকাশঃ শ্রাবণ ১৩৮৩, জুলাই ১৯৭৬, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা।

জ্যোতির্ময় ঘোষ : শরৎচন্দ্রঃ প্রসঙ্গ ও পুনর্বিবেচনা, প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, কলকাতা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

দীপক গোস্বামী : শরৎ- রচনাপঞ্জী, প্রকাশকালঃ ভাদ্র ১৩৮২, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ (শরৎজন্ম- শত বার্ষিকী), কলকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তনঃ বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারী ২০০২, মাঘ ১৪০৮, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

নন্দদুলাল চক্রবর্তী : শরৎচন্দ্রিকা, প্রথম সংস্করণঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫, কলকাতা, সিগনেট প্রেস।

নরেন্দ্র দেব : সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পাঠশালা কার্যালয়।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, তৃতীয় প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, ঢাকা, মুক্তধারা।

নারায়ণ চৌধুরী : কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ভাদ্র ১৩৮৩, কলকাতা, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

নিতাই বসু : শরৎচন্দ্রঃ জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশঃ মে ১৯৭৫, কলকাতা, মানস প্রকাশনী।

নীলিমা ইব্রাহীম : শরৎ প্রতিভা, বাংলা একাডেমী সংস্করণঃ পৌষ ১৪০৭, জানুয়ারী ২০০১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসের সমাজতË, প্রকাশকালঃ শ্রাবণ ১৩৮৮, আগস্ট ১৯৮১, কলকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী।

পরিমল চক্রবর্তী : সাহিত্যের স্বাধিকার ও অন্যান্য প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশঃ বৈশাখ ১৩৮৯, মে ১৯৮২, কলকাতা, নিরালা।

পুলকেশ দে সরকার : রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, কলকাতা, আলোকচক্র।

বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত) : শরৎ স্মরণ সংখ্যা, ভারতবর্ষ, প্রথম সংস্করণঃ ভাদ্র ১৪০৭, আগস্ট ২০০০, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, প্রথম প্রকাশঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, মে ২০০২, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত) : শরৎস্মৃতি, পুনর্মুদ্রণঃ বৈশাখ ১৩৮৪, কলকাতা, সাহিত্যম।

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় : শরৎ সাহিত্যের স্বরূপ, প্রথম প্রকাশঃ বৈশাখ ১৩৮৭, এপ্রিল, ১৯৮০, কলকাতা, রূপা এণ্ড কোম্পানী।

ভীষ্মদেব চৌধুরী : কথাশিল্পের কথামালা শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৭, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা।

মদনমোহন কুমার (সম্পাদিত) : শরৎচন্দ্র, প্রথম প্রকাশঃ ভাদ্র ১৩৮৩, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

মাখনলাল রায়চৌধুরী : শরৎসাহিত্যে পতিতা, প্রকাশঃ ১৩৬৬, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

মিহির আচার্য (সম্পাদিত) : শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ মার্চ ১৯৭৫, কলকাতা, শুকসারী প্রকাশক।

মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃËত(আধুনিক যুগ), পঞ্চম সংস্করণঃ ১৯৭৯, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস।

মোহিতলাল মজুমদার : শরৎ- পরিচয়, প্রথম সংস্করণঃ ভাদ্র ১৩৬৮, কলকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড।

: শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, প্রথম সংস্করণঃ ডিসেম্বর ১৯৭১, কলকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড।

রণজিৎ কুমার সেন : স্মৃতি পটে লেখা, প্রথম প্রকাশঃ শ্রাবণ ১৩৮৯, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড।

রফিকউলাহ খান : কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতË, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০০২, ঢাকা, অনন্যা।

: শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০০০, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

রশীদ আল ফারুকী : শরৎ সাহিত্য জিজ্ঞাসা, প্রথম মুদ্রণঃ চৈত্র ১৩৭৮, চট্টগ্রাম, বিবিধ প্রকাশনী।

রাধারানী দেবী : শরৎচন্দ্র মানুষ এবং শিল্প, প্রকাশকালঃ নাই, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

রীণা ঘোষ : শেক্সপীয়র- অনুবাদ ও অনুবাদ সমস্যা, প্রকাশঃ বৈশাখ ১৩৮২, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, নূতন সংস্করণঃ আশ্বিন ১৮৮০, কলকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ।

শরৎচন্দ্র রচনাসমগ্র(২য় খণ্ড) : সম্পাদনাঃ তপন রুদ্র, প্রথম সংস্করণঃ জুলাই ২০০২, ঢাকা, সালমা বুক ডিপো।

শিশির মজুমদার (সম্পাদিত) : উËরকাল ও শরৎচন্দ্র, প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, কলকাতা, এস, ব্যানার্জী এণ্ড কোং।

শ্রীকানাইলাল ঘোষ : শরৎচন্দ্র, চতুর্থ সংস্করণঃ আষাঢ় ১৩৮১, কলকাতা, দি প্রকাশনী।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পুনর্মুদ্রণঃ ২০১০– ২০১১, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

শুদ্ধসËব বসু : শরৎ সমীক্ষা, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ আষাঢ় ১৩৮৪, কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস।

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎ– চেতনা, প্রথম প্রকাশঃ আশ্বিন ১৩৭৪, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

: শরৎচন্দ্রের চিন্তা– জগৎ ও তাঁহার সাহিত্য, প্রথম প্রকাশঃ বৈশাখ ১৩৮৬, এপ্রিল ১৯৭৯, কলকাতা, জি এ এণ্টারপ্রাইজ।

সমরেন্দ্রকুমার জানা : আধুনিক যুগদৃষ্টিতে শরৎসাহিত্যের সমস্যাবলী, প্রথম প্রকাশঃ মাঘ ১৩৮৮, জানুয়ারী ১৯৮২, কলকাতা, পুথিপত্র।

সফিকুbবী সামাদী : কথাসাহিত্যে বাস্তবতা শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ, প্রথম প্রকাশঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪, জুন ১৯৯৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণঃ ১৯৭১, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী।

সরোজমোহন মিত্র : মার্কসীয় দৃষ্টিতে শরৎ- সাহিত্য, প্রথম প্রকাশঃ ভাদ্র ১৩৮২, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, কলকাতা, প্রকাশকঃ বীথিকা মিত্র।

: শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা, প্রকাশঃ ১৩৮৮, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড।

সাঈদ- উর রহমান : সাহিত্য- সংস্কৃতির উদার প্রান্তরে, প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০০২, ঢাকা, মৌলি প্রকাশনী।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ, প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), ষষ্ঠ মুদ্রণঃ সেপ্টেম্বর ২০১০, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সুদীপ বসু : উদ্ভাসিত শরৎচন্দ্রঃ পত্রে ও সাময়িক পত্রে, প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০০০, শ্রাবণ ১৪০৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : শরৎচন্দ্র, সপ্তদশ সংস্করণঃ অগ্রহায়ণ, ১৪০৭, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

: শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণঃ মাঘ, ১৪০৪, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

: বঙ্কিমচন্দ্র, চতুর্থ সংস্করণঃ জানুয়ারী, ২০০২, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র (সম্পাদিত) : শরৎ- সাহিত্যের ভূমিকা(সঙ্কলন), (মুদ্রণ সাল নাই), কলকাতা, পুথিপত্র।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : শরৎ পরিচয়, (প্রকাশকাল: নাই), কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

সেলিমা সাঈদ : শরৎ সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ, প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০২, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি।

হরপ্রসাদ মিত্র (সম্পাদিত) : শরৎ- চর্চা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭, কলিকাতা, অন্তরা।

হীরেন চট্টোপাধ্যায় : উপন্যাসের রূপরীতি, প্রথম প্রকাশ: মে ২০১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত) : ধ্রুপদী সাহিত্যমালা, প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৪০৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

হুমায়ুন কবির : শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব, প্রথম অবসর সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪০৮, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা।

ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৪০৭, ডিসেম্বর ২০০২, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়।

: ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ: ২০১১, ঢাকা, প্রগতি প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স।